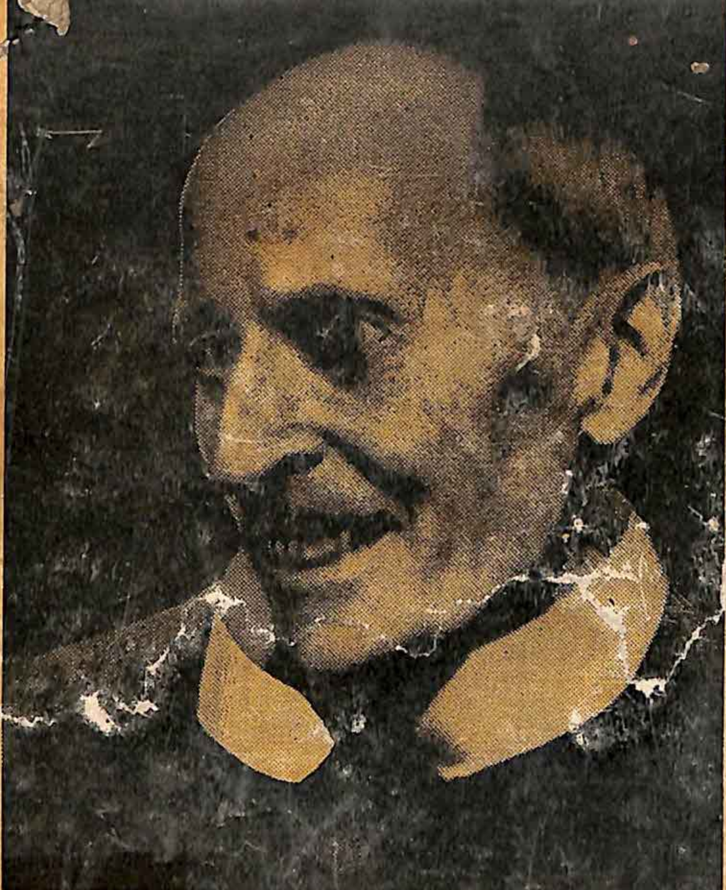


কালান্তরের পথিক
রম্যাঁ রলাঁ

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

কালান্তরের পথিক

রমঁ্যা রলাঁ

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
কলিকাতা-১২



ভূমিকা

দেশ তো নয়, অগ্নি-শয্যা। তারই তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালায় যখন উন্মত্ত মানুষ তথাকথিত বিশৃঙ্খলায় মেতে উঠেছে, তখন বিদেশের এক মনীষীর লেখা একটি নাটক পড়ছিলাম যার বিষয়বস্তু আরও গুরুতর, আরও সম্ভাবনাময় বিশৃঙ্খলা। পড়তে পড়তে একটা জায়গায় এসে চমকে উঠলাম। বজ্রবিদ্যুতে ভরা এ কি বাণী : Where order is injustice, disorder is the beginning of justice! Disorder বা বিশৃঙ্খলার এ কি প্রশস্তি? আইন ও শৃঙ্খলা যেখানে অন্যায় ও অবিচারকে চালিয়ে যাবার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা মাত্র. সেখানে আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গকারীরা ন্যায় ও সুবিচারের অগ্রদূত,- বুকের রক্তে তারা কল্যাণময় ভবিষ্যতের পথ রচনা করছেন—এ সত্যের কি অপূর্ব স্বীকৃতি কথাগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে!

নাটকটির নাম "১৪ই জুলাই"—ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিন—জনতার আক্রমণে প্যারিস শহরে বাস্তী কারাদুর্গের পতনের কাহিনী। লেখকের নাম রমঁ্যা রলাঁ—এ বছর আমরা যাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করছি। ২৯এ জানুয়ারী তাঁর জন্মদিন। শত-বার্ষিক স্মরণ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতের রলাঁ সমিতি গঠনের উদ্যোগ-পর্বে বাঙলা দেশের কিছু সুপরিচিত সাংস্কৃতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁরা জানালেন যে তাঁরা ইতিপূর্বেই একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করেছেন—যার পৃষ্ঠ পোষণ করছেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান্, সভাপতি ডক্টর কালিদাস

নাগ এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের সমিতি বহুগুণিজনপুষ্ট। তাঁদের পক্ষের প্রবক্তারা আরও বললেন, তাঁরা রলাঁকে নিয়ে পলিটিক্স্ করতে চান না, তাঁকে রাজনীতির ধূলি-ধূমের উর্ধ্বে রাখতে চান। আমাদের ওপর বিশুদ্ধ সংস্কৃতির নেতাদের আস্থা নেই কারণ আমরা রাজনীতি-বিযুক্ত খণ্ডিত রলাঁকে প্রচারের মিথ্যাচারে সম্মত হব না।

রলাঁ রাজনীতিকে দেখতেন মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের আয়োজন হিসেবে—রাজনীতিকে মনে করতেন একটি দেশের বা বিশ্বের সমধর্মী শক্তির বিপুলায়তন সংহতি—যে সংহতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বমানবের প্রাত্যহিক আহার্যের ব্যবস্থা করা। এই বুদ্ধিজীবী daily bread বা প্রাত্যহিক আহার্যের কথা বলতে উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীদের মতো সংকোচবোধ করতেন না। রলাঁর কাছে রাজনীতি হচ্ছে একটি পবিত্র শব্দ এবং রাজনীতি মানে "যা কিছু জীবনে পূর্ণতা এনে দিতে সাহায্য করে: খাদ্য, কাজ এবং বিভিন্ন রকমের স্বাধীনতা।" তিনি আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন যে আমরা বুদ্ধিজীবীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাদ দিয়ে বায়ুচারী হয়ে থাকি না, তথাকথিত ছোটলোকদের মতোই প্রাত্যহিক প্রয়োজন না মিটলে আমরাও ব্যাকুল হই। যে মননের দোহাই পেড়ে আমরা গণ-আন্দোলনকে উন্নাসিক ব্যঙ্গে বিদ্ধ করি সে-মনন তো অশন-বসন ছাড়া আকাশস্থ নিরালম্ব প্রেতত্ব লাভ করবে। উদাত্ত কণ্ঠে রলাঁ বলছেন: "আমি ক্ষুধিতের সেবক, শোষিতের ও নিপীড়িতের সেবক। যদি পারি, তবে মনের সম্পদ দেবার আগে আমি তাদের খাদ্য, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা দিতে দায়-বদ্ধ।" এখানেও দেয় জিনিসের তালিকায় প্রথমেই খাদ্য। সাম্প্রতিক বাঙলা দেশে খাদ্যের জন্যে ক্ষুধিতের অভিযানের সময়

সৌখান বুদ্ধিজীবীরা ভাবতে পারেন নি এই মনীষীর মতো, ভাবতে পারেন নি খাদ্যের আন্দোলনে যোগ দেবার কথা। তাঁদের কাউ কাউকে পরে গণ-বিক্ষোভের বিশিষ্ট রূপের প্রতি সুরুচির নামে, শান্তির নামে অগ্নিবাণ বর্ষণ করতে দেখেছি। এঁরা সমাজের যে স্তরের মানুষ তাতে রলাঁর পূর্ণ বিগ্রহের পূজারী হতে হলে এঁদের স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। এরকম আত্মঘাতী কাজ তাঁরা করতে পারেন না বরং অস্ত্র যদি কোথাও শোষিতের শোণিতে শাণিত হবার সম্ভাবনা হয়ে থাকে তাকে নির্বল করবার ব্রতই তাঁদের কাম্য—তাই প্রাণবন্ত পূর্ণ বিগ্রহের বদলে মহাজাতি সদনে সাড়ম্বরে পূজিত হলো দারুময় ঠুঁটো ঠাকুর। পত্রিকার সচিত্র বর্ণনায় পুলকিত হয়ে পড়লাম কমিটির সভাপতি শ্রীকালিদাস নাগ বলেছেন: 'ভারত ও রলাঁ' এই বিষয়ে গবেষণা আবশ্যক; সভার সভাপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ বলেছেন: "সকল প্রকার জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের উর্ধ্বে ছিলেন বলেই" রলাঁ পূজনীয়; কথাশিল্পী শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় রলাঁকে "পরমাত্মার উপাসক ও বিশ্বে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিচিত্র কল্পনায় প্রবুদ্ধ এক মহান্ সাধক" বলে উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা আজকে "ভারত ও রলাঁ" সম্বন্ধে গবেষণার কথা বলছেন, তাঁরা ভারত সম্বন্ধে রলাঁর বিশাল ডাইরি *Inde*-এর ব্যাপারে উৎসাহী হন নি। কারণ সেই ডাইরিতে গান্ধীজী সম্বন্ধে এমন সমালোচনা আছে যাতে বহুলোকের মোহমুক্তি ঘটবে।

এই সুধীজন-অলঙ্কৃত সংস্থাটি একটি "sleeping organisation" বিশেষ। গোটা একটা যুগ ঘুমিয়ে আছে। আমরা মনে করি, এ ঘুম হচ্ছে "সজাগ ঘুম" কারণ এঁরা রলাঁকে আর সব কিছু বাদ দিয়ে গান্ধী, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনীকার হিসেবেই ভাল-

বাসেন এবং সেই ভালোবাসা প্রচারও করেন—সে-ব্যাপারে তাঁরা নিষ্ক্রিয় বা ঘুমন্ত নন। অথচ তাঁর *I Will Not Rest* গ্রন্থে রলাঁ বলছেন, "···যখন আমি সাংস্কৃতিক তীর্থযাত্রায় ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি সেই অনাদি-অনন্তের স্থবির স্বপ্ন যাতে ভারতীয় চিন্তা তার সর্বশক্তি ক্ষয় করেছে, এনেছিলাম সেই দুটি মানুষকে যাঁরা জানতেন স্বপ্ন থেকে কেমন করে উদ্যম আহরণ করতে হয়, যাঁরা পারতেন কর্মের যুদ্ধক্ষেত্রের ফুটন্ত তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এই দুজনের একজন গান্ধীজী, অপরজন বিবেকানন্দ।" এ লেখা ১৯৩৪-এর। এর পর গান্ধীজী সম্বন্ধে রলাঁর মত-পরিবর্তন ঘটেছে। এই রলাঁকে স্থিতাবস্থার সাংস্কৃতিক সমর্থকেরা এখনও ১৯৩০-এর আগের অচল বিগ্রহ হিসেবে রেখে তাঁদের শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। তাই "নিখিল ভারত রমঁ্যা-রলাঁ জন্মশতবার্ষিকী সমিতি"র আংশিক সক্রিয়তা এবং রলাঁকে হয় "শ্রেণীভেদের উর্ধ্বে স্থাপন" ক'রে নয় তো বিশ্বে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিচিত্র পরিকল্পনার সাধক" বলে প্রচার করা। রলাঁর স্মৃতির প্রতি এটা পরিকল্পিত মিথ্যাচার কারণ তিনি "উর্ধ্বে" থাকেননি কখনও, নেমে এসেছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে তাদের সংগ্রামের সাথী হিসেবে, "ঈশ্বরের রাজত্বে" নয়, শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্বেই ছিল তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা। একটা ঘটনা উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব। মুসোলিনী প্রেরিত যে অধ্যাপকটি রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়ে ইতালী নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যাঁর জন্য ফ্যাসিস্ত প্রশস্তির ফাঁদে কবিগুরুকে পড়তে হয়েছিল (—অবশ্য শেষ অবধি ফ্যাসিস্ত-বিরোধী রলাঁর চেষ্টায় কবি কালিমা-মুক্ত হয়েছিলেন,) সেই কুখ্যাত ইতালীয় অধ্যাপক তুচ্চিকে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাসের উদ্যোগে এবং আচার্য

নেহরুর উপস্থিতিতে বিশেষ এক সমাবর্তনে "দেশিকোত্তম" উপাধি দেওয়া হয়। সেই সুধীরঞ্জনই মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সুধীদের রলাঁ-স্মরণ-সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। যে অশোক চ্যাটার্জী ১৯৩২এও লিখেছেন "There is much in Mussolini that we could imitate with advantage" (P. N. Roy লিখিত *Mussolini and the Cult of Italian Youth* দ্রষ্টব্য) তিনিও অলঙ্কৃত করেছেন 'রলাঁ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি'র কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ! কোনও কোনও চরিত্র সত্যি অপূর্ব!

রলাঁকে জনসাধারণের কাছ থেকে আড়াল করে রাখবার ষড়যন্ত্রের ওপর চরম আঘাত হেনেছেন শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রমোদ সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁর লেখা রলাঁর জীবন-আলেখ্য "কালান্তরের পথিক" আমাদের দেশের জীবনী-সাহিত্যে যুগান্তরের পরিচয় বহন ক'রে দেখা দিচ্ছে। অধিকাংশ জীবনীকার যুগ-চেতনার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, জীবনের পশ্চাদ্‌পট তাই তাঁদের নিবন্ধে অনুপস্থিত, ক্রমবিকাশের ধারার বিশ্লেষণ ও অনুসরণে তাঁরা অক্ষম। প্রমোদবাবুর রলাঁ-জীবন-ভাষ্য প্রকৃত ঐতিহাসিকতার সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভংগী থেকে লেখা। তিনি রলাঁকে স্থাপন করেছেন তাঁর যুগ-পরিবেশের মধ্যে। প্রথম দুটি অধ্যায়ে অতি সংগত ভাবেই তিনি তাঁর মানস প্রতিমাটিকে তার পাদপীঠের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। তারপর বিকাশের প্রয়োজনে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই বিরাট চরিত্রের জীবন অভিযানের প্রথম প্রয়াসের চিত্র—গণ-নাট্য পরিবেশন। তারপর ভাবী অভ্যুদয়ের সুদীর্ঘ সাধনার রূপায়ন "জাঁ-ক্রিস্‌তফ"-এ। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া—বুদ্ধিজীবীর সংকট—রক্তের প্লাবনের মধ্যে অত্যন্ত আন্তরিক শান্তি কামনায় বুদ্ধিজীবীদের জন্য স্বাতন্ত্র্যের দ্বীপ-রচনার করুণ প্রয়াস। আন্তর্জাতিকতার বিরাট পটভূমির ওপর

রলাঁর ব্যক্তিত্বকে এইভাবে ফুটিয়ে তুলে একাধারে নিপুণ শিল্পী ও সংগ্রামী সাহিত্যিক প্রমোদবাবু আমাদের দেশের ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনার সঙ্গে রলাঁকে যুক্ত করে দেখাচ্ছেন। অসহযোগ আন্দোলনের জন্ম-লগ্নে রলাঁর ধারণা হয়েছিল তাঁর সমস্যা বিড়ম্বিত মনের দিগন্তে অনেক দূরের একটি তারার উদয় হয়েছে—সে-তারা গান্ধীজী। কিন্তু পরে তাঁর মোহ ভঙ্গের কথা প্রথম আমরা প্রমোদবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলাম। নাম্বুদিরিপাদের "মহাত্মা" সম্বন্ধে ইংরেজী বইখানির পর এরকম "মোহমুদ্গর" আর এদেশে প্রকাশিত হয়নি। ভায়োলেন্স সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পত্রালাপও নির্মোহ বুদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল।

এ পথিক চিরপথিক, কারণ তিনি জীবনধর্মী সাহিত্যিক ও সমাজ-সেবী। কালান্তর আর যুগান্তরের পথে রলাঁর অভিযাত্রিক রূপ অপূর্ব মহিমায় বিশেষ করে ফুটে উঠেছে শেষ ক'টি অধ্যায়ে। রলাঁর জীবন-কথার উপসংহারও অতি মূল্যবান্। যে সংহার তাঁকে গ্রাস করেছিল তা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাণীকে গ্রাস করতে পারেনি। সেই অস্ত-সৌন্দর্যের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা কবির ভাষায় বলতে পারি :

"তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।"

এই চিরন্তন রূপের রূপকার প্রমোদবাবু আমাদের বিশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। ইতি—

প্রচ্ছায়
৮।২ বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

[সভাপতি, ভারতের রম্যাঁ রলাঁ সমিতি]

মুখবন্ধ

রমঁ্যা রলঁা ছিলেন ফরাসী ও ইয়োরোপীয় শিল্প, সভ্যতা ও মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং তার বিবেকের অতন্দ্র প্রহরী। স্টেফান ৎেজায়াইগ ঠিকই বলেছিলেন যে রলঁা হচ্ছেন "a symphony of contemporary ideas"—বর্তমান যুগের সব চিন্তার ঐকতান।

বর্তমান ভারতের চিন্তার সঙ্গেও রলঁা যে কতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন ও তাতে তিনি যে কত বড় স্থান অধিকার ক'রে আছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে এমনভাবে একাত্মবোধ আর কোনো বিদেশী মনীষী করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। উপরন্তু ভারতের মুক্তি আন্দোলন ও ভারতের সংস্কৃতি রলঁা পাশ্চাত্যে জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন, সেরূপ আর কেউ করেন নি। আরও বড় কথা এই যে, রলঁা সেখানেই থেমে যান নি; ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর গৌরবময় সংগ্রাম আরও মহত্তর। তাই রলঁার নিকট ভারতের জনসাধারণের ও বুদ্ধিজীবীর ঋণ অপরিসীম।

কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, রলঁার প্রচণ্ড গতিশীল মহান্ চিন্তার সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় খুবই কম। রলঁা সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় যেটুকুও বা চর্চা হয়েছে, ভারতের অন্যান্য ভাষায় তাও হয় নি। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এটা ভারতের নিতান্ত দৈন্যেরই পরিচয়।

রলঁার মহান্ শিল্পপ্রতিভা ও চিন্তার সবদিক, তাঁর সঙ্গীতবিদ্যা, তাঁর নাটক, উপন্যাস, সমাজচিন্তা, ভারতচিন্তা, রাজনৈতিক চিন্তা

একখানা বই-এর মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। এশিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু দেশে রলাঁ খুবই জনপ্রিয় এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে রলাঁ সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থও রচিত হয়ে আসছে। জাপানে তাঁর "বিমুগ্ধ আত্মার" সিনেমাও হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে ও পারী কমিউনের রক্তরঞ্জিত ফ্রান্সে রলাঁর জন্ম। ভলতেইর, রুশো, বেট্‌হোফেন, উগ-র তিনি মানসপুত্র। ভল্‌তেইর-এর বজ্রগর্ভ বিদ্রোহের বাণী—Ecrasez l' in fame—ভণ্ডামি শয়তানী ধ্বংস করো—রলাঁরও জীবনের মন্ত্র। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের তিনি প্রতীক; তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে, আদর্শের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপস তিনি কোনো দিন করেন নি। ইয়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক ও নৈতিক ক্রমবিকাশ নিশ্চল হয়ে পড়েছিল, তখন রলাঁ ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ইয়োরোপে শুরু হলো এক সর্বব্যাপী সঙ্কটের যুগ—বিবেকের সঙ্কট, আদর্শের সঙ্কট, চিন্তার সঙ্কট। রুশদেশের সমাজ বিপ্লব এই সঙ্কটকে যেমন আরও তীব্রতর, আরও গভীরতর ক'রে তুলল, তেমনি তার সমাধানের পথও নির্দেশ ক'রে দিল। অনেক বুদ্ধিজীবী এই সঙ্কটে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রলাঁ সে-দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে দাঁড়িয়েছেন। রলাঁর "মনের স্বাধীনতা," "শিল্পীর স্বাধীনতা" ও "বিমূর্ত" মানবতাবাদে বিশ্বাসের যুগেও কায়েমী স্বার্থের দাসত্ব তাঁর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না. শোষকশ্রেণীর নিকট তিনি কোনোদিনই আত্মসমর্পণ করেন নি, তার বর্বরতা, হিংস্রতা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন আপসহীন সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন। মানসিক ভীরুতা ও নৈতিক

কাপুরুষতার প্রতি তাঁর ঘৃণা, তাঁর নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও সদাজাগ্রত বিবেক তাঁকে থেমে থাকতে দেয় নি। রলাঁর জীবন এই দ্বন্দ্বময় যুগের একটি স্বচ্ছ দর্পণ, কালান্তরের পুরাতন চিন্তার সঙ্গে নতুন চিন্তার সংঘর্ষের একটি অপূর্ব ইতিহাস।

একদিন রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন, "পৃথিবীতে প্রচণ্ডের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে শান্তির যে অভ্যুদয় দেখি আদিযুগে, তাই দেখি আজ মানুষের ইতিহাসেও। উদ্দাম নিষ্ঠুরতা আজ ভীষণাকার মৃত্যুকে জাগিয়ে তুলেছে সমুদ্রের তীরে তীরে। দৈত্যেরা জেগে উঠেছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিষ। মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা ?"

এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব রলাঁ দিয়েছিলেন: "যে দানবীয় পরশ্রমজীবী শোষণব্যবস্থা সম্পদ-স্রষ্টা শ্রমিকের সমস্ত শক্তি তৃষ্ণার্তের মতো শুষিয়া লইয়া তাহাকে দাসত্বের শৃঙ্খল পড়াইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে বিশ্বের বিরাট সর্বহারা শ্রেণী অমিত বিক্রমে সংগ্রাম চালাইতেছে। সমস্ত বুদ্ধিজীবী, সমস্ত সহকর্মীদের নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি: শ্রমজীবীদের পার্শ্বে আমাদের স্থান।··· যে শক্তি আজ পৃথিবীকে নতুন করিয়া গড়িতেছে, মননশীল ব্যক্তির পক্ষে তার সক্ষম সৈনিকত্ব করার চেয়ে বড় কাজ আর থাকিতে পারে না।"

রলাঁর তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁরা বাঙালী পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, সরোজ আচার্য ও সরোজ দত্তের। রলাঁর *Quinze Ans de Combat*-এর সরোজ দত্ত কৃত অনুবাদ "শিল্পীর নবজন্ম" বাঙলার রাজনৈতিক সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ৺নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পুষ্পময়ী বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ৺অশোক গুহ, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, সৌরীন রায়, "জাঁ-ক্রিসতফ" ও "বিমুগ্ধ আত্মা"র

অনুবাদ ক'রে বাঙালী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ঋষি দাস অনুবাদ করেছেন "গান্ধী," "রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দ"। জ্যোৎস্না সিংহরায় ১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ "রম্যাঁ রলাঁর রচনাপঞ্জী" প্রকাশ করেছেন ("গণবার্তা" শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২), তা রলাঁ পাঠকদের নিশ্চয়ই খুব সাহায্য করবে। বিমল মিত্র, সুনীল বসু, সরোজ দত্ত ও চিন্মোহন সেহানবীশ এই গ্রন্থ রচনার কাজে আমাকে যে ভাবে বহু বইপত্র, বিভিন্ন পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন ও নানাভাবে আলোচনা ক'রে উৎসাহ দিয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। রলাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গণশক্তি প্রিণ্টার্স-এর সব কর্মীরা বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এই বই ছাপিয়েছেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

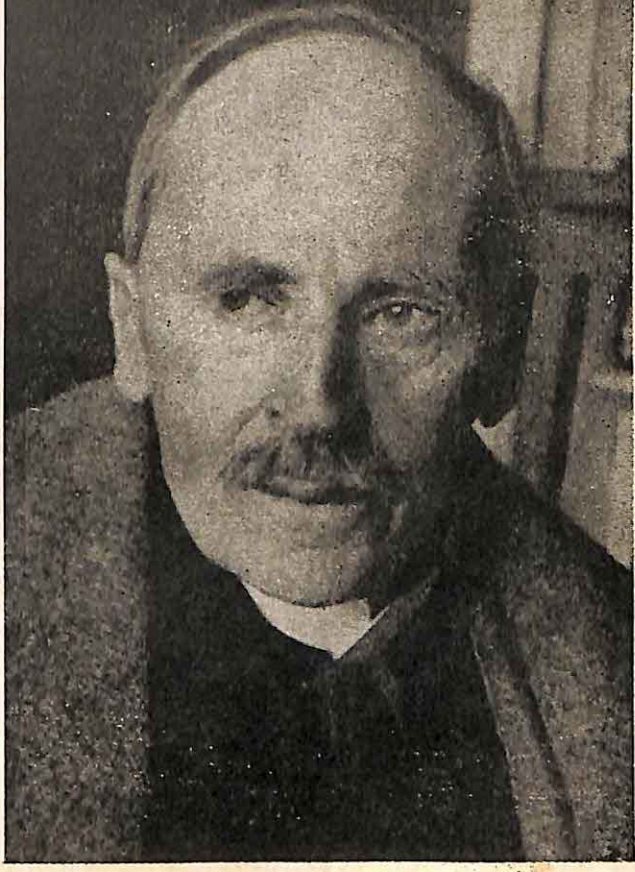
"কালান্তরের পথিক রম্যাঁ রলাঁ" লেখার জন্য প্রধানতঃ যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলি হলো : Stefan Zweig-এর : *Romain Rolland*, রম্যাঁ রলাঁর : *Inde*, *Le Quatorze Jullet*, "শিল্পীর নবজন্ম," জাঁ-ক্রিসতফ," "বিমুগ্ধ আত্মা," *Par la Revolution la Paix* প্রভৃতি। এই বই লেখার কাজে সাহায্যের জন্য মাদাম রলাঁ প্রকাশকের নিকট *Rolland Par lui-meme* নামে যে বই পাঠিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

তাড়াতাড়ির জন্য কিছু মুদ্রাকরপ্রমাদ থেকে গিয়েছে। তার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

২১৬।১।৫ লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৭

প্রমোদ সেনগুপ্ত

১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি-মার্চের আন্দোলনের
শহীদদের স্মরণে



রম্যাঁ রলাঁ। ১৮৬৬–১৯৪৪

সস্ত্রীক রলাঁ, ১৯৩৫





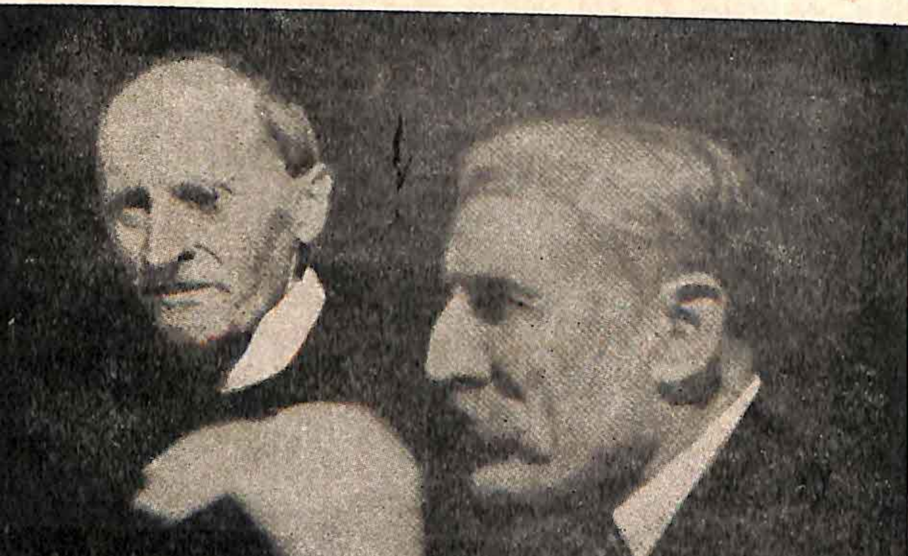


ভিলন্যুভের গৃহে, ১৯০৫



গর্কীর সঙ্গে মস্কো স্টেশনে সস্ত্রীক রলাঁ, জুলাই ১৯৩৫

ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মার্সেল কাশাঁর সঙ্গে, ১৯৩৬



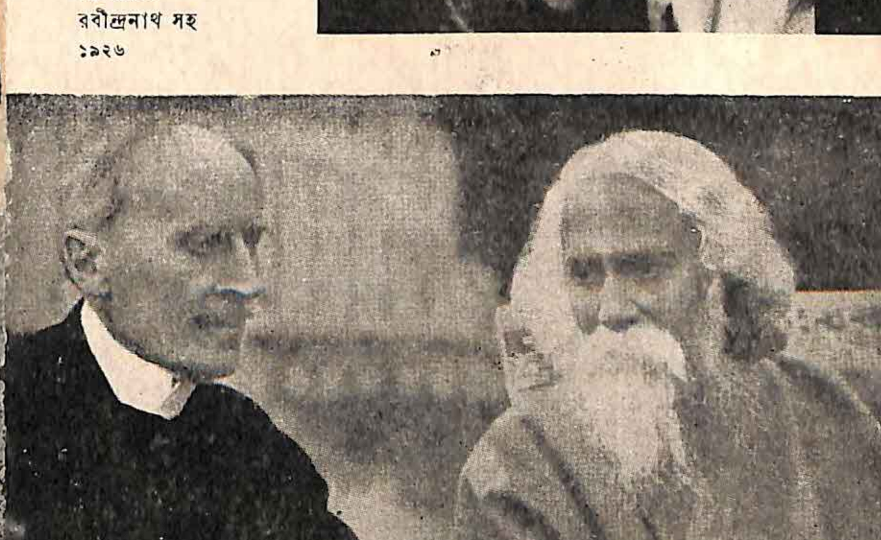


রম্যাঁ রলাঁ



গান্ধীর সঙ্গে
ভিলন্যভে, ১৯৩১

ভিলন্যভে
রবীন্দ্রনাথ সহ
১৯২৬



পিকাসো অঙ্কিত আলহামরা থিয়েটারে রলাঁর "১৪ই জুলাই" নাটকের মঞ্চ-পট, ১৯৩৬







কমিউনিস্ট নেতা মরিস তোরেজ এবং বেনোয়াঁ ফ্রাসেঁর সঙ্গে, ১৯৩৪

১৯৫৩য় জাপানে তোলা "বিমুগ্ধ আত্মা"র ফিল্‌ম্‌ থেকে



জীবনের ভিত্তি

রম্যাঁ রলাঁর জন্ম ফ্রান্সের বার্গাণ্ডী প্রদেশে ক্লামেসি নামক একটি ছোট পুরাতন শহরে ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলেন বলে তাঁকে শৈশবে মৃত্যুর সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং আজীবন রুগ্নাবস্থায় কাটাতে হয়েছে। তাঁর মা-ও অক্লান্ত সেবাযত্ন স্নেহ-ভালবাসা নিয়ে এ লড়াইতে নেমেছিলেন এবং রম্যাঁর ক্ষেত্রে জয়ী হলেও তাঁর দুই বৎসরের কন্যাকে তিনি বাঁচাতে পারেন নি। সেই সময় রম্যাঁর বয়স পাঁচ বৎসর।

মৃত্যুছায়া যেন সব সময় রলাঁদের বাড়িটাকে ঘিরে থাকত, তাঁর শোকার্ত মা-ও মৃত্যু-আশঙ্কায় সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন থাকতেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য রলাঁ অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলায় যোগ দিতে পারতেন না, তাই তাঁকে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই কাটাতে হতো।

তাঁর জীবনস্মৃতিতে রলাঁ নিজের শৈশবকালকে একটা নিরাশায় নিমগ্ন মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন বন্দীশালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই বন্দীশালার বৈশিষ্ট্য ছিল নিঃসঙ্গতা ও নৈরাশ্য,

কিন্তু তার সঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—সংগ্রাম। প্রথমতঃ, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম, বাঁচবার জন্য, জীবনের জন্য অবিশ্রান্ত শারীরিক সংগ্রাম, দ্বিতীয়তঃ, জীবনের প্রথম থেকেই নৈরাশ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—যে নৈরাশ্যবাদ জীবনকে, মানুষের মনকে পঙ্গু ক'রে দেয়, সংগ্রাম-বিমুখ ক'রে তোলে। কিন্তু এই বন্দীশালাতেই রলাঁ সন্ধান পেয়েছিলেন মুক্তির পথ; সেখানেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন জীবনের আনন্দ ও মনের ঐশ্বর্যের উৎস।

রলাঁর পিতামাতার দিক থেকেও দুইটি বিপরীত ধারা তাঁর মধ্যে সংযুক্ত হয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন যান্‌সেন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক (Jansenites)। যে সব রোমান ক্যাথলিক জেস্যুইট পাদ্রীরা এক সময়ে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজত্ব চালাত, তাদের বিরুদ্ধে যানসেনাইটরা লড়েছিল। রলাঁর মাতা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, ঐকান্তিক ও সঙ্গীতানুরাগী। মাতার দিক থেকেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিউরিটান চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বাস। পিতার পূর্বপুরুষরা ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক; তাঁদের একজন সেই বিপ্লবের সময় কুখ্যাত বাস্তী (Bastille) কারাদুর্গ আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পিতাও ছিলেন খুব স্বাধীনচেতা, আশাবাদী, আদর্শের জন্য, কর্তব্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে সর্বদাই প্রস্তুত; ধর্মের প্রতি কোনো আকর্ষণই তাঁর ছিল না, তিনি ছিলেন অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধী ও স্বাধীন

চিন্তার পক্ষপাতী। ফ্রান্সের অনেক শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেই ধর্মবিশ্বাস ও স্বাধীন চিন্তার এই দ্বন্দ্ব বহুকালের। রলাঁকেও ধর্মবিশ্বাস ও স্বাধীন চিন্তা, বৈপ্লবিক চিন্তার বৈপরীত্যের সমাধানের জন্য বহুদিন ধরে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল।

শৈশব থেকেই রলাঁর সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ। তাঁর পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মা ভাল পিয়ানো জানতেন এবং তাঁর কাছেই তাঁর প্রথম সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়। ফরাসী সঙ্গীত আয়ত্ত করার পর তিনি মট্‌সার্ট (Mozart ১৭৫৬-৯১) ও বেট্‌হোফেন (Beethoven, ১৭৭০-১৮২৭)-এর জার্মান সঙ্গীতে ডুবে থাকতেন। এই সম্বন্ধে রলাঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> "তৃষ্ণার্ত ভূমিতে বর্ষার জলের মতো জার্মান সঙ্গীত আমার আকুল-আকাঙ্ক্ষী হৃদয়ের শুষ্ক জমিকে সিঞ্চিত করেছিল। মট্‌সার্ট ও বেট্‌হোফেনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-বাসনা আমার জীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গিয়েছিল—আমিই তাঁরা তাঁরাই আমি।… আমি তাঁদের নিকট চিরঋণী। যখন আমি শিশু ছিলাম এবং মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হতো, তখন মট্‌সার্টের একটি সুর প্রেমিকের মতো আমার শিয়রে যেন অহরহ পাহারা দিত।… পরবর্তীকালে হতাশা ও সন্দেহের সংকট মুহূর্তে বেট্‌হোফেনের সুর-সঙ্গীতের অনন্ত জীবন-স্ফুলিঙ্গ আমাকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলে। যখনই আমার মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, চিত্ত হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত, তখনই আমি পিয়ানোয় বসে সঙ্গীতসাগরে ডুবে যাই।"

জীবনারম্ভেই সেই মহান্ সুরশিল্পীদের সাহায্যে এই সুরজগতের সঙ্গে সংযোগ, জীবনের ও অনুভূতির এক সর্বব্যাপী

সমবেদনাবোধ রলাঁকে দেশ, জাতি ও কালের সংকীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন কেটে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছিল।

রলাঁর বাল্যজীবনের দ্বিতীয় সূর্য শেক্সপীয়ার। একদিন ছাদের ঘরে আরও অনেক বইয়ের মধ্যে তাঁর পিতামহের একখানি বৃহৎ সচিত্র শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী তিনি আবিষ্কার করেন। এই বই নিয়ে তিনি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। এই নাটকগুলির মধ্য দিয়ে অনেক দেশের বহু নরনারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, তাদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার তিনি সমব্যথী হয়ে ওঠেন। শেক্সপীয়ারের এই মহামানবদের জগতে রলাঁ নিজে মিশে যেতেন, প্রস্‌পেরোর মত দুনিয়ার সমস্ত অশরীরী আত্মাদের যেন নিজের ভৃত্য ক'রে ফেলতেন।

শেক্সপীয়ার, বেট্‌হোফেন, মট্‌সার্টের নিকট থেকে রলাঁ আরও পেয়েছিলেন মহান্ জীবনের আদর্শ, স্বপ্নময় জগতের আহ্বান। জীবনের প্রায় প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরে রলাঁ লোকচক্ষুর নিভৃত অন্তরালে এই মহান্ জীবনের সাধনাতে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মানবজাতির এক মহাসংকট মুহূর্তে যখন সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন থেকেই তিনি চিন্তা-জগতের ঝটিকা-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালেন। এই কাজের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই নেমেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্টেফান ৎেজায়াইগ (Stefan Zweig) লিখেছিলেন :

"যে বিরাট সৌধ তিনি রচনা করেছিলেন তার ভিত্তি স্থাপিত ছিল জ্ঞানের সুদৃঢ় জমির গম্ভীরে···এই শক্তিশালী ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত তাঁর বলিষ্ঠ নৈতিক প্রেরণাই রলাঁকে মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ঝড়ে অটল রেখেছিল। তখন যেসব সুবিখ্যাত স্তম্ভগুলির দিকে আমরা সসম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকতাম, সেগুলিতে যখন ফাটল ধরতে লাগল, ভূমিকম্পে সেগুলি যখন ধ্বসে পড়তে লাগল, তখন একমাত্র রলাঁর স্তম্ভই 'যুদ্ধের ঊর্ধ্বে' সুবিধাবাদী বিভ্রান্তিকর মতামতের ঊর্ধ্বে উচ্চশিরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয়েছিল; সেই সময়ে দুনিয়াব্যাপী প্রলয়কালে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের আশ্রয়স্থলরূপে এই অটল-অনড় স্তম্ভটির দিকেই সাগ্রহে তাকিয়েছিলেন।"

শিক্ষার জন্য ছোট শহর ক্লামেসিতে ভাল ব্যবস্থা না থাকাতে, রলাঁকে তাঁর পিতামাতা পারীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এই রুগ্ন বালককে পারীর মহাসমুদ্রে কি একাকী ছেড়ে দেওয়া যায়? রলাঁর পিতা ছিলেন ক্লামেসিতে আইন-ব্যবসায়ী নোটারী; তাঁর পূর্বতন পাঁচ পুরুষ ও মাতার দিক থেকে তিন পুরুষের এই জীবিকা। ক্লামেসিতে রলাঁ-পরিবার সচ্ছল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এবং সেখানে রলাঁর পিতা ছিলেন সবথেকে গণ্যমান্য ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও পুত্রের শিক্ষার জন্য সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে পারীতে একটা ব্যাঙ্কে সামান্য কেরানীর কাজ নিয়ে সপরিবারে চলে গেলেন। ত্যাগ ও দায়িত্ব বোধের এই চমৎকার শিক্ষা পিতার নিকট থেকে রলাঁ পেয়েছিলেন সারাজীবনের জন্য।

পারীতে এসে রলাঁ একটা বিখ্যাত 'লিসেতে' (উচ্চ-বিদ্যালয়) ভর্তি হলেন। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে রলাঁ এই লিসেতেই পল ক্লোদেলকে (Paul Claudel)

তাঁর সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন। ২০ বৎসর পর দুজনেই একই সময়ে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকরূপে শুধু ফ্রান্সেই নয়, সমগ্র ইয়োরোপে অকস্মাৎ খ্যাতিমান হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়েই পরস্পর-বিরোধী মতবাদ অনুসরণ করেছিলেন: ক্লোদেল ব্যক্তি-মানুষের মুক্তির-সন্ধান পেয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদে, আর রলাঁ হয়েছিলেন সমগ্র মানব-জাতির আত্মিক ও জাগতিক মুক্তি-সংগ্রামের অবিশ্রান্ত চলমান পথিকৃত।

লিসে থেকে রলাঁ গেলেন নর্মাল স্কুলে। এই স্কুল আবাসিক, শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দিনরাত অধ্যয়নে রত থাকতে হয়, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শই থাকে না। ফ্রান্সে সঁ্যা ছির-এর (Saint Cyr) স্কুলে যেমন সেনা-বাহিনীর জন্য অফিসারদের শিক্ষা দেওয়া হতো, নর্মাল স্কুলও তেমনই ছিল বুদ্ধিজীবীদের জেনেরাল স্টাফ তৈরির কেন্দ্র। ফ্রান্সের অনেক বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীই এই স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই স্কুলের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য সুনিয়মিতভাবে পড়াশোনার উপর জোর দেওয়া হতো।

রলাঁ লিসেতে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে ক্লোদেলকে পেয়েছিলেন, নর্মাল স্কুলেও তেমনই পেয়েছিলেন আঁদ্রে ছুয়ারেজ (Andre Suarez) ও শার্ল পেগ্যীকে (Charles Peguy)। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের নব জাগরণে এঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রলাঁকে এই স্কুলে গ্রীক, লাতিন, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল সবই পড়তে হয়েছিল। কঠোর পরিশ্রম সহকারে সুশৃঙ্খলভাবে মননশীল কাজ করার ক্ষমতা তিনি এইখানেই অর্জন করেছিলেন। এই স্কুলে রলাঁ শিক্ষকদের মধ্যে পেয়েছিলেন বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ব্রুনটিয়ের (Brunetiere), মনীষী গাব্রিয়েল মোনো (Monod) এবং তরুণ ও জনপ্রিয় অধ্যাপক আঁরি বের্গস (Henri Bergson)-কে। এঁরা সকলেই ছাত্রদের পুরাতন সংস্কার থেকে মুক্ত করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে খুব সাহায্য করতেন।

এই সময়ে রলাঁকে যাঁদের লেখা খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন দান্তে (Dante), স্পিনোজা (Spinoza), রুসো (Rousseau), র‍্যানেইসান্সের ঐতিহাসিক ইয়াকব বুর্কহার্ড (Jacob Burckhardt), ডেকার্ত (Descartes), শেক্সপীয়ার, ভিকটর উ্যগো (Victor Hugo), দস্তৈয়েভস্কি (Dostoievsky), ইবসেন, ডিকেন্স, মঁটেইন (Montaigne), ভলটেইর (Voltaire) ইত্যাদি। এইসব পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সঙ্গীতচর্চা। জীবনের যে ভিত্তি তিনি পূর্বে স্থাপন করেছিলেন, এখন থেকে তার উপর ক্রমশঃ সৌধ রচনা হতে লাগলো।

এই সময়ে রলাঁ ও তার সঙ্গীদের আর একটি মহান্ আবিষ্কার টলস্টয়। টলস্টয় এই তরুণদের মধ্যে একটা নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন এবং রলাঁর কথায়, "এই অসীম

বিশ্বের একটি দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছিলেন।" ঠিক এই সময় টলস্টয়ের *What is to be done?* নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। তাতে টলস্টয় সমস্ত চারুকলাকেই প্রচণ্ড-ভাবে আক্রমণ করেছিলেন; বেট্‌হোফেনকে বলেছিলেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রলুব্ধকারী ("a seducer to sensuality,") শেক্সপীয়ারকে বললেন একজন চতুর্থশ্রেণীর কবি ও কুখ্যাত অকেজো ব্যক্তি, আর সঙ্গীত সম্বন্ধে বললেন একটা বিলাসিতা যা মানুষকে কর্তব্যকর্ম অবহেলা করতে শেখায়। স্বভাবতই রলাঁ ও তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। রলাঁর এক আদর্শপুরুষ অন্য আদর্শপুরুষদের এইভাবে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলেন? বালক রলাঁ বিশ্ববিখ্যাত টলস্টয়কে খুব ইতস্ততার সঙ্গে ও ভয়ে ভয়ে একখানা চিঠি লিখলেন—উত্তর পাবার আশায় নয়, হৃদয়ের আবেগ পরিতৃপ্ত করার জন্য।

কয়েক মাস পরে "প্রিয় ভ্রাতা"র নিকট উত্তর কিন্তু ঠিক এসে হাজির হলো—ফরাসী ভাষায় ৩৮ পৃষ্ঠা, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৮৭ তারিখের লেখা: "আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার হৃদয় তা স্পর্শ করেছে। আমি সজল নয়নে তোমার চিঠি পড়েছি।" তার পর টলস্টয় চারুকলা সম্বন্ধে লিখলেন যে কেবলমাত্র সেই শিল্পেরই মূল্য আছে যা মানুষকে একতাসূত্রে বাঁধে; শুধু সেই শিল্পীকেই গ্রহণ করা যায় যিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। শিল্পের মহান্ চরিত্র হচ্ছে—শিল্পকে ভালবাসা নয়—মানবজাতিকে ভালবাসা।

এসব ছাড়াও যা তরুণ রলাঁকে অভিভূত করেছিল তা হলো এই যে একজন অজ্ঞাত, অখ্যাত, অপরিচিত ভ্রাতাকে মানবিক সাহায্যদানে একজন জগদ্বিখ্যাত মহান্ পুরুষের এই তৎপরতা, এই ব্যাকুল আগ্রহ। তাঁর জীবনের একটা গুরুতর আধ্যাত্মিক সংকটের সময় রলাঁ বহু দূরের একজন বিদেশী মনীষীর এই যে মহামূল্যবান সাহায্য পেয়েছিলেন, তা তাঁর জীবনে সব থেকে মূল্যবান সৃজনশীল সম্পদ হয়ে রইল। সংকটকালে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে এইরূপ সাহায্যদান করা শিল্পীর পবিত্র কর্ম বলে নিজের জীবনে রলাঁ গ্রহণ করেছিলেন। যে বীজ টলস্টয় তাঁর অজ্ঞাত অপরিচিত ভ্রাতার হৃদয়ে বপন করেছিলেন, সেই বীজেরই অসংখ্য ফসল পৃথিবীর সব দেশের অগণিত বুদ্ধিজীবী ও সংগ্রামী শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে রলাঁ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, এমনকি নাট্সী-অধিকৃত ফ্রান্সের সেই বিপদ-সংকুল অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে বাস করার সময়ও এবং গেস্টাপো পরিবেষ্টিত হয়েও রলাঁ তাঁর শেষজীবনে ফ্রান্সের আত্মগোপনকারী মুক্তি যোদ্ধাদের যে-নৈতিক সাহায্যদানে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন তা তাঁর *Lettres a` Un Combattant de la Resistance*-এ সাক্ষ্য বহন করবে ও সকল দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দেবে।

পারিপার্শ্বিকতা

নর্মাল স্কুলের যেসব ছাত্ররা বৃত্তি পেয়েছিল, রলাঁ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। এই বৃত্তি নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে তিনি রোমে যান। তাঁর শিক্ষক মোনোর নির্দেশ অনুযায়ী সেখানে তিনি বিখ্যাত বিদুষী জার্মান মহিলা মালভিদা ফন্ মাইসেনবুর্গের (Malwida von Meysenburg) সঙ্গে দেখা করেন। মাইসেনবুর্গ ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশ-গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁকে সারা জীবন নির্বাসনেই কাটাতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ শিক্ষিতা ও কৃষ্টিসম্পন্না এবং একনিষ্ঠ আদর্শবাদী; আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি কোনো দিনই আপস করেন নি। ভাগনার (Wagner), নীটস্‌শে (Nietzche), মাট্‌সিনি (Mazzini), হেরজেন (Herzen), কোস্থুথ (Kossuth) প্রমুখ মনীষীরা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। জাতি, ধর্ম, ভাষার কোনো বাধা তিনি মানতেন না, যে-কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে তিনি অভিনন্দন জানাতেন। তৎকালীন ইউরোপীয় মনের সঙ্গে তিনিই রলাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এই বিদুষী মহিলার সংস্পর্শে এসে

রলাঁ যে কতখানি উপকৃত হয়েছিলেন, তা তাঁর একখানা বইতেই তিনি লিখে গিয়েছেন। মালভিদাও রলাঁর প্রতিভা ও আদর্শনিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর দিনপঞ্জীতে রলাঁর খ্যাতিলাভের বিশ বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন :

"এই ফরাসী যুবকটির মধ্যে আমি দেখছি সেই উচ্চ আদর্শ, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সেই সর্বব্যাপ্ত ক্ষুরধার বুদ্ধি, যা আমি দেখেছি অন্যান্য জাতির শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়কদের মধ্যে।"

ইতালিতে থাকাকালীন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তার সঙ্গীত ও তার শতাব্দীসঞ্চিত শিল্প, বিশেষ ক'রে র‍্যনেইসান্স-যুগের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য, এবং সর্বোপরি মিকেল আঞ্জেলোর (Michel Angelo) কীর্তি রলাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ইতালিতেই তিনি চারুশিল্পের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

ইতালিতে দুবছর কাটিয়ে পারীতে ফিরে এসে রলাঁ প্রথমে নর্মাল স্কুলে ও তারপর ১৯০৩ সাল থেকে সরবন (Sorbonne) বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত-ইতিহাসের অধ্যাপক হন। রলাঁ এতদিন ধরে মানবসভ্যতার যে প্রাণবস্তু খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তা এই অধ্যাপনা-কালেই আবিষ্কার করলেন। যুগে যুগে প্রত্যেক জাতিই কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন ক'রে থাকে, কিন্তু সে-মহত্ত্ব কোনো জাতিতে বা কোনো একটা যুগে সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন দেশের মানুষের এই অবদানগুলি তার জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক, একটা উন্নততর ঐক্যের সৃষ্টি করে, সেখানে জাতি বা যুগের কোনো পার্থক্য থাকে না। এই আলোকবর্তিকাই এক মহাপুরুষ থেকে

আর এক মহাপুরুষে হস্তান্তরিত হয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে মানবসভ্যতার পথ দেখিয়ে দেয়। সঙ্গীতে ও সঙ্গীতের ইতিহাসে রলাঁ এই বিশ্ববাণীই শুনতে পেয়েছিলেন।

এই সময়ে রলাঁ ইয়োরোপের সঙ্গীতকারদের সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ লেখেন, যেমন *Old Musicians, Haendel, History of Opera, Musicians of Today,* যা সঙ্গীতের ছাত্রদের খুবই প্রয়োজনীয়।

রলাঁর বয়স এখন ত্রিশ। তিনি জীবনসংগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছেন। কি পরিবেশে এই সংগ্রাম? কার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম? কিসের জন্য, কার জন্য এই সংগ্রাম?

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের নিষ্ফলতা, ১৮৭০ সালে জার্মানীর নিকট কলঙ্কজনক পরাজয়, ১৮৭১ সালে পারী কমিউনের বিফলতা ফরাসী বিপ্লবের মহান স্বপ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর ফ্রান্সের এক বন্ধ্যা যুগ। সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে সর্বত্র বিপুল নিরাশা ও অনিশ্চয়তা, যুবশক্তি লক্ষ্যভ্রষ্ট, নিস্তেজ, নীতিবোধবর্জিত। চিন্তা ও বুদ্ধির এই দৈন্য থেকে তাদের উদ্ধার করার মত কেউ ছিল না। অন্ধকারে লেখকরা অস্থানে কুস্থানে আনাচে-কানাচে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। ধনিক শ্রেণীর ও শাসক-শ্রেণীর দুর্নীতি ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনকে দুর্গন্ধময় ও দূষিত ক'রে তুলেছিল। আধ্যাত্মিক দৈন্য ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল, সর্বক্ষেত্রেই পরাজিত মনোভাব। যে ফ্রান্স

কিছুদিন পূর্বেও ছিল কৃষ্টিতে অগ্রণী, রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু, প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার প্রবর্তক, সেই ফ্রান্স আজ পৌরুষ-শূন্য, অবসন্ন, অবনত। তার রাজনীতিও দুর্নীতি-পরায়ণ ও মর্যাদাবোধহীন।

জোলা ও মোপাসাঁর প্রতিভা প্রাণহীন হাল্কা সাহিত্য রচনাতেই নিঃশেষিত হলো। জোলা প্রাণবন্ত শ্রমিকজীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও নীতিভ্রষ্ট নিবীর্য শিক্ষিত সমাজের লালসার ইন্ধন যুগিয়ে সাহিত্যে স্বাভাবিকতাবাদের থিওরী দিয়ে গেলেন। আর একদল শিল্পী থেওফিল গোতিয়ে'র (Theophile Gautier) নেতৃত্বে মনুষ্যসমাজ ত্যাগ ক'রে আশ্রয় নিলেন স্বরচিত সৌখিন এক-একটি গজদন্ত প্রাসাদে ও তার মিনার থেকে উড়িয়ে দিলেন 'শিল্পের জন্যই শিল্প'—art for art's sake-এর রেশমী পতাকা। কিন্তু দুর্গ রচনার জন্য গজদন্ত তো প্রকৃষ্ট দ্রব্য নয়; তার ফলে তাঁদের পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হলো না।

শার্ল বোদলেইর (Charles Baudelaire), যিনি শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ব্যারিকেডে লড়েছিলেন, অতি অধঃপতিত অবস্থায় তাঁর শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছিল। পল ভেরলেইনের (Paul Verlaine) পরিণতিও তদনুরূপ। জেরার দ্য নেরভাল (Gerard de Nerval) আত্মহত্যা করলেন। র‍ঁ্যাবো (Rimbaud), পারী কমিউনের তরুণ কবি, যিনি কমিউনের জন্য আদর্শ সংবিধান তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যিনি

বুর্জোয়াশ্রেণীকে আন্তরিক ঘৃণা করতেন, কয়েকটি অনবদ্য কবিতা লেখার পর লেখা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন আবিসিনিয়ায় এবং সেখানে অস্ত্র, কৃতদাস আর নারীর ব্যবসায়ে বুর্জোয়া লোভের চরিতার্থ ক'রে শোচনীয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। গোগাঁ্যা (Gauguin) সভ্য সমাজ ছেড়ে চলে গেলেন প্রশান্ত মহাসাগরের টাহিটি দ্বীপে প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজে বাস করবার জন্য ও তিনি চাইলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি দিয়ে চালা ঘরের বেড়া তৈরি করতে । সেজান (Cezanne) তাঁর ছবিগুলি এক গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, আর ভান গঘ্ (Van Gogh) তাঁর শেষ জীবন পাগলাগারদে কাটালেন। প্রতিভাবান লেখক ফ্লোবের (Flaubert) বুর্জোয়া সমাজের প্রতি একটা নেতিবাচক ঘৃণাতেই নিজেকে দগ্ধ করলেন, কোনো ইতিবাচক দর্শন দিতে পারলেন না। ফ্লোবেরের কথাতেই এ যুগের ফ্রান্সের লেখকদের আদর্শ চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে : "আমি এমন একটা বই লিখতে চাই যার কোনো বিষয়বস্তু থাকবে না (a book about nothing), এমন একটা বই যার বাহ্যিক জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকবে না ; পৃথিবী যেমন শূন্যে নিজেকে ধরে রাখে, এ বইও তার রচনাশৈলীর দ্বারা নিজেকে বহন করবে।" অর্থাৎ সাহিত্যে নির্বাণ! আর একজন প্রতিভাবান লেখন আনাতোল ফ্রান্স (Anatole France) বিদ্রূপবানে বুর্জোয়া সমাজকে জর্জরিত করে তুললেও তাঁর সন্দেহবাদ, অবিশ্বাস ও আত্মসমর্পিত প্রজ্ঞা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে নি।

উ্যগো, র‍্যনাঁ (Renan), তেইন (Taine) প্রমুখ মনীষীরা এই স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। ড্রেইফুস ঘটনার (Dreyfuss Affair) মতো কলঙ্কজনক কাহিনী প্রমাণ ক'রে দিল ফরাসী সমাজ, ফরাসী রাজনীতি, কতটা নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল।

ফ্রান্সের এই অধঃপতনের যুগে আর একদল লোকেরও আবির্ভাব হলো—তারা হলো জাতীয়তাবাদী। তারা চিৎকার শুরু করল: 'পরাজয়ের প্রতিশোধ চাই।' দিনের পর দিন তারা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখে জাতিবিদ্বেষ ও যুদ্ধকে গৌরবময় ক'রে তুলল। ১৮৭০ সালের পরাজয়ের ক্ষতস্থানকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে রেখে তরুণদের মন বিষাক্ত ক'রে তুলল। ক্যাথলিক ধর্মকেও তারা জাতিবিদ্বেষের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল ও পুরাতন ধর্মযুদ্ধের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। রলাঁর বাল্য বন্ধু ক্লোদেল এই দলে যোগ দিয়েছিলেন, এমনকি পেগ্যীও এদিকে ঝুঁকেছিলেন। মোরিস বারেস (Maurice Bares) ও শার্ল মোরাস (Charles Mauras) ছিলেন এই দলের প্রধান পুরোহিত। প্রকৃতপক্ষে এঁরা ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদেরই প্রতিনিধি। এই দ্বন্দ্ব ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়াল।

সংগ্রামের পথে : গণনাট্য

ফ্রান্স অবনতির চরম সীমায় পৌঁছলেও ফরাসী বিপ্লবের দীপশিখা তখনও একেবারে নিভে যায় নি। ফ্রান্সকে সেই মহান্ ঐতিহ্যে পুনরুজ্জীবীত ক'রে তোলার জন্য এক নতুন যুবশক্তি অগ্রসর হলো। ত্যাগ ও আদর্শের পথ বেছে নিয়ে রলাঁ, পেগ্যী, ছুয়ারেজ সংগ্রামের পথে নামলেন—*Cahiers de la quinzaine* নাম দিয়ে এক পত্রিকা বার করলেন। এঁদের কারুরই অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল না, অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। অনেক ত্যাগ স্বীকার ক'রে এবং কঠোর পরিশ্রম ক'রে এই পত্রিকা বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পনর বৎসর ধরে তাঁরা চালিয়েছিলেন। রলাঁর বহু নাটক, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'জাঁ-ক্রিস্তফ', 'বেট্‌হোফেন', 'মিকেল আঞ্জেলো', রলাঁর নিকট টলস্টয়ের চিঠি ইত্যাদি এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

শেক্সপীয়ার থেকেই রলাঁ বুঝতে পেরেছিলেন নাটকের গুরুত্ব। তখনকার ফ্রান্সের অবনত অবস্থায় সাহিত্যের মতই নাটকও ছিল অধঃপতিত বুর্জোয়া সমাজের চিত্তবিনোদনের জন্য

অবৈধপ্রেম ও যৌনকেন্দ্রিক। এই স্রোতের বিরুদ্ধে ১৮৯৫ থেকে ১৯০০—এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে রলাঁ তিনটি নাটক লিখলেন (সবসুদ্ধ রলাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা হচ্ছে ষোল) *Saint Louis* (১৮৯৭), *Aert* (১৮৯৭), *Triomphe de la Raison* (১৮৯৯)। এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, জাতির প্রতি বিশ্বাস, মুক্তিবাদে বিশ্বাস,—এবং প্রত্যেকটির পটভূমি ছিল পরাজয়। পরাজয়ের দুঃখ-বেদনা থেকে আসে মানুষের কর্মপ্রেরণা, আত্মবিশ্বাস, আত্মত্যাগ। এই দুঃখের মধ্যে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামই মানুষের মহত্ত্ব। যে জাতি তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, তার মধ্যে আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল এই নাটকগুলির উদ্দেশ্য। কি ক'রে এই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়? "যুক্তির জয়"-এর নায়ক বিপ্লবী উ্যগ (Hugot) জবাব দিলেন: "আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মহৎ হওয়া, পৃথিবীতে মহত্ত্বকে রক্ষা করা।" রলাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটা মূলমন্ত্র। রলাঁ এই সিরিজের নাটকগুলির নাম দিয়েছিলেন *Tragedies of Faith*।

Tragedies of Faith-এর নাটকগুলি শেষ হতে না হতেই রলাঁ আরও একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র নিয়ে আর-একটা নাট্য-অভিযান শুরু করলেন—গণ-নাট্য (*People's Theatre*)। রলাঁ বুঝতে পারলেন যে নাটক শুধু eliteদের জন্য—বাছাই করা লোকদের জন্য—লিখলেই চলবে না, নাটক লিখতে হবে জনসাধারণের জন্য; চাই জনগণের জন্য শিল্প, শিল্পের জন্য

জনগণ—art for the people, the people for art। তিনি বললেন শুধু পুরোনো থিয়েটারগুলির নতুন নাম, জনগণের নাম দিলেই চলবে না, চাই নতুন নাটক, নতুন শিল্প, চাই নতুন জগতের জন্য, জনগণের জন্য থিয়েটার, জনগণের দ্বারা থিয়েটার। সুতরাং জনগণের নাটক লিখবার জন্য রলাঁ চলে গেলেন সোজা ফরাসী বিপ্লবে। বিপ্লবের সমস্ত দিকগুলি—তার উত্থান, তার রাজনীতি, তার দ্বন্দ্ব, তার মানুষ—সব দেখাবার জন্য রলাঁ দশটি নাটকের পরিকল্পনা করলেন।

এর ওপর রলাঁ কতকগুলি প্রবন্ধ ও ইস্তেহার লিখে ফেললেন (*Théâtre du Peuple*), তারপর লিখলেন কয়েকটি নাটক। লিখলেন *Les Loups* (নেকড়ে, ১৮৯৮)—ড্রেইফুস ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে স্বার্থপর ফরাসী শাসকশ্রেণীর দুর্নীতি ও তাদের কপট স্বাদেশীকতাকে আক্রমণ ক'রে।[১]

---

[১] ড্রেইফুস ঘটনা শুধু ফ্রান্সেই নয়, দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা তখন যে একটা চক্রান্তের জাল দেশময় বিস্তার করেছিল, ড্রেইফুস ঘটনা সৈন্যবাহিনীতে তারই একটা প্রতিফলন মাত্র। ড্রেইফুস ছিলেন সৈন্যবাহিনীতে একজন ক্যাপ্টেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ইহুদী। নিজেদের দুর্নীতি ও অক্ষমতা চাপা দেবার জন্য ও জনমতকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ প্রচার প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে একটা প্রধান অস্ত্র। মেজর এস্টারহাজী একটা জাল দলিল দাখিল ক'রে অভিযোগ আনলেন যে ড্রেইফুস গোপনীয় সামরিক তথ্য জার্মানদের হাতে তুলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। ১৮৯৩ সালে সামরিক আদালতের বিচারে ড্রেইফুসের সশ্রম যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলো। দুই বৎসর পর কর্নেল পিকার (Colonel Piquart) তথ্য

এই নাটক যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় তখন এমিল জোলা ও সমাজতান্ত্রিক নেতা জাঁ-জোরেস উপস্থিত ছিলেন। Danton (১৯০০)—দাঁত ও রোবসপিয়ের-এর মধ্যে, স্বাধীনতা ও ন্যায়-বিচারের মধ্যে সংঘর্ষ। *Le Quatorze Jullet* (১৯০২)—"১৪ই জুলাই"-এর বিষয়বস্তু ঐক্যবদ্ধ জনগণের বৈপ্লবিক শক্তি—যে-শক্তি বাস্তীর (Bastille) শক্তিশালী কুখ্যাত বন্দীদুর্গ ধ্বংস ক'রে

প্রমাণ দিয়ে ঘোষণা করলেন যে এস্টারহাজী একজন জালিয়াত, ড্রেইফুস সম্পূর্ণ নির্দোষ। দেশময় তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেল—ফ্রান্স দুইটি বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল, গৃহযুদ্ধের অবস্থার সৃষ্টি হলো। জোলা, আনাতোল ফ্রান্স, জোরেস, ক্লেমাঁসো প্রমুখের নেতৃত্বে জনসাধারণ পুনর্বিচার, ন্যায় বিচারের দাবি করলো। কয়েকবার পুনর্বিচারের প্রহসন হলো এবং প্রতিবারই ড্রেইফুস দোষী প্রমাণিত হলেন। আইন, আদালত, বিচারপতি, মন্ত্রী, বুরোক্র্যাট, আরিস্টোক্র্যাট, পাদ্রী, সংবাদপত্র সবই দুর্নীতি-পরায়ণ, সুবিচার বলে কিছু নেই তখন ফ্রান্সে। প্রশ্ন দাঁড়াল এই যে ফ্রান্স একটা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশ থাকবে, না, একটা বর্বর স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রে পরিণত হবে। এটা প্রতিটি মানুষের বিবেকের প্রশ্ন তো বটেই, তাছাড়া একটা মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নও বটে। এই সময়ে জোলা ড্রেইফুসের সমর্থনে তাঁর বিখ্যাত *Jaccuse* লিখেছিলেন, যার জন্য তাঁরও কারাদণ্ড হলো, কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে চলে গিয়ে গ্রেফতারের হাত থেকে বাঁচলেন এবং সেখান থেকে আন্দোলন চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তিরই জয় হলো। ১২ বৎসর পর ১৯০৬ সালের শেষ-পুনর্বিচারে প্রমাণ হলো ড্রেইফুস নির্দোষ, এস্টারহাজীই জালিয়াত। (রলাঁর *Les Loups* যখন মঞ্চস্থ হয়েছিল তখন থিয়েটারের মধ্যে একদল দর্শক স্লোগান দিয়েছিল, "এস্টারহাজী জিন্দাবাদ," তার প্রত্যুত্তরে অন্য দলের স্লোগান ছিল, "পিকার জিন্দাবাদ"।)

দিয়েছিল। এ নাটকেরও মূল বক্তব্য কর্মপ্রেরণা ও আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন। রল াঁর পূর্বের নাটকগুলিতে এলিতই (elite) ছিল হিরো, তাঁদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তির উপরই তাঁর বিশ্বাস, কিন্তু "১৪ই জুলাই"-এর হিরো হলো জনসাধারণের বৈপ্লবিক শক্তি।[১] রোবসপিয়ের (Robespierre)-এর উপরও একখানা নাটক রলাঁ শুরু করেছিলেন। এই নাটকগুলির তিনি নাম দিয়েছিলেন *Tragedies of the Revolution*। গণনাট্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধগুলি ১৯০৩ সালে *Le Théâtre du Peuple* নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়কার রলাঁর আর একখানি নাটক হলো *Le Temps Viendra* (১৯০৩)— "সেদিন আসিবে"—বুয়ার যুদ্ধের ওপর, যার বিষয়বস্তু হলো সার্বজনীন নৈতিক প্রশ্ন।

এই নাটকগুলিতে রলাঁর তিনটি চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে: মানবসমাজে অগ্রদূত 'এলিত'দের (elite) ধারণা, যে-এলিত সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য দুঃখবরণ ক'রে নেয় এবং আত্মোৎসর্গ করে, মানবজাতিকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর ক'রে নিয়ে যায়; পরাজয়কে নৈতিক জয়ে পরিণত করার

---

১ "১৪ই জুলাই"-এর ভূমিকায় রলাঁ লিখেছেন: "I have endeavoured to make the heroism live again and to recapture the faith of a nation in the throes of a revolution···in order that we, a nation of greater maturity...may continue and finish the work interrupted in 1794...The end of art is not a dream, but life. Action should spring from the spectacle of action."

ধারণা ; জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে বিশ্বাস। আত্মোপলব্ধি ও জনগণের কল্যাণ, এই দুইয়ের মধ্যে রলাঁর বিবেক বহুদিন বিভক্ত ছিল, এবং তাঁর পরবর্তী রচনা "জাঁ-ক্রিস্তফ,[১]" "বিমুগ্ধ আত্মা[২]" ইত্যাদি বইগুলিতেও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভালভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জনগণের নৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিশ্বাসী হয়েও, এলিতের ভূমিকায় জোর দিয়েছেন, তাতে জনগণের ভূমিকাকে অস্বীকারই করা হয়েছে। এই স্ববিরোধিতা অনেক সময়ে তাঁর অগ্রগতিতে বহু বাধার সৃষ্টি করেছে এবং তাঁকে অনেক আবিল অবস্থার মধ্যে ফেলেছে, তবে রলাঁর কৃতিত্ব এই যে, দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রাম ক'রে বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করতে পেরেছিলেন। রলাঁর "শিল্পীর নবজন্ম"[৩] এবং "সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি"[৪]—"*Par la Revolution la Paix*" তাঁর এই জয়ের সাক্ষ্য বহন করে। তাই রলাঁ হলেন বর্তমান বুদ্ধিজীবী-জগতের একজন অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

---

১. প্রথম পাঁচ খণ্ড ("উষার আলো," "প্রভাত," "বয়ঃসন্ধি," "বিদ্রোহ," "জনারণ্য") বাঙলায় প্রকাশিত হয়েছে।

২. প্রথম তিন খণ্ড ("দুইবোন," "সুদূরের পিয়াসী," "মা ও ছেলে") বাঙলায় প্রকাশিত হয়েছে : চতুর্থ খণ্ড "একটি যুগের মৃত্যু" যন্ত্রস্থ।

৩. অধ্যাপক সেলভাঙ্কর "*Quinze Ans de Combat*"-এর ইংরাজী অনুবাদ করেন *I Will Not Rest* নামে ; বাঙলায় অনুবাদ করেছেন সরোজ দত্ত ১৯৪৪এ।

৪ ইংরাজী অনুবাদ অপ্রকাশিত।

সাধনা : "জ াঁ-ক্রিসতফ"

নাটক ও গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মৃতপ্রায় জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য রলাঁ যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হলো। ড্রেইফুস ঘটনার ফলে যে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিশেষ কিছু সুফল ফলল না। গণতন্ত্র রক্ষা পেল বটে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলরাই ক্ষমতা ভোগ করতে লাগল, জনসাধারণের বিশেষ কিছু লাভ হলো না।

জাঁ-জোরেস রলাঁকে সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট ক'রেছিলেন, কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা সংস্কারকর্মের উপর রলাঁর কোনো আস্থা ছিল না, তাদের নেতারাও অন্যান্যদের মতো দুর্নীতিপরায়ণ। তখনকার রাজনীতি তাঁকে আকর্ষণ করতে পারল না।

সব দিক থেকে রলাঁ খুব নিরাশ হলেন। এই সময় রলাঁর পত্নীবিয়োগ হলো—একটা মস্ত আঘাত পেলেন জীবনে। তিনি থিয়েটার ছেড়ে দিলেন ও অধ্যাপকের চাকুরিতে ইস্তফা দিলেন। পারীর দরিদ্র অধ্যুষিত অঞ্চল বুলভার মঁপানসের একটা বাড়ির চিলে-ছাদে দু'খানা ঘর নিয়ে তিনি

বাসা বাঁধলেন—যেখানে অতগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাঁর একাগ্র সাধনায় বড় কেউ একটা ব্যাঘাত ঘটাবে না। ঘর দুখানাই বইতে ভর্তি, আর একটা পিয়ানো। জগতের সঙ্গে প্রায় সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ ক'রে রলাঁ সেখানে ঢুকলেন।

রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, গত কয়েক বৎসরে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে, তাই নিরাশ হলেও তিনি নিরুদ্যম হননি। অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে "জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি বিশ্বাসের জন্য" আরও কঠোর সংগ্রাম তাঁকে করতে হবে এই তাঁর প্রতিজ্ঞা। তাঁর একমাত্র সাথী হলেন বেট্‌হোফেন, মিকেল আঞ্জেলো, আর টলস্টয়। তাঁরা শিল্পদ্বারা জীবনকে জয় করেছিলেন—তিনিও তাই করবেন। একমাত্র আদর্শবাদী মানুষই রলাঁর কাছে জীবন্ত মানুষ, তাঁরাই প্রকৃত বীর। যাঁরা নীচতা ও ক্ষুদ্রতার সঙ্গে আপস করেন না, লোভ ও স্বার্থপরতার কাছে মাথা নোয়ান না, যাঁদের জীবন এ সবের বিরুদ্ধে একটা কঠিন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, তাঁরাই বীর। দশ বৎসর ধরে রলাঁ এই কঠোর সাধনায় বিভোর হয়ে রইলেন, বিশেষ কেউ জানলো না যে রমঁ্যা রলাঁ নামে একজন লোক আছেন এই দেশেই।

একদিন ১৯১০ সালে লাইব্রেরি থেকে বাসায় ফিরবার পথে মটরগাড়ি চাপা পড়ে তাঁর প্রাণ হারাবার অবস্থা। দু মাস হাসপাতালে তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হলো; বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু চিরকালের মতো বাঁ হাত ও বাঁ পা জখম হয়ে গেল।

এই সাধনার ফল স্বরূপ আমরা পেলাম "বেট্‌হোফেন" (১৯০৩), "মিকেল আঞ্জেলো" (১৯০৫), "টলস্টয়" (১৯১১) মহান পুরুষদের জীবনীমালা—এবং সর্বোপরি বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, "জঁা-ক্রিস্তফ"—(*Jean Christophe*), যার স্থান টলস্টয়ের *War and Peace*-এরই পাশে।

'বেট্‌হোফেন'-এর মুখবন্ধে রলঁা লিখলেন :

"বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কদর্য দূষিত আবহাওয়ায় পুরানো ইয়োরোপের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।···জানালাগুলো সম্পূর্ণ খুলে দাও। পবিত্র বাতাসে ঘর ভরে যাক। বীরদের আত্মার হাওয়ায় বুক পূর্ণ ক'রে নেবো।"

এই জীবনীগুলি তথ্যমূলক গবেষণার মামুলি জীবনী নয়; এক নতুন ধরনের শিল্পকর্ম, কাব্য। সত্য ও কল্পনা, তথ্য ও আবেগ, বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্ব মিশিয়ে জীবনী রচনায় রলঁা এক নতুনত্ব এনে দিলেন। অনেক স্থানে বেট্‌হোফেন, মিকেল আঞ্জেলো ও টলস্টয়ের জীবনের সঙ্গে রলঁার নিজের জীবনও মিশে গিয়েছে। শিল্পীর সুর, রঙ, লাইন, বা কথার উপরে জোর না দিয়ে, শিল্পী-মানসের আবিষ্কারের দিকেই রলঁা বেশী জোর দিয়েছেন। সব জীবনীগুলিরই প্রধান বক্তব্য—দুঃখ ভোগের বীরত্ব, দুঃখের সঙ্গে অতিমানবীয় সংগ্রাম (যেমন বিচিত্র প্রাণ মাতান সুরধ্বনির সম্রাট বেট্‌হোফেনের নিষ্ঠুর বধিরতা)। এঁদের শিল্প সম্বন্ধে রলঁা বলেছেন :

"মহান্ শিল্পকর্মগুলিতে সময় যেন নিশ্চল, যেন অতীত মিশে গিয়েছে, বর্তমানও রেখাহীন। শুধু ভবিষ্যৎ দূর থেকে উঁকি মারে। এই

জন্যেই প্রত্যেক মহান্ শিল্পী যুগের চেয়ে অগ্রগামী ভবিষ্যদ্বক্তা! এই জন্যই সমসাময়িক-কাল তাঁদের ক্রুশবিদ্ধ করে।”

রলাঁ যখন টলস্টয় লেখেন তখন তাঁর শিল্প ও সঙ্গীত রাজনীতির অনেক গবেষণা হয়ে গিয়েছে, কয়েকটি নাটক, “বেট্‌হোফেন,” “মিকেল আঞ্জেলো” শেষ হয়েছে, “জাঁ-ক্রিস্‌তফ”ও প্রায় শেষ—শিল্পীর অনুভূতি মিশ্রিত সজাগ ক্ষুরধার বুদ্ধি তখন আরও তীক্ষ্ণ। তাঁর শিল্প-চেতনা ও দৃষ্টিকোণের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও টলস্টয়ের সৃষ্টিতে তিনি দুঃখভোগের বীরত্বকেই দেখছেন, তবে এ দুঃখভোগ বেট্‌হোফেনের মতো অদৃষ্টজাত নয়, এ দুঃখভোগ স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেওয়া আত্মশুদ্ধির-সাধনার দুঃখভোগ. :বট্‌হোফেন ও মিকেল আঞ্জেলো বাস করতেন অনেক ঊর্ধ্বে, আকাশের অন্তরালে, ‘in der luft’। তাঁরা যে শিল্প রচনা করেছিলেন তা সমস্ত নৈতিক মানের “ঊর্ধ্বে,” তা কাল-পাত্র-দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের মন ও হৃদয়কে উন্নত করে।

টলস্টয় সে-ধরনের শিল্পী নন; তিনি লেখক; আবার তিনি শুধু লেখকই নন, সচেতন লেখক; তাঁর জীবনদর্শন থাকতে হবে, মূল্যবোধ থাকতে হবে, তাঁকে সত্য সৃষ্টি করতে হবে, যে সত্য ‘সুন্দর’ নাও হতে পারে। বধির বেট্‌হোফেন সুরের পরিপূর্ণ ঐকতান সৃষ্টি করেছিলেন, আর মিকেল আঞ্জেলো তুলির টানে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন; ‘মানুষের সমাজ-জীবনের দ্বন্দ্বময় কঠিন ও কদর্য সত্য’ তাঁদের আনন্দ-সৃষ্টিকে স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু টলস্টয়ের শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যম

হচ্ছে সাহিত্য, কথা, যার সঙ্গে কাজ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। কেবলমাত্র মিথ্যা, কৃত্রিম, প্রতারণামূলক কথাই 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে—এই মায়াবিনী বিলাসিতা মহান্ সাহিত্যিককে ভোলাতে পারে না। সঙ্গীতশিল্পী আর চিত্র-শিল্পীর মতো সাহিত্যিককেও সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধান করতে হয়, কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সত্য হচ্ছে নিষ্ঠুর, কদর্য। তার থেকেই আসে সাহিত্য-শিল্পীর বিবেকের দ্বন্দ্ব। রলাঁর টলস্টয়-জীবনী হলো ইয়োরোপীয় বিবেকের দ্বন্দ্বময় জীবনী।

টলস্টয়ের চিঠি পাওয়ার পর থেকেই শিল্প যে সামাজিক-ভাবে সৃজনশীল হতে পারে এই চিন্তা রলাঁর মনকে অধিকার ক'রে বসল। রলাঁ ভেবেছিলেন যে এই সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র টলস্টয়ই করতে পেরেছেন, নিজেকে সকল জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও রাজনৈতিক মতদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তুলতে পেরে; টলস্টয় তাঁর "মহৎ প্রেমের" দ্বারা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, সে-সাহিত্য বিশেষ কোনো "বর্ণের" (caste) সাহিত্য নয়, সার্বজনীন ইয়োরোপীয় সাহিত্য। রলাঁ টলস্টয়-জীবনীতে লিখলেন :

"নিশ্চয়ই, আমাদের সমস্ত শিল্পই হচ্ছে একটা বিশিষ্ট বর্ণের (caste) অভিব্যক্তি—যে বর্ণ আবার পরস্পর বিরোধী বহু জাতি ও ছোট ছোট দলে বিভক্ত। ইয়োরোপে এমন একজন শিল্পী নেই যিনি সমস্ত দেশের দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন। টলস্টয়ের মধ্যেই আমরা সকল শ্রেণীর লোকদের, সকল দেশের লোকদের পরস্পরকে ভালবেসেছি।"

রলাঁ তখন গোয়েথের (Goethe) বাণীতে উদ্বুদ্ধ। গোয়েথে বলেছিলেন : "জাতীয়-সাহিত্যের এখন আর বিশেষ অর্থ হয় না, বিশ্ব-সাহিত্যের যুগ এসে গিয়েছে।"

টলস্টয়ের শিল্প যে শুধু বিশ্বজনীনই নয়, তা একটা লক্ষ্যের প্রতি, কর্মের প্রতি আহ্বানও বটে। টলস্টয়ের প্রত্যেক লেখার মধ্যেই রয়েছে প্রচ্ছন্নভাবে কর্মের প্রতি একটা নৈতিক প্রেরণা, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্দেশনাও রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়েও টলস্টয়ের একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি রলাঁ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন :

"কিন্তু যেহেতু টলস্টয় একজন অতীন্দ্রিয়বাদী নন—যাঁর কাছে সৃষ্টির উল্লাসই (ecstasy) যথেষ্ট—এবং যেহেতু তাঁর মধ্যে প্রাচ্যবাসীদের স্বপ্ন আর পাশ্চাত্যবাসীদের যুক্তিবাদের আকর্ষণ ও কর্মের প্রয়োজনীয়তা সংমিশ্রিত হয়েছে, সেইজন্য পরবর্তীকালে তাঁর এই প্রত্যয়কে কর্মে পরিণত করার জন্য তাঁকে একটা কার্যকরী নির্দেশনা দিতে হয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনের জন্য কতকগুলি নীতি নির্ধারণ ক'রে দিতে হয়েছিল।"

কিন্তু টলস্টয়ের ক্ষেত্রেও রলাঁ সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক। শিল্পী হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে রলাঁর বিরূপ কোনো মন্তব্য নেই, তবে মানুষ হিসাবে টলস্টয়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মিকেল আঞ্জেলো সম্বন্ধেও রলাঁ একই কথা বলেছিলেন। "যেখানে বেটহোফেন মহত্ত্ব অর্জন করেছিলেন শিল্পী ও মানুষ হিসাবে, টলস্টয় তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পারেন নি, তাঁর ক্ষতবিক্ষত আত্মা বুদ্ধিজীবীদের স্তরের ঊর্ধ্বে

উঠতে পারে নি।" রলাঁ বলেন : "শিল্পীকে বিশ্বাসের প্রতিভূ হতে হলে তাঁকে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজও পূর্ণভাবে করতে হবে। সে-কাজ তিনি করেন নি, যদিও তিনি তা করতে চেয়েছিলেন। বর্তমান যুগের একজন অগ্রদূত হলেও, টলস্টয় ছিলেন খণ্ডিত আত্মার আর একজন হ্যামলেট। তিনি সব-রকমের সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তিনি বড় জোর কয়েকজন দুঃভোগীকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলেন মাত্র, দুঃখভোগের অবসান ঘটাতে পারেন নি।"

যুদ্ধের সময়ে যখন তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের সম্মুখীন হয়ে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করার জন্য রলাঁ অন্ধকারে কর্মপন্থার অনুসন্ধান করছিলেন তখন তিনি টলস্টয়ের দর্শন সম্বন্ধে আরও বৈচারিক (critical) হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে টলস্টয় বৌদ্ধ, হিন্দু ও চীনা দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র পড়ে জীবনের সকল সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান হিসাবে অনাসক্তের পথ বেছে নিয়েছিলেন। রলাঁর মতে এই পথ মানুষের সর্বপ্রকারের কর্মপ্রেরণা, বুদ্ধি, শুভ-অশুভের পার্থক্যকে অস্বীকার করে ও মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ না করতে প্রশ্রয় দেয়।[১]

[১] ১৯২২ সালে রলাঁ দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন : "আপনি লিখেছেন যে টলস্টয়ের confessions আপনার মনে গভীর দাগ কেটেছে, বইটি প্রশংসনীয়। মানবের দুঃখের প্রতি টলস্টয়ের বেদনা মর্মস্পর্শী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি বলব যে পথপ্রদর্শক হিসাবে টলস্টয় আদর্শস্থানীয় নন। তাঁর নিপাড়িত প্রতিভা একটা প্রত্যক্ষ পথের নির্দেশ দিতে সব সময়েই অক্ষম হয়েছে। জনগণের প্রতি সমবেদনার ফলে তিনি কলা ও বিজ্ঞানকে স্বল্পসংখ্যক বাছাই-

রলাঁর জগৎবিখ্যাত উপন্যাস "জাঁ-ক্রিসতফ"-এর প্রথম খণ্ড *L' Aube* ("উষার-আলো") প্রকাশ হতে শুরু করে ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এবং তার শেষ দশম খণ্ড শেষ হয় ১৯১২-র অক্টোবরে। এই গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় রলাঁ সেণ্ট ক্রিসতফরুস্-এর (Saint Christophorus) কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। গভীর রাতে খেয়ামাঝিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটি ছোট্ট বালক বলল তাকে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে হবে। মাঝি হাসতে হাসতে বালকটিকে তার প্রকাণ্ড কাঁধে বসিয়ে নদী ভেঙে চলল। যতই যাচ্ছে বোঝা ততই ভারী হচ্ছে, মাঝি আর ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। শেষ শক্তি সঞ্চয় ক'রে মাঝি কোনো মতে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপারে পৌঁছল। মাঝি তখন জগতের নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারল। তাই তার নাম হলো ক্রিস্তফরুস্। রলাঁ যখন "জাঁ-ক্রিস্তফ" লেখার ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তখন ভেবেছিলেন যে একটি লোকের কাহিনী লিখেই তা শেষ করবেন। কিন্তু বোঝা ক্রমশ বেড়েই চলল। দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে যখন তিনি সে-বোঝা নামালেন, তখন জগৎবাসী অবাক হয়ে দেখল রলাঁ

করা লোকের ভোগ্যসামগ্রী বলে বিকৃত করেছেন। তাঁর লোক-হিতৈষণা বিশেষ কাজে লাগে নি, কারণ তার দ্বারা অন্যের দুঃখ ভোগের লাঘব ঘটাতে পারেন নি। তা শুধু তাঁর দুঃখ ও ব্যর্থতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি যদি তাঁর মহান শিল্পের গৌরবের দ্বারা দুনিয়া জয় না করতেন, তাহলে তাঁর নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তা দেশ-দেশান্তরে এত প্রভাব বিস্তার করতে পারত না।" (Aronson-এর *Romain Rolland*" বইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬০-৬১)

একটা গোটা যুগের ভার বহন করছিলেন—"জাঁ-ক্রিস্তফ"-এ তার নিগূঢ়তম অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে।

জাঁ-ক্রিস্তফ জার্মানীর রাইনল্যাণ্ডের ছেলে, সঙ্গীতের প্রতি তার আকর্ষণ। বিশ বছর বয়সে সে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করল। বিপ্লব বিফল হলো, জাঁ ফ্রান্সে আশ্রয় নিল। সে সেখানেই থেকে গেল, ফ্রান্সকে ভালবাসল, বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হলো, ফরাসী লেখক অলিভিয়েকে বন্ধু রূপে পেল। জাঁ-ক্রিস্তফ ও অলিভিয়েই এই গ্রন্থের ছুইটি প্রধান চরিত্র। তাদের মানস পরস্পর-বিরোধী, আবার পরিপুরকও বটে। জাঁ চায় শিল্পের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে, বহুগুণ বর্ধিত জীবন—সে চায় চিন্তারাজ্যে বিচরণ করতে, জগৎ সম্বন্ধে তার কোনো দায়িত্ব নেই—(জাঁ বলেছিল, Mein Welt ist in der Luft—আমার জগৎ উর্ধ্বাকাশে); আর অলিভিয়ে চায় কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করতে, তার নিকট শিল্প হচ্ছে জীবনের বাস্তবক্ষেত্র থেকে পলায়নকারীর আশ্রয়স্থল। চিন্তা ও কর্মের এই বিরোধ রলাঁর নিজেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব। জাঁ-ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে সেই সময়কার রলাঁর দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের ছুইটি অংশ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধানের অন্বেষণই হচ্ছে "জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর মর্মবাণী।

আবার জাঁ-ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে উভয়ের মধ্যেও রয়েছে প্রচণ্ড স্ববিরোধিতা। জাঁ-ক্রিস্তফ জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর সন্তান। সে স্বাস্থ্যবান, প্রচণ্ড তার কর্মশক্তি, সে প্রকৃতির অন্ধশক্তি (elemental force), সে শিল্পের স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করতে

চাইলেও তাকে বাস করতে হয় মানুষের মাটিতে। এই গলিত-দুর্গন্ধময় সমাজে সে হয় পদেপদে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পরাজিত। শিল্পও তার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। কিন্তু সে-হতাশা ক্ষণিকের। সে অবিরাম সংগ্রাম ক'রে চলেছে নিজের বিমূর্ত চিন্তার বিরুদ্ধে, সমাজের অবিচার, নীচতা, কদর্যতার বিরুদ্ধে। এই সমাজ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করে তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব, মানবের প্রতি দায়িত্ব, মানবের প্রতি কর্তব্য। কিন্তু এ মানবতাবাদ তখনও বিমূর্ত মানবতাবাদ, শ্রেণীসংগ্রামের মূর্ত মানবতাবাদে সে তখনও পৌঁছতে পারেনি।

জাঁ-ক্রিস্‌তফ যেমন জার্মান সংস্কৃতি ও জার্মান জীবনী-শক্তির প্রতীক, সম্ভ্রান্তবংশীয় অলিভিয়ে তেমনি ঐশ্বর্যশালী ফরাসী সংস্কৃতি ও ফরাসী আত্মিকশক্তির প্রতীক। "জাঁ ক্রিস্‌তফ"-এ অলিভিয়েই সব থেকে জীবন্ত চরিত্র, রলাঁর নিজেরই আত্মিক চরিত্র। অলিভিয়ে কর্মপ্রবণ, কিন্তু তার কর্ম তার চিন্তাকেই সতেজ করে, তার আত্মিকশক্তিকে আরও শক্তিশালী করে। জনসাধারণের শক্তির উপর তার বিশ্বাস আছে, তাদের প্রতি তার প্রেমও আছে কিন্তু তার আভিজাত্য একটা ব্যবধানেরও সৃষ্টি ক'রে রাখে। সেও চায় এই মর্তভূমে মানুষের জন্য স্বর্গ রচনা করতে, কিন্তু শোষিত মানুষের শ্রেণীসংগ্রাম তার সহানুভূতি আকর্ষণ করে না, বরং তাকে পীড়াই দেয়। অলিভিয়ে হিংসার বিরোধী, জাতিবিদ্বেষের বিরোধী, যুদ্ধের বিরোধী, শ্রেণী-সংঘর্ষেরও বিরোধী, প্রেমই মানুষের মুক্তি এনে দিতে পারে তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্বযুদ্ধ যখন আসন্ন, যখন অন্য সকলের মতো জঁা-ক্রিস্তফের মনও দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে, স্থির ক'রে উঠতে পারছে না স্বজাতিপ্রেমে সাড়া দিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে কিনা, তখন তার ফরাসী ভ্রাতা অলিভিয়ে তাকে বলল : "তোমারই মতো আমিও আমার দেশকে ভালবাসি, খুবই ভালবাসি। কিন্তু সেই জন্য কি আমাকে আমার বিবেক বলি দিতে হবে, আমার আত্মাকে ধ্বংস করতে হবে ? তা যদি হয় তাহলে তাই হোক—হোক স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। নৈতিক জগতের, হিংসার জগতের সৈনিক আমি নই।" সংকীর্ণ স্বাদেশীকতার সীমানা অতিক্রম ক'রে, ক্ষুদ্র স্বাজাত্যাভিমানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে জঁা-ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে উভয়েই আহ্বান জানালেন ইয়োরোপীয় আদর্শের, জানালেন বিশ্বপ্রেমের।

রলঁার "জঁা-ক্রিস্তফ" (ও পরবর্তী উপন্যাস "বিমুগ্ধ আত্মা") তাঁর অমর কীর্তি, বিশ্বসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ, সমগ্র ইয়োরোপের মানস-জগতের ইতিহাস, বর্তমান যুগের মহাকাব্য। "জঁা-ক্রিস্তফ", রলঁার "বিমুগ্ধ আত্মা" ও অন্যান্য উপন্যাসের মতোই, মূলত চিন্তা ও আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতের উপন্যাস—জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। চিন্তা ও আদর্শকে বিষয়বস্তু ক'রে এত হৃদয়গ্রাহী ও এত বিরাট উপন্যাস লেখা চলে তা রলঁার পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি।

জঁা-ক্রিস্তফ রলঁারই আত্মা, ইয়োরোপের, বিশ্বেরও আত্মা। এই আত্মা যদিও তখনও নভোচারী, কিন্তু পরবর্তী

যুগের মানুষের কঠোর বাস্তব শ্রেণী-সংগ্রামের মাঝখানে তার নেমে আসতে বিলম্ব হয় নি।

"জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর পূর্বে রলাঁর নাম বড় কেউ একটা জানত না। বর্তমান যুগে কোনো লেখকের সুনাম বা বদনাম বা নামহীনতা অনেক পরিমাণে একচেটিয়া সংবাদপত্র ও তাদের ভাড়াটিয়া সমালোচকদের উপর নির্ভরশীল। রলাঁর নাটকগুলির সুর তাদের পছন্দ হয় নি। বেট্‌হোফেনের জীবনী ছাড়া অন্যান্য জীবনীগুলিও উপেক্ষিত হলো। তার উপর আবার রলাঁ *La Foire sur la Place* নামক বই লিখে সংবাদপত্রের ফেরিওয়ালাদের ও সাহিত্যের কুলটাদের যে তীব্র কষাঘাত করেছিলেন তা ইয়োরোপের সাহিত্যে বালজাকের *Les Illusions Perdues* ছাড়া আর বড় একটা বইয়ে নেই। সমালোচক, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা এর জন্য রলাঁকে ক্ষমা করে নি—যুদ্ধের সময় তারা তার প্রতিশোধ নিয়েছিল।

জাঁ-ক্রিস্তফ সব বাধাবিঘ্ন বিরোধিতা চুরমার ক'রে দিয়ে জগতের সামনে উপস্থিত হলো। "জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর শেষ খণ্ড সমাপ্ত হতে না হতেই প্রায় সমস্ত ইয়োরোপীয় ভাষাতেই তার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। এক মুহূর্তে অজ্ঞাত রলাঁ জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়লেন। সব দেশের মানুষ "জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর দর্পণে নিজেদেরই দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তারা দেখল তাদেরই দুঃখ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সৌন্দর্য কদর্যতা, মহত্ত্ব নীচতা, তাদের জীবন সংগ্রাম এই দর্পণে সবই প্রতিফলিত হয়েছে। তাদের এই প্রতিচ্ছবি খুব প্রীতিজনক

না হলেও, তারা তাতে আনন্দিত, কারণ, জীবন কি, জীবনের অর্থ কি, তা তারা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল।

"জাঁ-ক্রিস্তফ" অতীত থেকে ভবিষ্যতে যুগ পরিবর্তনের উপন্যাস। অতীত ও ভবিষ্যৎ—উভয়ের প্রেরণাই এতে রয়েছে। কিন্তু এ অতীত মৃতের অতীত নয়, এ অতীত জীবন্তের অতীত, মানুষের সংগ্রামের অতীত, যে অতীত বর্তমানে পুনর্জন্মগ্রহণ ক'রে ভবিষ্যতে তার বীজ ছড়িয়ে দেয়। "জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর দশম খণ্ডের ভূমিকায় রলাঁ বলেছেন:

'মানুষের একটি পুরুষের সম্পূর্ণ ক্ষয়িষ্ণু রূপ আমি ফুটিয়ে তুলেছি আমার লেখায়। কিছুই আমি লুকোই নি, না তার দোষত্রুটি, না তার গুণাবলী, তার গভীর দুঃখ, শৃঙ্খলাহীন গর্ব, তার দুর্বার শক্তি, একটা দুনিয়া জোড়া পাষাণ ভার যা বিহ্বল ক'রে ডুবিয়ে দেয় মানুষকে, সেই সঙ্গে তার জাগ্রত বিশ্বজনীন নীতিবোধ, তার নন্দনতত্ত্ব, তার বিশ্বাস, নবমানবতাবোধের গঠন—যার শরিক আমরা সবাই—সব আমি এঁকেছি।

"হে নব যৌবন, হে বর্তমান কালের যুবক, আমাদের দু'পায়ে পদদলিত ক'রে এগিয়ে যাও। আমাদের থেকে মহৎ হও, সুখী হও।

"আমার দিক থেকে, আমার আত্মাকে আমি বিদায় জানাই। শূন্যখোলস আমি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। মৃত্যু আর পুনরুত্থানই তো জীবন। ক্রিস্তফের নবজন্মের জন্য আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে।"

জাঁ-ক্রিস্তফের—রলাঁর—নবজন্ম ঘটতে বেশী বিলম্ব হয় নি। যুদ্ধোত্তর শ্রমিক বিপ্লবের মধ্যে রলাঁর সেই নবজন্ম ঘটেছিল। পরবর্তীকালের রচনা তাঁর "বিমুগ্ধ আত্মা" (*L' Ame*

Enchantee), "শিল্পীর নবজন্ম" (*Quinze Ans de Combat*), ও *Par la Revolution la Paix* ("সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি"), ও *Inde (Journal 1915-1943) : Tagore Gandhi Nehru et les Problems Indiens* (ভারতবর্ষ : রবীন্দ্রনাথ গান্ধী নেহরু এবং ভারতীয় সমস্যাবলী)[১] তার জীবন্ত সাক্ষ্য।

বিশ্বযুদ্ধের সংকট : "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে"

জঁা-ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে তাদের তর্কালোচনার মধ্য দিয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার যে আসন্ন সংকটের চিত্র এঁকেছিল, সব দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা যে সংকটের ইন্ধন বহুদিন থেকে জুগিয়ে আসছিল, তারই অনিবার্য পরিণতি ঘটল ১৯১৪ সালে। বলা বাহুল্য, এ যুদ্ধ কোনো একটা বড় আদর্শের জন্য নয়, কোনো সমাজ-বিপ্লবের জন্য নয়, এ যুদ্ধ নিছক ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের মুনাফা বৃদ্ধির ও উপনিবেশ ও দেশবিদেশের বাজার দখলের লড়াই। এই বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সভ্যতার শোচনীয় পরিণতি। জঁা-ক্রিস্তফ, অলিভিয়ে প্রমুখ 'এলিত'রা এ সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য যে শেষ চেষ্টা করেছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো—এ সভ্যতার ধ্বংসের বীজ ছিল তার অভ্যন্তরেই নিহিত, এই লোভী সভ্যতার পুনর্জীবনের আশা নিষ্ফল।

---

[১] শীঘ্রই বাঙলায় প্রকাশিত হবে।

"জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর শেষ পর্যায়ে অলিভিয়ে উন্মত্ত জনতার একটা তুচ্ছ দাঙ্গায় নিরর্থকভাবে প্রাণ হারাল; (অলিভিয়ের এই শোচনীয় মৃত্যু কি বুর্জোয়া সভ্যতার মৃত্যুরই প্রতীক?) আর জাঁ-ক্রিস্তফ এই উন্মত্ত জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সুইট্জারল্যাণ্ডে চলে গেল। রলাঁর 'এলিত'রা আসন্ন সংকটের মুহূর্তে তাদের আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে হিংসা বিদ্বেষে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত ক'রে তুলল; তাদেরই প্ররোচনায় সেই জনতাই—যে জনতা মাঠেঘাটে কারখানায় পরিশ্রম করে, পরের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়—সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দেবার জন্য অন্ধভাবে অগ্রসর হয়ে গেল। রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে তারাই পুনর্জন্ম লাভ করবে, তারাই গড়ে তুলবে মানুষের নতুন সভ্যতা, নতুন পৃথিবী।

১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ, বারেসের (Barrès) জয়, রলাঁর পরাজয়। কিন্তু পরাজয়ই বারবার রলাঁকে নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে। উপরন্তু "জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর খ্যাতি তাঁর হাতে একটি শক্তিশালী তলোয়ার তুলে দিয়েছে। ইতিহাসের একটা সন্ধিক্ষণে, যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে, শুধু ফরাসী জনসাধারণের তরফ থেকেই নয়, সমস্ত ইয়োরোপ, সমগ্র জগতের মানুষের তরফ থেকে বলবার অধিকার তিনি অনেক দুঃখবেদনা ও কঠোর কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন। সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে রলাঁ পশ্চাৎপদ হলেন না। ১৯১৪ সাল থেকে রলাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবন যেন শেষ হয়ে গেল। তিনি আর নিজের নন, কেবলমাত্র লেখক বা শিল্পী নন। ইয়োরোপের

সেই নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণার মুখে তিনিই হলেন ইয়োরোপের ও সমগ্র মানবজাতির বিবেকের মর্মবাণী। সেই মুহূর্ত থেকে রলাঁর জীবন হলো জগতের ইতিহাসেরই একটি অংশ।

এতদিন ধরে রলাঁ জাতিপ্রেম, বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ও বিশ্বাসের কথা শুধু প্রচার ক'রে এসেছেন, আজ সেই আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার অগ্নিপরীক্ষার দিন। অন্যান্য যে সব কবি, লেখক, বিজ্ঞানী, শিল্পী এই সব আদর্শের কথাই এতদিন ধরে প্রচার ক'রে এসেছেন, তাঁরা আজ সকলেই স্বদেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে অনায়াসে অন্যান্যদের মতো তাঁদের আদর্শ ভুলে গিয়েছেন, বিদ্বেষের বন্যায় ভেসে গিয়েছেন, হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, সকলেই যোগাচ্ছেন এই মৃত্যু যজ্ঞে অবিশ্রান্ত ইন্ধন, সকলেই গাইছেন এই মারণযজ্ঞের গৌরব গাথা। সস্তা স্বদেশপ্রেমের বুলি My county, right or wrong এই বিভ্রান্ত শিল্পীদের আদর্শ-প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনসাধারণও হিংসার বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছে, তাদের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। একদিন এই জনগণই গীর্জার প্রাসাদ নির্মাণ ক'রে ঈশ্বরের শহর বানিয়েছিল; একদিন এরাই মহান্ ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়েছিল, সমস্ত দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ তারা তাদের সৃজনী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আপসপন্থী সুবিধাবাদী সবদেশের স্যোশাল-ডেমোক্রাটিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শ্রমিক-শ্রেণী নেতৃত্বহীন, অক্ষম, স্বেচ্ছায় শাসকশ্রেণীকে অনুসরণ

ক'রে বিভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে অন্ধভাবে কসাইখানার দিকে এগিয়ে চলেছে। (লেনিন, রোজা লুক্সামবুর্গ, কার্ল লীবক্নেট-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর যুদ্ধ-বিরোধী যে আন্দোলন চলছিল তার সন্ধান রলাঁ তখনও পান নি।)

এই অবস্থায় আপস করাই সব থেকে সহজ, নিরাপদ ও লাভজনক পথ। কিন্তু নীতি-বিরুদ্ধ আপস রলাঁর পথ কোনো কালেই নয়। আর একটা পথ, নিরপেক্ষ হয়ে থাকা। কিন্তু তাতে লোক ঠকানো গেলেও, নিজের বিবেকের কাছে কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। এ পথও রলাঁর নয়।

যুদ্ধ যখন শুরু হয় রলাঁ তখন সুইট্‌জারল্যাণ্ডে। তাঁর বয়স তখন সাতচল্লিশ। কাজেই বাধ্যতামূলক মিলিটারী সার্ভিসের বয়স তাঁর পার হয়ে গিয়েছে আর স্বাস্থ্যের দিক থেকেও তিনি সামরিক কাজে অনুপযোগী। তিনি সেখানেই রয়ে গেলেন। জেনেভায় আন্তর্জাতিক রেডক্রশের হেড অফিসে তিনি যোগ দিলেন। সব দেশ থেকে অসংখ্য পিতা মাতা স্ত্রী ভগ্নী জানতে চায় তাদের নিখোঁজ স্বামী, পুত্র, ভ্রাতাদের সংবাদ, কত শত সহস্র নিরাশ্রয় নর নারী শিশুর প্রয়োজন আশ্রয়, রোগের সেবা। প্রতিদিন সাত আট ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে রলাঁ এই সব চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন। কি করুণ সেই সব চিঠিপত্র! যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ও তার পাশবিক দিকগুলি সম্বন্ধে রলাঁ বহু অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। ১৯১৫ সালে রলাঁ যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন তার টাকাটা এই রেডক্রশে দিয়ে দেন।

কিন্তু এ কাজ যত মহৎই হোক না কেন, রলাঁর নিকট সব থেকে বড় প্রশ্ন কি ক'রে যুদ্ধ থামান যায়, কি ক'রে শান্তি স্থাপন করা যায়। রলাঁ আজ এতই একাকী, এতই নিঃসঙ্গ যে কিছুকাল নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বলে তাঁর মনে হলো। কিন্তু এই কঠিন পরীক্ষার দিনেও তিনি তাঁর আদর্শ, তাঁর বিশ্বাস হারালেন না। আত্মিক নেতৃত্ব, নৈতিক নেতৃত্বের উপর তখনও তাঁর অটল বিশ্বাস, এই শক্তিই পারে ইয়োরোপকে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে, এবং এই নেতৃত্ব আসতে পারে কেবল মাত্র চিন্তাশীল 'এলিত'দের নিকট থেকে, বুদ্ধিজীবীদের নিকট থেকে। জাঁ-ক্রিস্তফের মতো সমস্ত বাধাবিঘ্ন নির্যাতন উপেক্ষা ক'রে অগ্রসর হলে 'এলিতের' বিবেক সাড়া দেবেই। যদিও সারা জীবন ধরে রলাঁ দেখেছেন এই শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীনতা, আপস-প্রবণতা, তাদের চিন্তার অগভীরতা, কর্মের অক্ষমতা ও সংকটকালে নিজেদেরই আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, তবুও তাদের উপরই আশা রেখে তিনি অগ্রসর হলেন। "আত্মিক শক্তি সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, তার নিয়ম সৈন্য বাহিনীর নিয়মের সঙ্গে মেলে না।" এই শক্তিতে যাঁরা শক্তিমান, তাঁরা একত্রিত হলে, মানুষের চিন্তাকে বদলে দিতে পারে, দেশে দেশে বিপ্লব এনে দিতে পারে।

যুদ্ধ শুরু হবার তিন মাস পরে, ১৯১৪, ১৫ই সেপ্টেম্বরে, সুইট্জারল্যাণ্ডের একটি পত্রিকায় তাঁর যুদ্ধবিরোধী বিশ্ববিখ্যাত *Au dessus de la Melee* ("যুদ্ধের উর্ধ্বে") প্রকাশ করলেন

মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।[1] ১৯১৫ সালে পারীতেও তা ছাপা হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক বই বিক্রি হয়ে যায়, সৈন্যদের মধ্যেও এ লেখা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জার্মান সৈন্যদের নিকটও সেই বই পৌঁছয়। তখন ফরাসী সরকার বইটিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে, এবং জার্মান সরকারও বে-আইনী ঘোষণা করতে কালক্ষেপ করে না।

পাঁচ বৎসর ধরে রলাঁ সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, মিথ্যা কুৎসার বিরুদ্ধে, জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে একাই প্রচার চালিয়ে গেলেন। ঐ দেশ নিরপেক্ষ ছিল বলেই রলাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। রলাঁর এই সব প্রবন্ধগুলি একত্রিত হয়ে "যুদ্ধের উর্ধ্বে" ও "অগ্রণী" (*Les Precurseurs*) নামে বই দু'খানাতে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এর জন্য যুদ্ধবাজরা ও জাতি বিদ্বেষীরা রলাঁকে ক্ষমা

---

[1] জনৈক জগন্নাথ বিশ্বাস তাঁর রম্য-রচনা স্টাইলে লিখিত "রম্যাঁ রলাঁ"তে *Au dessus de la Melee*-র বাঙলা করেছেন "সংগ্রামের উর্ধ্বে"। তিনি রলাঁর জীবনের মূল কথাটাই ধরতে পারেননি। রলাঁ কোনো কালেই সংগ্রামের উর্ধ্বে ছিলেন না, উর্ধ্বে উঠবার চেষ্টাও করেননি, বরং সব সময়ই সংগ্রামের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সংগ্রামই রলাঁর জীবন। ভদ্রলোকের আর একটি কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, বাঙলায় রলাঁর যেসব বইয়ের অনুবাদ হয়েছে এবং সেগুলি বাঙালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত ও বাঙলা ভাষার গৌরব—যেমন "জাঁ-ক্রিস্তফ," "বিমুগ্ধ আত্মা" (*L' Ame Enchantee*), "শিল্পীর নবজন্ম" (*Quinze Ans de Combat*)—তার কোনোটারই তাঁর বইতে উল্লেখ পর্যন্ত নেই, যে সব উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন তা মূল ফরাসী থেকেও নয়, ইংরেজী অনুবাদ থেকে।

করে নি। ফ্রান্সের সমস্ত বইয়ের দোকানগুলি "জঁা ক্রিস্তফ" বিক্রি বন্ধ ক'রে দিল। সমস্ত পত্রিকাগুলি রলাঁকে "দেশদ্রোহী", "বিশ্বাসঘাতক", "ফ্রান্সের শত্রু" "জার্মানীর গুপ্তচর" ইত্যাদি বলে গালাগাল দিল। "যুদ্ধের উর্ধ্বে" বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই আঁরি মাসিস (Henri Massis) তার জবাবে লিখলেন: "ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রম্যাঁ রলাঁ"। সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের রলাঁর সহকর্মী এক অধ্যাপক দৈনিক ল্য মাতাঁ (*Le Matin*)-তে লিখলেন যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা রলাঁর সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করলেন। সংশ্রব পরিত্যাগ করলেন আরও অনেকে। এই সঙ্গে রলাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের কুৎসাও তারা রটাতে লাগলেন—রলাঁর সঙ্গে জার্মানীর যোগাযোগ আছে, রলাঁ জার্মানীর গুপ্তচর, রলাঁর বইয়ের আমেরিকান প্রকাশক জার্মান, সে জার্মানীর গুপ্তচর—সুতরাং রলাঁও গুপ্তচর। দৈনিক ল্য টেম্স্ (*Le Temps*) লিখল: "ফ্রান্সের মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন ঘটাবার জন্য জার্মানীতে যে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, রলাঁ তাঁর সঙ্গে জড়িত।" জার্মান কাগজগুলিরও একই সুর। মাসিক *Deutsche Rundschau* "জঁা-ক্রিস্তফ ও জার্মান সংস্কৃতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখল: "নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে 'জঁা-ক্রিস্তফ' জার্মান জাতির উপর এক ভয়ানক আক্রমণ। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি জার্মানদের খাঁটি রক্তের সঙ্গে অন্যান্য নিকৃষ্ট ও অধোগামি জাতিদের রক্ত মেশানোর এই পরিকল্পনা কি জঘন্য ও সাংঘাতিক!"

রলাঁ শুধু প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও লেখকদের ব্যক্তিগত চিঠিও দিলেন। দু একজন ছাড়া বিশেষ কারোও কাছ থেকে সাড়া পেলেন না। আইনস্টাইন রলাঁকে জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি রলাঁর সঙ্গে একমত এবং তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন। আইনস্টাইন সেই চিঠিতে আরও লিখলেন :

"গত আট মাস ধরে বিভিন্ন দেশের এমন কি মনীষী ও পণ্ডিতরা পর্যন্ত এমন ব্যবহার করেছেন যে দেখে মনে হয় যেন তাদের মস্তিষ্কগুলিকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

গেরহার্ড হাউপ্টমানকে (Gerhardt Hauptmann)—যিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী ও যিনি শাক্সনীর তন্তুবায়দের বিদ্রোহকে সমর্থন ক'রে *Weaver* নামক নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন ও ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন—রলাঁ জিজ্ঞেস করেছিলেন :

"নিরপরাধ ক্ষুদ্র দেশ বেলজিয়ামের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে, আপনার 'পবিত্র শহর' লয়ভেন-এর ধ্বংসের বিরুদ্ধেও কি আপনারা প্রতিবাদ করবেন না? আপনারা কি গোয়েটের বংশধর না আত্তিল্লার?"

হাউপ্টমান লিখলেন :

"মৃত জার্মানরা গোয়েটের বংশধর বলে যদি মনে করতে চায় করুক, কিন্তু জীবিত জার্মানরা যেন নিজেদের আত্তিল্লার বংশধর বলেই মনে করে।"

টোমাস মান্ (Thomas Mann), হেরমান হেসে (Hermann Hesse) প্রমুখ যাঁরা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির কথা

বলতেন, তাঁরা এখন একমাত্র জার্মান সংস্কৃতিতে পূর্ণবিশ্বাসী। মান্ তখন চিন্তা করতে শুরু করেছেন যে জার্মানীই হচ্ছে ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, জার্মানীর জয় হলেই ইয়োরোপীয় সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। পরবর্তীকালে মানের এ ভুল ভেঙ্গে ছিল, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মান্‌কে রলাঁর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার ভূমিকাই গ্রহণ করতে হয়েছিল।

কোনো দলের 'এলিত'দের নিকট থেকে রলাঁ বড় একটা সাড়া পেলেন না। দু'একজন ছাড়া "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" কেউই উঠতে পারলেন না। সকলেই ধ্বংসযজ্ঞের উন্মত্ত শরিক। নিজের দেশবাসীর নিকট রলাঁ বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী; জার্মানদের নিকটও তিনি ভয়ানক শত্রু।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিকট থেকে রলাঁ যেমন সাড়া পেলেন না, উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলিও তাদের আদর্শ অনুযায়ী কর্মে অক্ষম হয়ে রইল। তখনকার দুইটি ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর আন্তর্জাতিক সংগঠন—খ্রীষ্টীয় চার্চ ও সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক—তাদের নীতি অনুসরণ ক'রে "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" উঠল না। রলাঁ তাঁর "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে"তে লিখেছিলেন : "খ্রীষ্ট ধর্মের ও সমাজতন্ত্রের এই দুইটি নৈতিক শক্তির দুর্বলতা যুদ্ধের সময় প্রকট হয়ে পড়ল।···সমাজতান্ত্রিক দলগুলি মানব জাতির প্রতি প্রধান বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়াল।" অবশ্য একথা স্মরণ রাখতে হবে যে রলাঁ শ্রমিকশ্রেণীকে বা জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন নি, বরং সেই সব বুদ্ধিজীবীদেরই দায়ী

করেছিলেন যাঁরা জনসাধারণকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়ে যুদ্ধে তাদের বলি হিসাবে ব্যবহার করছিল।

যে ইয়োরোপীয় আত্মা, যে ইয়োরোপীয় মানসকে ভিত্তি করে জঁা-ক্রিস্তফ তথা রলাঁ মানব জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ইয়োরোপীয় আত্মা যুদ্ধের সময় এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তাহলে কি মানবজাতির ভবিষ্যতের আর কোনো আশাই নেই ? তিনি নতুন আলোর অন্বেষণে এশিয়ার দিকে তাকালেন।

ভলতেইর, গোয়েথে, শেলী, সোপেনহাওয়ার, টলস্টয় সকলেই প্রাচ্যকে বিভিন্নভাবে দেখেছিলেন। ভারতবিদ্যার পণ্ডিতরা দেখেছিলেন তাকে একটা অতীন্দ্রিয় জগৎ হিসাবে। আবার অনেক ইয়োরোপীয় ছিলেন যাঁরা ইয়োরোপীয় জন-মানসের দায়িত্ব গ্রহণকে এড়িয়ে যাবার জন্যই পলায়ন-পর মনোবৃত্তি নিয়ে প্রাচ্যের 'অনাশক্তি-দর্শনের' আশ্রয় নেন (এই রকম ইয়োরোপীয়ান বুদ্ধিজীবীর উদাহরণ আজও দেখা যায়—যেমন অলডুস্ হাক্সলী, কোয়েসলার, ইসারউড ইত্যাদি)।

টলস্টয় শেষজীবনে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি মোহমুক্ত হয়েও ইয়োরোপীয় জীবনের হিংসা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের অহিংসাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর মনে আশা জাগিয়েছিলেন। টলস্টয় অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে, গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে

এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে এই অহিংসানীতি, ইয়োরোপে না হোক, অন্ততঃ ভারতে অনুসৃত হবে।

রলাঁর সেই সময়কার চিন্তাধারা যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই অবস্থায় ভারতের নৈতিক শক্তির প্রতি তাঁর আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক। তবে অন্যদের সঙ্গে রলাঁর পার্থক্য এই যে তিনি সেখানে নির্বান প্রাপ্তির আশায় যাননি, গিয়েছিলেন বিশ্বজনীন কোনো একটা নৈতিক কর্মপন্থা ও মানুষের মহত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য, এবং সেই কর্মপন্থাও মহত্ত্বের দ্বারাই ইয়োরোপের বিনষ্ট আত্মার পুনরাবিষ্কারের জন্য। এ পর্যন্ত রলাঁ মানুষের ইতিহাসে যে অগ্রণীদের (precursors) ভূমিকার উপর বিশ্বাসী ছিলেন, সেই জাতীয় মহান্ আত্মা তিনি দেখতে পেলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মধ্যে।

প্রাচ্যের এই প্রশ্ন রলাঁর নিকট "জাঁ-ক্রিস্তফ"-এর যুগেই উঠেছিল। ক্রিস্তফ ইয়োরোপের সভ্যতাতেই বিভোর হয়ে আছে, কিন্তু অলিভিয়ে নবজাগ্রত প্রাচ্যের দিকে তাকাতে শুরু করেছে। অলিভিয়ে বলল: "পশ্চিমের দীপ নিভে আসছে। শীঘ্র, খুবই শীঘ্র আমি দেখতে পাচ্ছি প্রাচ্যের গভীর অভ্যন্তর থেকে অন্য নক্ষত্রের উদয় হচ্ছে।"

ক্রিস্তফ: "রেখে দাও তোমার প্রাচ্য। পাশ্চাত্য এখনও তার শেষ কথা বলেনি।"

আর একদিন অলিভিয়ে ক্রিস্তফকে গীতা থেকে পড়ে শোনায়:

"...যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।
সুখদুঃখ, লাভালাভ ও জয়-পরাজয় তুল্য মনে করিয়া
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও..." [১]

ক্রিস্তফ খুব উল্লসিত হয়ে উঠল। সে বইখানা ক্রিস্তফের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে লাগল।

রলাঁর বন্ধু জুভ (Jouve) তাঁর রলাঁ-জীবনীতে লিখেছেন যে সুইট্জারল্যাণ্ডে যুদ্ধের সময় প্রাচ্য সম্বন্ধে বহু বই রলাঁ পড়েছিলেন (—এবং তার ফল ফলেছিল রলাঁর "বিবেকানন্দ" ও "রামকৃষ্ণ" দুইটি জীবনীগ্রন্থ রচনাতে)। রলাঁ পরে লিখেছিলেন যে প্রাচ্যের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র তাঁর পুনর্জীবন এনে দিয়েছিল।

ইতালির "আভান্তি" (Avanti) পত্রিকায় রমাঁ আরও লিখেছিলেন (অক্টোবর, ১৯১৮) :

"জাতিসমূহের বর্তমান যুদ্ধের ফলে দুইটি বিরাট শক্তি পরস্পরের সম্মুখীন হবে—আমেরিকা ও এশিয়া। ...আমি বিশ্বাস করি যে মানবজাতির ও তার ভবিষ্যৎ ঐক্যের আশা এশিয়াই পূরণ করবে।

রলাঁ-মানসের শূন্যস্থান যে শুধু এশিয়াই পূরণ করছিল তা নয়। প্রায় একই সময়ে তারই পাশে আর একটি দীপশিখা জ্বলে উঠল এবং তা হলো রুশ বিপ্লবের দীপশিখা।

---

[১] "...তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব..." ৩৮

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এতদিন পর্যন্ত রলাঁ শুধু আপসপন্থী স্যোশালিস্টদেরই জানতেন, যারা ১৯১৪ সালে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুইট্জারল্যাণ্ডে তিনি আর এক ধরনের স্যোশালিস্টদের সংস্পর্শে এলেন—লেনিন, জিনভিয়েফ, রাডেক যাঁরা অন্যদের মতো আপস করেন নি, যাঁরা একনিষ্ঠভাবে তাঁদের আদর্শের জন্য লড়াই ক'রে এসেছেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ ক'রে রলাঁ বলেছেন :

"১৯১৭ সালের মার্চ মাসে লেনিন আমাকে সঙ্গে করিয়া রাশিয়ায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং গীলবোর (Guilbeaux) মারফৎ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি রাজী হই নাই।"
("শিল্পীর নবজন্ম," ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮)

রুশ বিপ্লব ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই রলাঁ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বন্ধু গীলবো তাঁর "দমঁ্যা" (Demain) পত্রিকায় রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে যে সব খবর বার করতেন তা রলাঁ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন।

"লেনিন, ট্রট্স্কি, কামেনেফ, রাকোভস্কি, রাডেক, কালেনিন, জিনোভিয়েভ, লুনাচারস্কি অর্থাৎ পুরাতন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া নতুন পৃথিবী গড়িবার যুদ্ধের সমগ্র নেতৃমণ্ডলীর সদস্যদের নাম আমার প্রায়ই এই পত্রিকাখানিতে চোখে পড়িত।...তাঁহার পত্রিকাখানির মত রুশ বিপ্লবের ঘটনামালার এত ভাল ইতিহাস ফরাসী ভাষায় আর ছিল না।" (ঐ, পৃঃ ১৪১-৪২)

কিন্তু রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানালেও তাকে রলাঁ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারলেন না। তার কারণ তিনি নিজেই বলেছেন :

"বিপ্লবের বীরগণের মহত্ত্ব ও তাঁহাদের আদর্শের উচ্চতার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল বটে কিন্তু তাঁহাদের হিংসাত্মক রক্তপাতের পথ আমাকে কেবলই দূরে ঠেলিত। আমি কর্মী ছিলাম। আমার কাজ ছিল চিন্তা। আমি ভাবিতাম ইয়োরোপের চিন্তাধারাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, স্বাধীন ও দল নিরপেক্ষ রাখিবার চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য।···সেই জন্য চিন্তা জগতের প্রহরীর স্থান ত্যাগ করিয়া (রাশিয়ায়) যাইতে রাজী হই নাই।" (ঐ, পৃঃ ১৪২)

ইতিমধ্যে ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ তাঁদের ভ্রম সংশোধন করে ও ইতস্ততা কাটিয়ে উঠে রলাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা এখন অকস্মাৎ দেখতে পেলেন যে, যে সমাজ ব্যবস্থা তাঁরা অসহনীয় বলে নিন্দা ক'রে এসেছিলেন, তা বিপ্লবের মহাপ্লাবনে কোথায় ভেসে চলে গিয়েছে। চোখ মেলে যখন তাঁরা তাকালেন তখন অবাক হয়ে দেখলেন তুনিয়া বদলে গিয়েছে—তাঁদের সাহায্য ছাড়াই বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে, অত্যন্ত বেশী সময় তাঁরা "যুদ্ধের উর্ধ্বে" ছিলেন। এখন তাঁদের ও রলাঁর সামনে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল—হিংসার সমস্যা। বিপ্লব তাঁরাও চান, কিন্তু বিপ্লব আর হিংসা কি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? হিংসা ছাড়া কি বিপ্লব হতে পারে না?

রলাঁ হিংসার পথ গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি এতদিন পর্যন্ত মানুষের মহত্ত্বের যে কল্পনা ক'রে এসেছেন সেখানে হিংসার স্থান কোথায়? তিনি তাঁর গান্ধী-জীবনীতেও এই কথাই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন: "হিংসাই আমি নিন্দা করি। সর্বতোভাবে আমি এই হিংসা নিন্দা করি।" (পরবর্তীকালে

গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রলাঁ এই সমস্যার সমাধান নিজেই করেছিলেন।)

কিন্তু রলাঁ বিপ্লবকেও স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাই তাঁর কাছে এখন সমস্যা দাঁড়াল—কর্মপন্থার সমস্যার সমাধান হবে কি ক'রে? বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিবিপ্লব মরিয়া হয়ে উঠবে, তাকে কি অহিংসা দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়? কিন্তু বিপ্লবকেও তো রক্ষা করা চাই। সুতরাং কি ক'রে কর্মনীতি নির্ধারণ করা যায়? জাঁ-ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে উভয়েই এ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত রলাঁ নৈতিক প্রশ্নের উপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। রুশ বিপ্লব আজ রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রশ্ন সামনে তুলে ধরল। কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে ও সেই অনুসারে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে রলাঁকে আরও অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

পূর্বে রলাঁ 'এলিত' ও জনতার মধ্যে একটা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন, যদিও তিনি এটা ভালভাবেই জানতেন যে তাঁর সমস্ত আদর্শ-পুরুষই জনসাধারণের নিকট থেকেই তাঁদের শক্তি সংগ্রহ ক'রে থাকেন। তিনি এখন আর-একটা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে নিলেন—স্থূল কর্মপন্থা আর আত্মিক কর্মপন্থা উভয়ের দ্বারাই বিপ্লব ঘটান যায়, তবে আত্মিক পন্থাই শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর, কারণ তার দ্বারাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়; তাছাড়া,

হিংসাত্মক বিপ্লব যে "সাংঘাতিক বলি" দাবি করে তাও এড়ান দরকার। যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, এলিতের নৈতিক ও আত্মিক শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে রলাঁর মোহভঙ্গ তখনও হয় নি।

যুদ্ধ শেষ হলে রলাঁ ভেবেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। তাঁদের মধ্যে পুনরায় একটা ঐক্যসূত্র স্থাপন করবার দিন এসেছে, শুধু ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয়, সমগ্র জগতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তাই বুদ্ধিজীবাদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের জন্য তিনি একটি "মানবাত্মার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" (Declaration of the Independence of Mind) প্রকাশ করলেন। সেটি "লুমানিতে" (*L' Humanite*) পত্রিকায় ১৯১৯ এর ২৬শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত হলো। এই আবেদন ছিল এলিতদের জন্য, আত্মিক কর্মীদের জন্য, জনসাধারণের জন্য নয়। রলাঁ তখনও বুদ্ধিজীবীদের কল্পনার রাজ্যে (utopia) বিশ্বাসী।

যুদ্ধের সময় যেসব বুদ্ধিজীবীরা "নিজেদের ও জনসাধারণকে প্রতারণা করেছিলেন, যাঁরা নিজেদের চিন্তার অধঃপতন ঘটিয়ে ঘৃণাবিদ্বেষের যন্ত্রে পরিণত হয়েছিলেন" ও "একটা গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, দেশ ও শ্রেণীর" স্বার্থপরতার জন্য কাজ করেছিলেন, এই ঘোষণাপত্রে রলাঁ প্রথমেই তাঁদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন। যুদ্ধ কোনো সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি, আজ সংকট গভীরতর। তাই:

"আজ জেগে ওঠার দিন। আজ আমরা প্রজ্ঞাকে মুক্ত করবো সব রকম ছলচাতুরী প্রতারণার বন্ধন থেকে, সমস্ত অপমানজনক

বন্ধন থেকে, গোপন দাসত্ব থেকে। প্রজ্ঞা কারো দাস নয়, আমরাই প্রজ্ঞার দাস। অন্য কোনো প্রভু আমাদের নেই। তার দীপশিখা বহন করতেই আমরা জন্মেছি, তাকে রক্ষা করতে, তারই পতাকাতলে পথহারাদের ডেকে আনতে। একটি স্থির কেন্দ্রকে অবিচল রাখাই আমাদের কর্তব্য, দুর্যোগের রাত্রিতে উত্তেজনার আবর্তের মধ্যে ধ্রুবতারাটিকে চিনিয়ে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।...আমরা শুধু সত্যেরই সেবা করি, সে সত্য মুক্ত, তার সীমা নেই সীমান্ত নেই, জাতি বা বর্ণের ভেদ সে স্বীকার করে না। মানবের শুভাশুভ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না—কখনোই না—তারই জন্য আমাদের সাধনা—সাধনা আমাদের সমগ্র মহামানবের জন্য।...সমস্ত মানুষই এই মহামানবের অন্তর্গত, তাই সমস্ত মানুষ সমভাবে আমাদের সহোদর। তারা যাতে আমাদেরই মতো হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাদের অন্ধ সংগ্রামের উপর আমাদের এই বন্ধুতার সেতুবন্ধন, প্রজ্ঞার সেতুবন্ধন, যে প্রজ্ঞা এক এবং বহু, চিরন্তন।"

সে সব মনীষীরা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাঁদের নামের তালিকা একটা চিত্তাকর্ষক ঘটনা। ফ্রান্স ও জার্মানী থেকেই রলাঁ বেশী সাড়া পেয়েছিলেন। আবার যে সব বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা স্বাক্ষর দেননি তাঁদের সংখ্যাও কম ছিল না। ভারতের তরফ থেকে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও আনন্দ কুমারস্বামী।

এই ঘোষণাবাণীর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এবং জগতের মনীষীদের নিকট থেকে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া গেলেও, রলাঁ

শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সেতুবন্ধনের চেষ্টা বৃথা। আজ শ্রমিকশ্রেণী, জনসাধারণ—যাদের তিনি অন্ধ জনতা (herd) বলে ভাবতেন, তারাই আজ সক্রিয়, তারাই নতুন জগৎ গড়বার প্রচেষ্টার নেতা। শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি তাঁর "জাঁ-ক্রিস্তফ" ও "কোলাস ব্রইঞ"তে অনুভব করেছিলেন। আজ সেই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরও জরুরী। তাই ইংলণ্ডে *Foreign Affairs* পত্রিকায় যখন তাঁর ঘোষণাপত্র ১৯১৯-এর আগস্টে প্রকাশিত হয় তখন তার ভূমিকায় তিনি লেখেন :

"যুদ্ধের সর্বনাশা ফলগুলির মধ্যে যেটা ভবিষ্যতের পক্ষে সব থেকে বিপজ্জনক, সেটা হলো বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্য।...সমাজবিপ্লবের ফলে নিজেদের সুযোগ সুবিধা হারাবার ভয়ে বুদ্ধিজীবীরা প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকটেই আত্মসমর্পণ করছেন।"

এই ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে রলাঁ নিজে লিখেছেন :

"স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। এক বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা কয়েক শত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই এই ঘোষণাবাণীর মারফতই বোঝা গেল আমাদের এই সৈন্যবাহিনী কত শূন্য, কত ব্যর্থ, কত আত্মপ্রবঞ্চিত। এই আমার স্বপ্নভঙ্গের, আশাভঙ্গের প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রথম হইলেও তীব্রতা ইহার কম নহে। যুদ্ধ বিরতির পর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম এই ধরনের অভিজ্ঞতা আরও আমার ভাগ্যে আছে।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৫)

"জাঁ-ক্রিস্‌তফের" পর এই সময়ের মধ্যে রলাঁ আরও কয়েকখানা বই লিখেছিলেন। "কোলাস ব্রইঞ" (*Colas Breugnon*) তিনি শেষ করেন ১৯১৩ সালে। বইখানা ছাপা হবার সময় যুদ্ধ বেধে যায়, প্রকাশিত হয় ১৯১৯-এ। কোলাস সাধারণ ঘরের ছেলে, একজন শিল্পী। যে সব নামহীন শিল্পীরা ফ্রান্সের গির্জাগুলিতে পাথরের উপর অবিনশ্বর শিল্প-সৃষ্টি ক'রে রেখে গিয়েছে কোলাস তাদেরই একজন। এই বই তারই জীবনসংগ্রামের গল্প। "জাঁ-ক্রিস্‌তফ"-এ যেমন, "কোলাস ব্রইঞ"তেও তেমনই সমাজের নিম্নস্তরের যে মানুষ পরিশ্রম ক'রে জীবন কাটায় তার নিকট পৌঁছবার জন্যে কি আকুল আগ্রহ! রলাঁর 'লিলুলি' (*Liluli*) হচ্ছে একটি শ্লেষাত্মক নাটক। লিলুলি ভ্রান্তির দেবী—সাংবাদিক, লেখক, যুদ্ধের কবি, রাজনৈতিক নেতা, ডিপ্লোম্যাট, স্বয়ং ভগবান সকলেই এতে আছেন। "পীয়ের ও লুস"[১] (*Pierre et Luce*) যুদ্ধের পরিবেশে ভণ্ডামি, অজ্ঞতা, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দুইটি কিশোর-কিশোরীর সংগ্রাম ও প্রেমের গল্প। "ক্লেরাম্বো" (*Clerambault*) একটি সাধারণ মানুষের যুদ্ধের বিবেকের সংগ্রাম। যুদ্ধ শুরু হবার সময় সানন্দে ক্লেরাম্বো তার ছেলেকে "দেশের জন্য" যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদের মতো সেও স্বদেশ-প্রেমিক, জাতিবিদ্বেষী। কিন্তু ক্রমশঃ যুদ্ধের চরিত্র সে বুঝতে থাকে। তার ছেলে যুদ্ধে মরে যাবার পর সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল। কিন্তু এ লড়াই চিন্তারাজ্যের লড়াই। শেষ

[১] শীঘ্রই বাঙলায় প্রকাশিত হবে।

পর্যন্ত ক্লেরাম্বো একজন স্বদেশ-প্রেমিকের হাতে নিহত হলো যেমন হয়েছিল জাঁ-জোরেস। ক্লেরাম্বোতে গান্ধীর প্রভাব সুস্পষ্ট।

মহাযুদ্ধের পরে দুনিয়া দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল—ধনতান্ত্রিক দুনিয়া ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্কট—যে-সঙ্কট যুদ্ধের পূর্বেও ছিল—তা যুদ্ধের পর আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের অস্তিত্ব ধনতন্ত্রের সংকটকে আরও সর্বব্যাপী ক'রে তুলল। প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশ বাম ও দক্ষিণ—দুইটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল।

এই সংকট মানুষের যে কতখানি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অরাজকতা ও বুদ্ধির বিকার এনে দিয়েছিল সে-চিত্র মার্টিন দ্যু গার (নোবেল পুরস্কার, ১৯৩৭) তাঁর *L' Eté 1914*তে ("১৯১৪র গ্রীষ্মকাল") এঁকেছেন। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের মানুষের হতাশা সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় অস্তিত্ববাদের প্রবর্তক Gabriel Marcel তাঁর *Le Monde Cassé* ("ভগ্ন পৃথিবী"তে বলেছেন: "তোমার কি মনে হয় না যে আমরা একটা ভাঙ্গা পৃথিবীতে বাস করি; আর তাকে কি আদৌ বাস করা বলে? হ্যাঁ, ভাঙ্গা, যেমন একটা ভাঙ্গা ঘড়ি, যার স্প্রিংটা অচল।")

মার্টিন দ্যু গার (Martin du Gard), জর্জ দুয়ামেল (George Duhamel), জুল রমঁ্যা (Jules Romain) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই ভাঙ্গা পৃথিবীর অরাজকতার ভিতরে পলায়নপর (esacpist) না হয়ে সৎবুদ্ধির দ্বারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যৌথসমাজ, নীতি ও প্রেরণা, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে একটা স্থায়ী মূল্যবোধ ও

[নতুন মানবতাবাদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা সকলেই ব্যর্থ হলেন। ফ্রান্সোয়া মোরিয়াক (Francois Mauriac,) জর্জ বের্নানোস (Georges Bernanos,) রলাঁর বাল্যবন্ধু পল ক্লোদেল (Paul Claudel,) জাক্ মারিতেইন (Jocque Maritaine) প্রমুখ প্রখ্যাত ক্যাথলিক লেখকরা মানুষের সহজাত পাপের থিওরি ও অতীন্দ্রিয় ক্যাথলিক মানবতাবাদের আশ্রয় নিলেন। Henri de Montherlant, Drieu La Roche`lle-র মতো কয়েকজন ক্যাথলিক লেখক সরাসরি ফ্যাসীবাদের মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পেলেন।

এই সময়েই সেই ভগ্ন পৃথিবীতে একটি নতুন পৃথিবী জন্মলাভ করল। এই নতুন পৃথিবীর জন্মদাতা হলো বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবী।

বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল জীমারঅল্ড (Zimmerwaldএ ১৯১৫য়), দ্বিতীয় সম্মেলন হয়েছিল কীনথালে (Kienthal) ১৯১৬র এপ্রিলে। কীনথালে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যে জনসাধারণকে "রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করতে হবে ও মূলধনের মালিক হতে হবে।" সেখানে লেনিন আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে শ্রমিক-শ্রেণীকে ক্ষমতা "দখল" করতে হবে ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে এই মুহূর্তে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করতে হবে। লেনিনের পন্থা অবলম্বন ক'রে বলশেভিক পার্টি ১৯১৭ সালে রুশ দেশের নভেম্বর মাসে ক্ষমতা দখল করে।

জার্মানী, ফ্রান্স ও অন্যান্য যুদ্ধরত দেশগুলিতেও যুদ্ধের পৈশাচিক অভিজ্ঞতার ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। দুই চার বৎসরের মধ্যেই এইসব দেশগুলিতেও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে এবং অনেক বুদ্ধিজীবী তাতে যোগ দেন এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন জানান।

১৯১৪ সালে যে সব প্রগতিশীল বুর্জোয়া লেখকরা সোৎসাহে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন—তাছাড়া, যুদ্ধে যাওয়াটা ছিল সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক—তাঁদের মধ্যে আঁরি বারব্যুস (Henri Barbusse, 1873-1935), ভাইয়াঁ কুটুরীয়ে (Vaillant-Couturier), রেইমঁ ল্যফেভ্র (Raymond Lefe´vre) মার্তিনে (Martinet), গীলবো (Guilbeaux), জাঁ-রিসার ব্লক (Jean-Richard Bloch) প্রমুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু করেন। ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপনে এঁরা সকলেই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম অভিযানেই বারব্যুসকে অংশ গ্রহণ করতে হয় এবং সেই সময় অতি দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি কয়েকজন কমরেডের জীবন রক্ষা করেছিলেন কিন্তু তাতে তিনি নিজে গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন যার জন্য তাঁকে সারা জীবনের মতো অর্ধপঙ্গু হতে হয়েছিল। এই কাজের জন্য বারব্যুস সরকার কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। ভাইয়াঁ কুটুরীয়েও এইভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। ১৯১৬য় বারব্যুস যুদ্ধের পাশবিক বাস্তবতা উদ্‌ঘাটন ক'রে দেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *Le Feu* (*"Under Fire"*)

লিখে। বারব্যুসের মূল বক্তব্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তাঁর উপন্যাসে একজন সাধারণ সৈনিকের মুখ দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে : "একজন ব্যক্তি যুদ্ধের উর্ধ্বে নিজেকে তুলেছেন, যার সাহস ও দীপ্তি চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—তাঁর নাম লীবক্লেষ্ট।" এক বৎসরের মধ্যে বারব্যুসের এই উপন্যাসের ২ লক্ষ ৩০ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। "জাঁ-ক্রিসৃতফ" লিখে রলাঁ যেমন ১৯১২ সালে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিলেন, বারব্যুসের ক্ষেত্রেও তাই হলো। বারব্যুসের নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদের একটা বৃহৎ অংশ বামপন্থী আদর্শগত সংগ্রাম শুরু করলো।

অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীদের মতো ফ্রান্সেও বুদ্ধিজীবীদের দুইটি ব্যক্তিত্ব—একটি রাজনৈতিক, অপরটি সাংস্কৃতিক। নতুন পৃথিবীতে বারব্যুসের নেতৃত্বে বামপন্থীদের কাজ হলো বুদ্ধিজীবীদের একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্ব ও একটা সুসঙ্গত জীবন-দর্শন স্থাপন করা।

তখন থেকে শুরু হলো এক নতুন সংগ্রাম। একদল বুদ্ধিজীবী তাঁদের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে চললেন নতুন পৃথিবীর দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে, আর-একদল চললেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ; আর-একদল থেকে গেলেন মাঝামাঝি দোদুল্যমান অবস্থায়, পুরাতন পৃথিবীর মোহ কাটিয়েও উঠতে পারছেন না, আবার নতুন পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণও আছে, কিন্তু নতুন পৃথিবীকে পুরোমাত্রায় গ্রহণও করতে পারছেন না, আবার বর্জন করতেও পারছেন না।

রলাঁকেও যেতে হলো এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দশ বৎসর ধরে।

কিন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের তৎক্ষণাৎ সমাধান না করতে পারলেও রলাঁ নতুন পৃথিবীকেই গ্রহণ ক'রে নিলেন এবং তাকে রক্ষার জন্য সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। সেই সময় জার্মানীতে শ্রমিকদের বিপ্লব শুরু হয়েছে। স্যোশাল-ডেমোক্রাটিক সরকার ভূতপূর্ব কাইজারের সাম্রাজ্যবাদী অফিসারদের সাহায্যে এই বিপ্লব দমনের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। ১৫ই জানুয়ারী, ১৯১৯, এই অফিসাররা স্যোশাল ডেমোক্রাট মন্ত্রীদের হুকুমে জার্মান শ্রমিকদের জনপ্রিয় বিপ্লবী নেতা কার্ল লীবক্লেট ও রোজা লুক্সামবুর্গকে জেলখানায় নিয়ে যাবার পথে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি ক'রে হত্যা করে। "লুমানিতে" পত্রিকায় কতগুলি প্রবন্ধ লিখে রলাঁ তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে রলাঁ লেখেন:

"আমি তীব্র নিষ্ঠুর ভাষায় স্যোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের কলঙ্কময় ভূমিকাকে আক্রমণ করিলাম।...পরবর্তী ঘটনাবলীতে আমার এই আক্রমণের সার্থকতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া জার্মান বিপ্লবীগণকে বিপ্লবের শত্রুদের হাতে সমর্পণের অন্ধ পৈশাচিক নীতি ফ্রান্স অনুভব করিতেছিল, সেই ইঙ্গিতও আমি ঐ সঙ্গে দিয়াছিলাম। ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ ও প্রতিহিংসায় উন্মাদ যে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীকে আজ আমরা চোখের উপর দেখিতেছি, ফ্রান্সের সেদিনের সেই নীতিই তো তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৭)।

যুদ্ধের সময় থেকেই রলাঁ সোশালিস্ট পার্টির প্রতি বিরূপ ছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন। কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে রলাঁর যখন তীব্র বিতর্ক চলছিল, তখন সোশালিস্টরা তাঁকে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। তাদের সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রলাঁ কোনোদিনই সোশালিস্টদের নীতি সমর্থন ক'রে, কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করেননি।

বারব্যুস, জাঁ-রিসার ব্লক, ভাইয়াঁ-কুটুরীয়ে প্রমুখ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই, সর্বপ্রথম যাঁরা রলাঁকে সমর্থন করলেন ও তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব মেনে নিলেন, তাঁর নৈতিক শক্তি, তাঁর প্রতিভা ও যুদ্ধের সময় তাঁর প্রচণ্ড নৈতিক সাহসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের আদর্শগত মতভেদ তীব্র হয়ে উঠল। এবং এ মতভেদ ছিল মৌলিক।

রলাঁর "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে"র আবেদনের ভিত্তি ছিল ভাববাদী দর্শন, আর লেনিনের ছিল ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দর্শন। রলাঁর মতে যুদ্ধের কারণ মানুষের নীতিভ্রংশতা, মানসিক রুগ্নতা, ইয়োরোপীয় উচ্চাদর্শের বর্জন, সাম্রাজ্যবাদের লোভ, ইত্যাদি; রলাঁ যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলি তখনও অনুসন্ধান করেন নি। তিনি আবেদন করলেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের কাছে, তাঁর আবেদন মানব মনের একটি আন্তর্জাতিক অনুভূতির কাছে। পক্ষান্তরে লেনিন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখালেন যে, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক পরিণতি। (লেনিনের

"সাম্রাজ্যবাদ" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে)। যেখানে রলাঁ দাবী করেছিলেন শান্তি, সেখানে লেনিন প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রমিকবিপ্লব ও শ্রমিকশ্রেণীর তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার।

যুদ্ধ শেষ হলে রলাঁ তাঁর কর্মপন্থা ঠিক ক'রে নিলেন। "এই কয় বৎসর আমার প্রধান কাজ হইল ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবী বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ফ্রান্সের বাহিরে সমস্ত জাতির স্বাধীন চিন্তাবীরদের লইয়া একটি আন্তর্জাতিক সংঘ গঠন করা।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ১৫) সেই সময়েই বারব্যুসও "ক্লার্তে" (*Clarte*) নামক একটি পত্রিকা স্থাপন করলেন। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ক্লার্তেকে কেন্দ্র ক'রে সংগঠিত হতে লাগল। "উপায় ও উদ্দেশ্যের" (Ends and Means) প্রশ্নে ক্লার্তেপন্থীদের সঙ্গে রলাঁপন্থীদের তীব্র বিতর্ক শুরু হয়ে গেল এবং ১৯২০-২২এ তা চরমে উঠল। উভয় দলই বিপ্লবের সমর্থক, কিন্তু তার "উপায়" নিয়েই যত মতভেদ।

এই বিতর্কে বারব্যুস ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মূল বক্তব্য ছিল যে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নেতিবাচক সমালোচনা ক'রে ক্ষান্ত থাকলেই চলবে না, তাকে বদলাবার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে, নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন ও গঠনের কাজেও তাঁদের সাহায্য করতে হবে; যেখানে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে তাকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে, সেই সমাজের দোষগুলি শুধু দেখিয়ে, চিন্তার স্বাধীনতার অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না।

রলাঁপন্থীরা বলেছিলেন লক্ষ্য খাঁটি হলেই যে-কোনো উপায়ে লক্ষ্য লাভ করা নীতি সংগত নয়। সত্যকার প্রগতির পক্ষে লক্ষ্যবস্তুর অপেক্ষা লক্ষ্যবস্তু লাভের উপায়ই মূল্যবান বেশী। লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যদি হিংসার পথই বেছে নেওয়া হয়, তবে যে-প্রকৃতির গভর্নমেণ্টই হোক না কেন, প্রবলের উৎপীড়ন থেকে তুর্বলকে কখনও রক্ষা করা যায় না। বিপ্লবের যুগে সবই থাকে গলিত অবস্থায়, তাই লোকের মনে যে-কোনোরূপ পরিবর্তনের ছাঁচ সহজেই অঙ্কিত হয়ে যায়। বিপ্লব যাতে ঠিক পথে চলে, তারই জন্য চাই চিন্তার স্বাধীনতা। রলাঁপন্থীরা অহিংসা, অসহযোগ, গান্ধীবাদ ইত্যাদি প্রশ্নও তুলেছিলেন।

এই বিতর্কে উভয় পক্ষই চূড়ান্ত সীমায় চলে গিয়েছিলেন, এবং তাতে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিতর্ক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু ফ্রান্সেরই নয়, অনেক দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালেও এরূপ বিতর্ক অন্যান্য দেশেও উঠেছে। এতে রলাঁ ও তাঁর সমর্থকরা বাস্তববর্জিত একটা চরম আদর্শবাদের প্রচার করেছিলেন এবং তাঁদের বেশীর ভাগ বক্তব্যই ছিল অস্পষ্ট। (পরে রলাঁ এই সম্বন্ধে বলে ছিলেন: "বাস্তব সংগ্রামের অভিজ্ঞতাহীন ভাববাদী বুদ্ধিজীবীদের বাক্যে ও কর্মে এই অস্পষ্টতা থাকিবেই।" "শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৯)। অন্যদিকে বামপন্থীরা অনেক বিভ্রান্তি, চরম উগ্রতা (Ultra-Leftism), অসহিষ্ণুতা ও অপরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এত

তিক্ততা ও উষ্ণতা সত্ত্বেও দুই দলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল না এইজন্য যে উভয় পক্ষেরই ছিল বিপ্লব ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, এই বিতর্ক থেকে উভয় পক্ষই যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন।

জনগণের মধ্য হতেই বুদ্ধিজীবীদের জন্ম, অতএব জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা ও তাদের স্বাভাবিক নেতা হবার কথা তাদেরই। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে তাদের অনেকেই কতকগুলি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থেরই পরিপন্থী। সোভিয়েতে নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হলে এই সব ব্যাপার নিয়েই রুশ দেশের বহু বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক রাষ্ট্রের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সোভিয়েতকে কঠোর হস্তে তাদের দমন করতে হয়। এই সব নানা কারণে গর্কীর সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের মত বিরোধ ঘটে এবং গর্কী দেশ ছেড়ে চলে যান। (কয়েক বছর পর গর্কী সোভিয়েতে ফিরে আসেন ও তাঁর কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।) এ ব্যাপারে রলাঁ ও গর্কীর মধ্যে অনেক পত্রালাপ হয়েছিল। রলাঁও এই বিষয়ে সোভিয়েতকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি লিখেছিলেন :

"মনের স্বাধীনতা আরও বেশী করিয়া আমার রণপতাকা হইয়া উঠিল। তথাপি, ইহা যাহাতে আমার সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অজুহাত হইয়া উঠিতে না পারে, সে-বিষয়ে আমি সতর্ক থাকিলাম।"

যুদ্ধের পর রলাঁ পারীতে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই

বিতর্কের পর তিনি পুনরায় ১৯২২ সালে সুইট্জারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। রলাঁ বলেছেন :

"যখন কিছু দিনের মত গর্কী রাশিয়া হইতে স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করিলেন ঠিক তখন আমিও ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলাম।"

বার বৎসর পরে রলাঁ এই বিতর্ক সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

"কর্মরত বিপ্লবীগণের অসহিষ্ণু সংকীর্ণতাকে আক্রমণ করিয়া আমি যদি ভুল না করিয়া থাকি তবে তাহাদের কর্মের দিক হইতে দেখিয়া আমার এই অস্পষ্ট পথনির্দেশকে তাহারা যদি মূল্যহীন বলিয়া ধিকৃত করিত তবে তাহারাও ভুল করিত না। ভাবসর্বস্ব আদর্শবাদের ইহাই দোষ। কর্মক্ষেত্রের সীমান্তরেখাটির উপর যুগ যুগ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যস্ত অথচ বাস্তবের সহিত মুখোমুখি হয় নাই এমন যে আদর্শবাদ তাহা তো অস্পষ্ট ও অবাস্তব হইবেই। নীতিজ্ঞানহীন জুয়াড়ীর হাতে পড়িয়া যখন ইহা ভাববাদের বড় বড় কয়েকটি কথার জালে জড়াইয়া পড়ে তখন তাহা যে কোন্ কাজে লাগে একমাত্র ভগবানই বলিতে পারেন। 'আত্মা' ও 'চিন্তা' এই দুইটি কথা হইতে যে কত বিপদের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা আমি পরে বুঝিয়াছি। কারণ, নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কপট স্বার্থপরতা অতি সহজে এই দুটি কথাকে কাজে লাগাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন সম্পত্তি রক্ষা হয়, অপর দিকে তেমনি প্রতিক্রিয়ার সহায়তায় ও শ্রমিক বিপ্লবের স্বার্থহানি করিয়া নিজেদের সুযোগ-সুবিধাও লওয়া যায়।

"মন যে প্রকৃতির শক্তি এ কথা ঠিক। কিন্তু অন্যান্য শক্তির মধ্যে ইহার স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে। এই সকল শক্তির প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ অনুসারে বিপ্লব তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে নূতন জগৎ সৃষ্টির জন্য কর্তব্যে ও অধিকারে। সেদিন হইতে

আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি যে শ্রমিক বিপ্লবের সহিত সামাজিক কার্যের একাত্মতা সৃষ্টি মনের কর্তব্য। কারণ, ইহা নিজের অগ্রগতির এমন পথ সৃষ্টি করিতে করিতে যায় যাহা কানাগলির মধ্যে হঠাৎ শেষ হইয়া যায় না। তাই যদি হয় তবে আমি বলিব গৃহযুদ্ধের যন্ত্রণাজঠর হইতে বিজয়ী হইয়া বাহিরে আসিয়া স্টালিনের দৃঢ় অথচ কমনীয় হস্তের পরিচালনায় বিপ্লব স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৩০-৩১)

রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

সুইট্জারল্যাণ্ডে আসার পর থেকে রলাঁ একেবারেই নিঃসঙ্গ। যুদ্ধের সময়টা তাঁকে শুধু শারীরিক বিপদের মধ্য দিয়েই নয় (কিছুদিন পূর্বে যুদ্ধবাজ প্রতিক্রিয়াশীলরা জাঁ-জোরেসের মতো প্রভাবশালী লোককেও হত্যা করতে ইতস্তত করেনি), একটা গভীর মানসিক সংকটের মধ্য দিয়েও তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে। ইয়োরোপের যে আত্মিক শক্তির ভিত্তিতে তিনি তাঁর চিন্তারাজ্যের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তা আজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের সময় তিনি যে দিনপঞ্জী রাখতেন (*Journal des Annees de Guerre 1914-1918*, ৭ খণ্ড, ১৯০০ পৃষ্ঠা) তা তখনকার ইয়োরোপের সবদেশের মানুষের একটি অপূর্ব নৈতিক ইতিহাস।

এ সংকট সম্বন্ধে রলাঁ নিজেই বলেছেন :

"আমার অশান্ত আত্মার জন্য কর্তব্যপথের অনুসন্ধানে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম। আমার এ আত্মা ইয়োরোপের আত্মা, মনুষ্য-সমাজের একটি সমগ্র যুগের সাংঘাতিক আলোড়নে সে তখন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।"

যুদ্ধের পূর্বেই জাঁ-ক্রিসৃতফ অভিযোগ করেছিল: "আমাদের ইয়োরোপটা অত্যন্ত ছোট, তার দিগন্তটা অত্যন্ত সংকীর্ণ।" যুদ্ধের মধ্য দিয়েই রলাঁ নবদিগন্তের নির্দেশ পেলেন—নব জাগ্রত এশিয়া ও ইয়োরোপের বৈপ্লবিক শ্রমিকশ্রেণী। আজ আবার নতুন ক'রে মৈত্রীর সেতুবন্ধনের যুগ। বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, আত্মিক শক্তি হয়তো আবার এশিয়া থেকেই আসবে, যেমন এসেছিল প্রাচীন কালে। যদিও যুগ যুগ ধরে এশিয়া আত্মবিস্মৃত ও বিচ্ছিন্ন কিন্তু আজ সে জাগ্রত, আবার সচেতন হয়ে উঠেছে। এশিয়া ও ইয়োরোপের চিন্তার মিলন ঘটাতে হবে, এই দুই চিন্তার সেতুবন্ধন করতে হবে। তাই হবে বিশ্বচিন্তা, নবযুগের মানবতাবাদ তারই উপর গড়ে উঠবে। রলাঁ তাঁর "অগ্রণী"তে (*Precurseurs 1917*) এশিয়া ও ইয়োরোপের 'এলিত'দের নিয়ে মানবাত্মার আন্তর্জাতিক সংঘ গঠনের প্রস্তাব তুললেন। এই আন্তর্জাতিকে নতুন রুশিয়াও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। "রুশিয়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তার বিশাল দরজাগুলি প্রাচ্যের দিকে উন্মুক্ত যা দিয়ে প্রাচ্যচিন্তার বিশুদ্ধ বাতাস সে বুক ভরে নিতে পারে।"

যুদ্ধোত্তর যুগ শ্রমিক বিপ্লবের যুগ, সমগ্র মানবজাতির নবজন্মের যুগ। এই যুগ সকলের পক্ষেই, বিশেষ ক'রে মহাপুরুষদের ও বুদ্ধিজীবীদের একটা মহা পরীক্ষার যুগ। রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—এই তিনজনই হচ্ছেন এই যুগ-সন্ধিক্ষণের চিন্তাক্ষেত্রে তিন দিকপাল—তিনজনের প্রভাবই জগৎব্যাপী। এই তিনজনেরই জন্ম প্রায় একই সময়ে, তিনজনের মৃত্যুও প্রায় একইকালে—মাত্র দু'চার বছরের এদিক ওদিক। তিনজনের মধ্যেই ঘটেছিল পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ পরিচয়, পরম বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আর ছিল পরস্পরের মধ্যে চিন্তার বিনিময়। এই তিনজনেই তাঁদের জীবনসংগ্রাম শুরু করেছিলেন একটা বিমূর্ত মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা নিয়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্কে ঘটল যুগান্তর বলশেভিক বিপ্লব। তখন থেকে শুরু হলো দুনিয়াব্যাপী সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সুসংগঠিত বৈপ্লবিক আন্দোলন, নতুন পৃথিবী গড়বার জন্য একটা যুগান্তকারী, সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক বিপ্লবের যুগ। এই মহাবিপ্লবের অঙ্কুর পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল এবং তাই বিভিন্ন দেশে নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল এবং স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সকলকেই এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো। এই শ্রমিক বিপ্লবই বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে কে কতটা গ্রহণ করতে পেরেছেন, কে কতটা পারেন নি, বর্তমান চিন্তানায়কদের বিচারে এইটাই হচ্ছে

প্রধান মানদণ্ড—এই দ্রুত আমূল পরিবর্তনশীল যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর পারস্পরিক তুলনামূলক বিচারের আজ যথেষ্ট প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ, পরস্পরের অজ্ঞাতে, উভয়েই প্রায় একই রকমের চিন্তাধারা থেকে শুরু ক'রে যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একই মিলন ক্ষেত্রে এসে উপনীত হয়েছেন। ইয়োরোপের মহান্‌পুরুষের মতো এশিয়ার মহান্‌পুরুষও "যুদ্ধের উর্ধ্বে" উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ তার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ধরতে পেরেছিলেন। ১৯১৪ সালে "লড়াইয়ের মূল" প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : "ইয়োরোপের সেই প্রভুত্বক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা। এখন মুস্কিল হইতেছে জার্মানীর। তার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। ক্ষুধা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে অথচ কাঁটা ছাড়া আর বড় কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গমগম করিতেছে। সে বলিতেছে আমার জন্য যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না, আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া খাইব।" যে সময়ে প্রায় সকলেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশায় নিমগ্ন, আশাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধকে কেবল একটা নিছক ধ্বংস হিসাবেই দেখেন নি, এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়েই এক নতুন মানব সমাজ একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে—"বলাকাতে" (১৯১৬) কবি সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ যখন এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী লোভ ও হিংসার যুদ্ধ বলে নিন্দা করছিলেন, তখন শান্তিবাদী অহিংস গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করার জন্য তার রিক্রুটিং সার্জেণ্ট হিসাবে ভারতীয়দের সৈন্যদলে ভর্তি করাচ্ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬র ১৮ই জুন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা দেন তা রলাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বক্তৃতা স্বভাবতই ইয়োরোপের কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি, রলাঁ সেটি পেয়েছিলেন *Outlook* নামে একটি প্রগতিশীল আমেরিকান পত্রিকায়। রলাঁ তা পড়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি লিখেছিলেন : "এই বক্তৃতাটি জগতের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণের বার্তা।...ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আর ভীত নই।"[১] নিজের বক্তব্যের সমর্থনে রলাঁ নিজের লেখায় অনেকস্থানে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা ব্যবহার করেছিলেন ; তাঁর *Precurseurs*এও তার একটা অংশ তুলে দিয়েছেন।

---

১ *Inde : Journal 1915-1943 Pp. 11-12.* রলাঁ ১৯১৫ সাল থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি দিনপঞ্জী লিখতে শুরু করেন ও ১৯৪৩ সালে তা শেষ করেন। রলাঁ ভারতের প্রতি কত গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন তা ৬৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই ডায়েরীটি তার প্রমাণ। তাঁর সৃজনশীল জীবনের ত্রিশ বৎসর ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। সমগ্র রলাঁকে আমরা এই ডায়েরীতে দেখতে পাই, তাঁর সঙ্গে আরও দেখতে পাই বাস্তব সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে রলাঁর নিজের ভাববাদী দর্শন থেকে শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনের দিকে ক্রমবিকাশ।

"জঁ।-ক্রিস্তফ" পড়ে অমিয় চক্রবর্তী রলাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার উত্তরে রলাঁ লিখলেন (১৮ই মার্চ, ১৯১৭):

"গত কয়েক বৎসর ধরে ইয়োরোপ ও এশিয়ার মানসকে মিলিত করবার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে অনুভব করছি। এ দুটি হচ্ছে চিন্তা জগতের দুটি ভূখণ্ড, মানবাত্মার দুটি অংশ। এ দুটিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে হবে। আগামীকালের মানুষের এইটাই সুবিশাল অট্টালিকা। আপনাদের রবীন্দ্রনাথকে আমি শ্রদ্ধা করি, কেননা আমি অনুভব করতে পারছি যে এই ঐক্যতান তাঁর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে।" (*Inde, p. 13*)

এর এক মাস পর রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার *Christian Science Monitor* পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে মহাযুদ্ধটা হচ্ছে মানুষের একটা নেতির (negative) দিক মাত্র, যুদ্ধের পর মানুষের মনে শান্তি ও ঐক্যের জন্য এমন একটা আত্মিক ও নৈতিক চেতনার সঞ্চার হবে যে তা মানুষের ইতিহাসে সৃষ্টি করবে এক নতুন অধ্যায়। রলাঁও ঠিক এই আশাই পোষণ করতেন। উভয়েই

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বোস, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বোস, জওহরলাল, লাজপৎ রায়, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ বহু ভারতীয়দের সম্বন্ধে (যাঁদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল) অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, চিঠিপত্র এই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তার অনেক কিছুই এখন পর্যন্তও ভারতবাসীর নিকট অজ্ঞাত। বর্তমান যুগের ভারতের ইতিহাস আলোচনায় এই ডায়েরী অপরিহার্য। বাঙলাদেশে কিছু লোক এই বই সম্বন্ধে জানেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফরাসী ভাষাও জানেন, কিন্তু তাঁরা একেবারে চুপ। ইংরেজী ভাষায় এই বইখানার এখনও অনুবাদ হয়নি। বাংলা অনুবাদ র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে।

ছিলেন আপসহীন যুদ্ধবিরোধী; উভয়েই চান বিশ্বশান্তি ও মানবের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বলশেভিক বিপ্লব ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি বিশ্বের দরবারে ভারত ও এশিয়ার জন্য একটি আসন স্থাপন ক'রে দেন। (বিবেকানন্দ এই কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হয় নি।) রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বর্তমান ভারত সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়রা ছিল অজ্ঞ; এ বিষয়ে তাদের আগ্রহও বিশেষ ছিল না, অবজ্ঞারও অন্ত ছিল না। ভারতের দিক থেকেও এদিকে নজর ছিল না বিশেষ। জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে তার তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের ক্লীবত্ব নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল। তার কিছু দেবারও ছিল না, নেবারও ছিল না।

যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবদেশের বুদ্ধিজীবীদের পুনরায় ভ্রাতৃবন্ধনে আনবার জন্য ও স্বার্থপর রাজনীতির উর্ধ্বে উঠবার জন্য আহ্বান জানিয়ে রলাঁ যে "মানবাত্মার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" (Declaration of Independence of Mind) প্রচার করেন তাতে রবীন্দ্রনাথ যে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ ক'রে রলাঁ লিখলেন তাঁর প্রথম চিঠি রবীন্দ্রনাথকে (১০ই এপ্রিল, ১৯১৯): "আমার খুবই ইচ্ছা যে এখন থেকে এশিয়ার চিন্তা নিয়মিতভাবে ইয়োরোপের চিন্তার সঙ্গে সহযোগিতা করুক। একদিন চিন্তার

এই দুইটি জগৎকে ঐক্যবদ্ধ দেখবো এইটাই আমার স্বপ্ন। এই বিষয়ে অন্য যেকোন ব্যক্তির চাইতে আপনার অবদান বেশী—সেইজন্য আমি আপনাকে সম্মান করি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলেন। রলাঁ ২৬শে আগস্ট আবার কবিকে লিখলেন :

"এই কলঙ্কজনক বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পর—যে যুদ্ধ ইয়োরোপের নিষ্ফলতা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ইয়োরোপ একাকী নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার চিন্তায় এশিয়ায় চিন্তার প্রয়োজন আছে, যেমন ইয়োরোপের চিন্তায় এশিয়া উপকৃত হয়েছে। এ দুটি হচ্ছে মানুষের মনের দুইটি জগৎ। একটি বিকলাঙ্গ হয়ে পড়লে সমস্ত দেহটারই অবনতি ঘটে। তাদের ঐক্য ও সুষ্ঠু বিকাশের নিতান্ত প্রয়োজন। কাজে নেমে পড়ার দিন এসে গিয়েছে।…সমগ্র মানবজাতির মুক্তিই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন।"

মানবতার নতুন আদর্শের জন্য সংগ্রামের এই সংকল্প—এইটাই হলো রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর মিলনক্ষেত্র। এই সময় থেকে শুরু হলো বর্তমান যুগের দুইজন মহান্ পুরুষের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, কেবলমাত্র দুইজন ব্যক্তিবিশেষেরই বন্ধুত্ব নয়, এশিয়া ও ইয়োরোপের যা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ তারই বন্ধুত্ব এবং বিশ্বশান্তি ও নবযুগের মানবতাবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রাম।

রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২১ সালের ১৯শে এপ্রিল। এই সাক্ষাতের জন্য রবীন্দ্রনাথকে কম বেগ

পেতে হয় নি[১]। গান্ধীর অহিংসানীতি ও অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি ছিল আলোচ্য বিষয়। কবি বললেন: "ভারত হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ করে না।" বিশেষ ক'রে ভারতের আত্মিক ও নৈতিক "শ্রেষ্ঠত্বের" উপর তিনি খুব জোর দিলেন। (অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের মতো রবীন্দ্রনাথও এই অনৈতিহাসিক কাল্পনিক কাহিনীটি বিশ্বাস করতেন, অথচ ভারতের ইতিহাসে তার কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।) রবীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁকে তখন সব থেকে যা বেশী পীড়া দিচ্ছিল তা আমেরিকার নির্মম যান্ত্রিক সভ্যতা। তিনি আমেরিকায় এই আশা নিয়ে গিয়েছিলেন যে বহুজাতির বাসস্থান সেই দেশে জাতিসমন্বয়ের

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্সের যে সব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংশ্রব রাখতেন তাঁরা রলাঁকে যে একেবারে একঘরে করে দিয়েছিলেন তা কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি থেকেই বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে পারীতে গিয়েছেন ও সিলভাঁ লেভির বাড়িতে সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় বার বার বলছিলেন যে তিনি রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। "Romain Rolland's books had convinced father that he had much in common with him. ...Strangely enough, whenever father mentioned his desire to meet Romain Rolland our French friends somehow or other avoided the subject...nobody cared to help us to find him, although we discovered that he was then living in Paris. With great difficulty I secured his address, and one day I walked up many flights of dingy stairs to a flat on the top of an appartment house and knocked." (*On the Edge of Time, p 147*)

একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখবেন বলে। তার পরিবর্তে সেখানে তিনি দেখেছিলেন আমেরিকানদের উদ্ধত ধনগরিমা, তাদের অর্থলোলুপতা, যন্ত্রতন্ত্রের উন্মাদনায় মানুষের বিরামহীন নিস্পেষণ, দুর্বলের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুর আচরণ। (প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান আমেরিকার বৈশিষ্ট্য যে ধরতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ কি? তিনি রলাঁকেও বললেন যে আমেরিকা তাঁর নিকট একটা দুঃস্বপ্ন—nightmare। উভয়েই আশা প্রকাশ করলেন যে যেখানে আমেরিকা বিফল হয়েছে নতুন রাশিয়া পদানত জাতিগুলির মন জয় করতে পারবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। (*Inde, p. 29*)।

এই সাক্ষাৎকারের পর রবীন্দ্রনাথ কালিদাস নাগকে লিখেছিলেন (৯ই মে, ১৯২২) যে, "সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই রম্যাঁ রলাঁ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, পশ্চিম দেশে যেসব মনীষীদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে তাঁদের মধ্যে রলাঁই হচ্ছেন আমার মনের ও হৃদয়ের সব থেকে নিকটতম। রলাঁর নিকট তাঁর দেশ ও জগতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সেইজন্যেই জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার চ্যাম্পীয়নদের দ্বারা তিনি নির্যাতিত হচ্ছেন। আমি সর্বান্তকরণে রলাঁর সঙ্গে একমত। চূড়ান্ত বিজয় আমাদের হবেই, কেননা এইটাই হচ্ছে সত্য এবং এতেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি।" (*Inde, p. 28*)

প্রথম থেকেই রলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেরকম একটা ঘনিষ্ঠ আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল, রলাঁ-গান্ধী সম্পর্ক সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় কিনা সন্দেহ, যদিও রলাঁ এক সময়ে গান্ধীকেও বর্তমান জগতের একজন মহান্ পুরুষ বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে গান্ধী তাঁর আদর্শের দ্বারা জাতিধর্মদেশকাল নির্বিশেষে সমগ্র নিপীড়িত মানুষের মুক্তিপথ দেখাতে পারবেন।

এই সময়ে রলাঁ ভারত ও এশিয়ার প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

"এশিয়া ভ্রমণে ও শান্তিনিকেতনে কিছুকাল থাকবার আমার খুব ইচ্ছা আছে। আপনার কাছে আমার অনেক কিছু শিখবার আছে।...ভারত আমার কাছে এখন আর একটা বিদেশী দেশ মাত্র নয়, তা হচ্ছে সব থেকে মহৎ দেশ, একটি প্রাচীন দেশ যেখান থেকে একদিন আমি এসেছিলাম। আমি আবার তাকে আমার অন্তরের গভীরে অনুভব করছি।" (*Rolland and Tagore, p. 43*)

রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে ভারতে ফিরে এসে দেশের যে অবস্থা দেখেছিলেন তাতে তিনি মোটেই খুশি হতে পারেন নি। গান্ধী-প্রবর্তিত চরকা পূজা, বিদেশী কাপড়ের অগ্নিযজ্ঞ, এক বৎসরে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি, খিলাফৎ (যে খিলাফৎকে নব্য-তুর্কীর কামালপন্থীরা ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল, ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দিয়ে তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন) —এসব বিজ্ঞান ও প্রগতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন

ও চিন্তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ "সত্যের আহ্বান," "সমস্যা," "স্বরাজ সাধনা", "বৃহত্তর ভারত," "হিন্দু মুসলমান" ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে যে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন তা যদি মেনে চলা হতো তাহলে নিশ্চয়ই আজ ভারতবর্ষকে বহু খণ্ডিত অবস্থায় এই দুর্দশা ও হীনতার মধ্যে পড়তে হতো না। "সত্যের আহ্বান"কে রলাঁ বলেছিলেন "a poem of sunlight."

এই মতবাদের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে লিখেছিলেন। গান্ধীর *Young India*র প্রবন্ধগুলি পড়ে রলাঁও গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাগুলি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর "গান্ধী" পুস্তকে তার সমালোচনাও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে রলাঁ লিখেছিলেন যে তিনি "গান্ধী" লিখলেও তাঁর মধ্যযুগীয় মতবাদগুলিকে গ্রহণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ, রলাঁ ও গান্ধী তিনজনেই ছিলেন ভাববাদী দার্শনিক—কিন্তু এ বিষয়েও তিন জনের মধ্যে অনেক তফাত ছিল। রলাঁ ছিলেন চূড়ান্ত যুক্তিবাদী (ফরাসী বিপ্লবের চিন্তার উত্তরাধিকারী), তিনি যে আত্মিক শক্তি, যে আত্মাতে বিশ্বাস করতেন তা হলো—তাঁর নিজের কথায়—মন ও হৃদয় মিলে আত্মা ; তাই রলাঁর পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে, ভাববাদী দর্শনের মোহ কাটিয়ে ওঠা ও প্রায় সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী দর্শন গ্রহণ করা অসম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন যুক্তিবাদী, কিন্তু সেইসঙ্গে ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদীও বটেন। তিনি যে বর্তমান যুগের প্রধান সমস্যাগুলিকে বুঝবার এবং

যুগবৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন তা তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" ও তাঁর পরবর্তীকালের বহু কবিতা সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারেন নি। আর গান্ধী বিশ্বাস করতেন ঐন্দ্রজালিক আধ্যাত্মিকতাবাদে ; তাই তাঁর কল্পিত রামরাজ্য থেকে তিনি এক পা'ও বর্তমান যুগের দিকে এগোতে পারেন নি।

অনেক ইয়োরোপীয় রবীন্দ্রনাথকেও পাশ্চাত্যের একজন খাঁটি আধ্যাত্মবাদী ত্রাণকর্তা ঋষি বলেই চিন্তা করতে পছন্দ করতেন। একটা সময়ে, যুদ্ধের ঠিক পরে, রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরাও এই রকম একটা ধারণা প্রচার করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বার্নার্ড বোভিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ঋষি বলেই ধরে নিয়েছিলেন। আলাপ আলোচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মুখে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও এশিয়া ও আফ্রিকাতে ইয়োরোপীয়দের নিষ্ঠুরতার মতো পার্থিব কথাবার্তা শুনে তিনি তো চটেই গেলেন এবং বললেন যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন একজন "ভয়ঙ্কর বলশেভিক" —"redoubtable Bolshevik." (*Inde p. 30*)

গান্ধীকে সমালোচনা করার ফলে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা সেই সময় খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে রলাঁ যেমন একঘরে হয়ে পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপই হয়েছিল। এই সময় তিনি নিজেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও একাকী মনে করেছিলেন এবং নৈরাশ্য তাঁর চিন্তাকে খুবই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। তাঁর দিক থেকেও এই

সময় কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছিল। "বলাকা"র (১৯১৬) বলিষ্ঠ আশাবাদী সংগ্রামী সুরের স্থানে "পূরবী"তে (১৯২৫) হতাশা ও আত্মসমর্পণের সুরই ধ্বনিত হয়েছে। সোভিয়েত দেশে না যাওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই নৈরাশ্য কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪, ২১শে ফেব্রুয়ারী রলাঁকে লিখলেন "আমার অন্তরে একটি গৃহযুদ্ধ অনবরত চলছে—একদিকে আমার সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব যা স্বভাবতই নিঃসঙ্গ থাকতে চায়, আর একদিকে একজন আদর্শবাদী, যে চায় বহু কঠিন কর্মের দ্বারা নিজেকে উপলব্ধি করতে, যার জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল ক্ষেত্রে বহুলোকের সহযোগিতা।" রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র গজদন্ত-প্রাসাদের কবি হতেন অথবা শুধুমাত্র বিমূর্ত মানবতাবাদের কবি হতেন তা হলে হয়তো তাঁকে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হতো না।

১৯২৫ আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের ভিলন্যভে যাওয়া সব ঠিকঠাক হয়েছিল। রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জী *Inde (p. 100)*-এ লিখছেন:

"রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবার নতুন ক'রে নিরাশ করলেন। গত তিনমাস ধরে তাঁর ভিলন্যভে আগস্ট মাসে আসার কথা তিনি আমাদের জানাচ্ছেন। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত চিঠিগুলিতে সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে তিনি ১লা আগস্টে বম্বে থেকে যাত্রা করবেন। তারপর আর একটা খবরে কাজের চাপের অজুহাতে এই যাত্রা ১৫ই আগস্টে

পিছিয়ে দেওয়া হলো। গতকাল (১৭ই আগস্ট) কালিদাস নাগের চিঠি আমাদের উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে ; তিনি লিখেছেন যে ইয়োরোপে তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলি আক্রমণ হয়েছে বলে তিনি আদৌ ইয়োরোপ যাত্রা করবেন কিনা সন্দেহ। অবশেষে, আজ, রবীন্দ্রনাথ এক টেলিগ্রামে বলেছেন যে স্বাস্থ্যের কারণে আপাতত ইয়োরোপ যাত্রা বাতিল ক'রে দিলেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সব আয়োজনই করা হয়েছিল : হোটেল বায়রন, ভালমণ্টের চিকিৎসক ; থোনাতে মহিলা শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের আন্তর্জাতিক অধিবেশনে তাঁর অভ্যর্থনা ; বহু যুব-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। প্রকাশক রনিগার, যিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, ইয়োরো-এশিয়ান সহযোগিতার বিষয়ে ও এই সম্বন্ধে বই ছাপানোর পরিকল্পনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। সবই ব্যর্থ হলো। আমার আশঙ্কা এই সব ভারতীয়দের উপর নির্ভর ক'রে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভব। এঁরা যেমন সহজে উৎসাহিত হন, তেমনই ভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। এঁদের নিজেদের পরিকল্পনা-গুলিকে সফল করার জন্য অন্য কাউকে এঁদের সঙ্গে লেগে থাকতে হয়। এ সব কাজের প্রয়োজন তাঁদেরই বেশী, তাতে আমাকে আমার অনেক সময় ব্যয় করতে হয় এবং আমি তাঁদের নিকট থেকে বিশেষ কিছু সাহায্যও পাই না—(একমাত্র কালিদাস নাগ ছাড়া)। রবীন্দ্রনাথ জানেন না যে তাঁর এই না আসার জন্য তাঁর কতটা ক্ষতি হলো।"

কয়েকদিন বাদে রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে আবার লিখলেন (২৩শে সেপ্টেম্বর) যে তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁর চিকিৎসক তাঁর ইয়োরোপ যাত্রায় আপত্তি করেছিলেন—

"কিন্তু তিনি জানেন না যে ভারতে থাকার জন্য আমাকে কী প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার (mental tension) মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। একটা বিরামহীন ও অদৃশ্য নৈতিক নিঃসঙ্গতা আমাকে সব থেকে বেশী পীড়া দিচ্ছে ও পাষাণের মতো আমাকে চেপে রেখেছে। যদি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হাত মেলাতে পারতুম তাহলে সবসময়ের জন্য সাধারণ অনুমোদনলাভ করা যেত। কিন্তু আমি এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে আমাদের সত্যের ধারণা ও তাঁর সন্ধানের পন্থা আমূল পৃথক। আজকের ভারতে যদি কেউ প্রশান্তি চায় তাহলে তার গান্ধীর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই। তাই সামনের মার্চ মাসে পরিত্রাণ পাবার আশায় একটা অদম্য ইচ্ছা আমাকে অধৈর্য ক'রে তুলেছে। আমি বিশ্বাস করি যে ইয়োরোপে আমার বন্ধু রয়েছেন যাঁরা আমার প্রকৃত আত্মীয় এবং যাঁদের সহানুভূতি আমাকে বর্তমানের অবসন্নতা থেকে উর্ধ্বে তুলে নেবে।" (*Inde p. 103*)

আশ্চর্যের বিষয় যে "রলাঁ অ্যাণ্ড টেগোর" বইখানিতে রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত চিঠিখানা নেই,[১] কিন্তু তার জবাবে

---

[১] সাধারণতঃ "অফিসিয়াল" রবীন্দ্রভক্তরা রবীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলি, তাঁর "রাশিয়ার চিঠি" ও এই ধরনের মূল্যবান লেখাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন না। অথচ এই সব লেখার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অগ্রগামী চিন্তার বিকাশ হয়েছে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময়েও এগুলিকে তাঁরা সযত্নে বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবান ও কমমূল্যবান চিঠিপত্র তাঁরা আজও প্রকাশ ক'রে যাচ্ছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল (যার অনেকগুলি রলাঁর দিনপঞ্জী *Inde*এর মধ্যে ফরাসী ভাষায় পাওয়া যায়) তার কপিগুলি কি তাঁদের কাছে নেই, তাঁরা কেন সেগুলিকে চেপে

রলঁা রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখেছিলেন (২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৫) সেটি আছে :

"আমি একজন বৃদ্ধ ফরাসী, আমাকেও আমার নিজের দেশে বিদেশী ক'রে রাখা হয়েছে, আমার চাইতে আপনাকে কে বেশী ভাল বুঝবে ?...যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ আত্মা ও তার মানবতা-বোধকে প্রতিরক্ষা করার জন্য ফ্রান্স আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ; এইমাত্র ফরাসী থিয়েটার ঘোষণা করেছে যে, যে-লোক *Au dessus de la Melee* (যুদ্ধের উর্ধ্বে) লিখেছেন, তাঁর কোন নাটক মঞ্চস্থ করা হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে আমরা—যারা "যুদ্ধের উর্ধ্বে"—আমরাই সব থেকে বেশী সংগ্রামী। আমাদের যুদ্ধ কোনো আপস জানে না, কোনো যুদ্ধ-বিরতি জানে না, কোন সন্ধি জানে না।"

কোনো সন্দেহ নেই যে আদর্শের প্রশ্নে রলঁা পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করেছিলেন।

যেসব ভারতীয় নেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র রলঁার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁদের সম্বন্ধে একটা বিষয় রলঁার খুবই আশ্চর্য ও বেদনাদায়ক বলে মনে হতো—তা হচ্ছে তাঁদের ইয়োরোপীয় রাজনীতির প্রতি দাম্ভিক ঔদাসীন্য। একদিন (১৯২২,

---

রেখেছেন ? বিশ্বভারতী 'রলঁা অ্যাণ্ড টেগোর' নাম দিয়ে আলেক্স অরনসন ও কৃষ্ণ কৃপালনীর সম্পাদনায় যে ইংরেজী বইখানা বের করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও রলঁার মৃত্যুর পর, তাতে কেবলমাত্র কয়েকখানি মামুলী চিঠিপত্রই প্রকাশিত হয়েছে, মূল্যবান তাৎপর্যপূর্ণ আদর্শগত চিঠিপত্রগুলির কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

এপ্রিল) দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক এডুয়ার্ড মোনো-হেরজেন (Edouard Monod-Herzen) এসেছেন রলাঁর বাসায় ডঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি আলোচনা করবেন বলে। মোনো-হেরজেন ডঃ নাগকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কালিদাস নাগ কাঁধ দু'টো একটু উঁচু ক'রে হেসে বললেন : "ওটা রাজনীতি," (অর্থাৎ, ও ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই,)—"এবং মোনো-হেরজেন অবাক হয়ে হা ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কিছুই বুঝতে পারলেন না। একজন ইয়োরোপীয় কি ক'রে বুঝবেন যে ভারতীয়দের কাছে রাজনীতি কিছুই না, সব কিছুই হলো inner life—অন্তর্জীবন ?" (*Inde : p. 31*)

আর একদিন মাদ্রাজের খ্রীষ্টান নেতা কে. টি. পল ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংফর্স-এ আন্তর্জাতিক খ্রীষ্টীয় যুব কংগ্রেসে যাবার পথে এসেছেন রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রলাঁকে পল খ্রীষ্ট ধর্মে প্রেম, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। অবশেষে রলাঁ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন—যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, অর্থাৎ বর্তমান জীবনে মানবতাবোধ ও বিবেকের এই যেসব সংকট, এ সম্বন্ধে তাঁর ও অন্যান্য ভারতীয় খ্রীষ্টানদের কি অভিমত ? পলেরও কোনো বক্তব্য নেই, কেন না তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক, কেবলমাত্র কালচার নিয়েই থাকতে চান। এ বিষয়ে রলাঁর মন্তব্য :

"আমি লক্ষ্য করেছি যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথই নন, সমস্ত ভারতীয়রাই ইয়োরোপের ঘটনাবলী সম্পর্কে কেমন যেন আশ্চর্য রকমের

উদাসীন ও সংস্রব শূন্য এবং একটু বিদ্রূপাত্মক। আমাদের কাছে এটা খুবই বেদনাদায়ক। (*Inde, p. 170*)

এই প্রসঙ্গে রলাঁ ডাঃ কালিদাস নাগকে লিখছেন (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৬) :

"আপনার দেশের হৃদয়বান ও উচ্চচিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার অনেক সময় মনে হয়েছে যে ইউরোপের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের শত শত বৎসরের একটা ব্যবধান ও একটা ভৌগোলিক দূরত্ব রয়েছে। তাঁদের মনোভাবটা এই: 'এটা ইউরোপ। এটা আমাদের নয়।' এশিয়াবাসীদের দুর্গতি ও তাদের মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে আপনাদের মতো আমরাও কি বলব: 'এটা আমাদের ব্যাপার নয়?' আমি একথা কখনই বলতে পারব না। কিন্তু আমার কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুর মধ্যে ভারতীয় মনোভাবে হতাশ হওয়ার ফলে এই রকম একটা প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হচ্ছে; এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। এই সমস্ত সমস্যাগুলির মধ্যে যে বিশ্বজনীনতা রয়েছে সেটাকেই আমাদের চিন্তা ও লেখার মধ্য দিয়ে সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে। ইউরোপের রাজনীতি ও ভারতবর্ষের রাজনীতির মধ্যে দুই রকমের বিচার হতে পারে না। যেখানেই হোক, যাঁরা ন্যায়ের জন্য লড়ছেন, মুক্তি-সংগ্রামের দুনিয়ার সকল শহীদই আমাদের সকলের নিজস্ব। আপনারা আমাদের টা গ্রহণ করুন—আমরা আপনাদের টা গ্রহণ করছি—।"

উপরিউক্ত চিঠির উপসংহারে রলাঁ লিখছেন :

"যখন দেখি যে ইউরোপে ভারতীয় যুবকরাও নির্বোধ ও শিশুসুলভ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের অহংকারে প্রভাবান্বিত হচ্ছে, তখন

খুবই বেদনা অনুভব করি। ইউরোপ থেকে কিছু শিখবার পূর্বেই তারা ইউরোপকে ঘৃণা করতে শুরু করে। আমার কতকগুলি লেখাও তাদের আত্মহারা ক'রে তুলেছে। ইউরোপের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তিকে তারা ছোট ক'রে দেখে। তারা নিজেদের একটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করছে ও সেই অধিকার স্থাপনের কথা ভাবছে। (ফ্রান্সে চীনাদের মধ্যেও এই মনোভাব লক্ষ্য করেছি)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমরা সারাজীবন ধরে আমাদের ইয়োরোপের জাতীয়তাবাদী-দের ও ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়াই করলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি যে, যাদের জন্য লড়লাম সেই সব অত্যাচারিত মহান্ জাতিগুলির মধ্যেই সেই একই মানসিক ব্যাধি প্রবেশ ক'রে বসে আছে।...” (*Inde, Pp. 170-71*)

১৯২৬ সালে ৩০শে মে মুসোলিনি ও ইতালি সরকারের অতিথি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতালিতে এসে পৌঁছলেন ও তিন সপ্তাহ সেখানে কাটালেন।

ইতিপূর্বে ১৯২৫ সালে ইতালির দুইজন ভারত-বিদ্যার পণ্ডিত অধ্যাপক ফরমিচি (Formichi) ও তুচ্চি (Tucci) শান্তি নিকেতনে এসেছিলেন ও মুসোলিনির তরফ থেকে কতকগুলি মূল্যবান বই উপহার দিয়েছিলেন। এই দুই পণ্ডিত ইতালির ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র হয়েই এসেছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ইতালি ভ্রমণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে ইতালির ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হলেন। ঠিক হলো, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ ও আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে যাবেন।

বম্বেতে এসে রবীন্দ্রনাথকে একটা ইতালির জাহাজে তুলে দিয়ে অন্যদের বলা হলো তাঁদের জন্য এ জাহাজে আর স্থান নেই। এই ভাবে চক্রান্ত ক'রে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথক ক'রে নিয়ে তাঁকে তাদের কবলে নিয়ে এল ও তাঁর নিকট ফ্যাসিবাদের মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে তাঁকে ফ্যাসিবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ক'রে তুলবার চেষ্টা শুরু হলো। মহলানবিশ ও অন্যান্যরা যখন ইতালিতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসোলিনির প্রথম সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির বীরোচিত চেহারায় ও ছল-চাতুরীপূর্ণ কথাবার্তায় প্রথমতঃ খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে মুসোলিনি হচ্ছে বর্তমান যুগের নেপলিয়ন। মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়েছিল যে ইতালিতে যেরূপ অরাজক অবস্থা ছিল, তাতে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য তাকে কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হয়েছিল এবং বাধ্য হয়ে জনসাধারণের অনেক গণতান্ত্রিক অধিকারই কেড়ে নিতে হয়েছিল। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথকে মুসোলিনি বলেছিল :

"আমি হচ্ছি তাদের মধ্যে একজন যে ইতালীয় ভাষায় অনূদিত আপনার সব বইগুলিই পড়েছে, ও আমি একজন আপনার বিশেষ অনুরক্ত। ইতালিতে এই রকম আরও বহু লোক আছেন।"

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মৌলিক নীতিগত প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি হিংসায় বিশ্বাস করেন না। তাঁতে কোনোরকম ইতস্তত না ক'রে মুসোলিনি জবাব দিয়েছিল : "আমিও হিংসার ভীষণ বিরোধী।"

এই আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce) যাঁকে ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে সারা জগতে আমরা সবাই জানি, তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে আমি ইতালি ছেড়ে যেতে চাই না।"

তৎক্ষণাৎ ফরমিচি (যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সব সময়ই জোঁকের মতো লেগে থাকতেন) বলে উঠলেন :

"না, না, না, সে হয় না, এটা সম্ভব নয়।"

মুসোলিনি তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বলল :

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তাঁকে আমরা টেলিগ্রাম ক'রে আনিয়ে দিচ্ছি।"

ক্রোচেকে সেই সময় গৃহবন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করানো হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে শুধু আধ্যাত্মিক কথাবার্তাই হয়েছিল, তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মতামত ব্যক্ত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এতই প্রীত হয়েছিলেন যে সাক্ষাতের শেষ দিকে তিনি মুসোলিনিকে বললেন :

"জগতে যত রাষ্ট্রপ্রধান আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনার নামেই সব থেকে বেশী বদনাম রটানো হয়েছে।"

উত্তরে নির্দোষিতার ভান ক'রে মুসোলিনি বলেছিল :

"তাতো আমি জানি কবি, কিন্তু কি করব, আমাকে যে কর্তব্য পালন করতেই হবে।"

ইতালিতে রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানে গিয়েছিলেন ও অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনির

প্রশংসাই সর্বত্র শুনেছিলেন। যাঁরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী তাঁরা তখন হয় নিহত, না হয় কারারুদ্ধ, নয়তো নির্বাসিত। প্রতিদিন ইতালির সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ ও বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁর ফটো সমেত ফলাও ক'রে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতো। ফরমিচিই এই সব রিপোর্টগুলি তৈরি ক'রে দিতেন এবং ফ্যাসিবাদ ও মুসোলিনির প্রশংসাসূচক এমন অনেক কথা চালিয়ে দিতেন যা রবীন্দ্রনাথ কখনোই বলেন নি।

২১শে জুন রবীন্দ্রনাথ ইতালি ভ্রমণ শেষ ক'রে ভিলন্যভে এসে পৌঁছলেন। তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর ইতালি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রলাঁকে কিছুই বললেন না, শুধু সঙ্গীত, কবিতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হলো। ২৪ তারিখেও এই সব বিষয়েই আলোচনা করতে করতে হঠাৎ ইতালি ভ্রমণের কথা শুরু ক'রে দিলেন। অনেক কথা বলে তিনি ফ্যাসিবাদের সমর্থনে তাত্ত্বিক কথা বলতে লাগলেন :

"যদি একটা জাতি সত্যই নিজেদের শাসনকার্য চালাতে অসমর্থ হয়, যদি এই আশংকা থাকে যে নিরর্থকভাকে পরস্পর মারামারি, কাটাকটি ক'রেই তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে মুসোলিনি যে প্রকার একাধিপত্য স্থাপন করেছেন তা নিতান্তই প্রয়োজনীয় এবং সাময়িকভাবে তিনি যেসব অধিকার কেড়ে নিয়েছেন তাতে জনসাধারণ লাভবানই হবে।" (*Inde, p. 111*)

যে রবীন্দ্রনাথ "মানবাত্মার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে" স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাঁরই মুখে এই ধরনের কথাবার্তা শুনে রলাঁ বুঝতে পারলেন যে ইয়োরোপের কূটরাজনীতির বাইরের চাকচিক্য ও তার চাটুকারিতা ভেদ ক'রে তার অভ্যন্তরে কবি প্রবেশ করতে পারেন নি।[১]

এই আলোচনা সম্বন্ধে রলাঁ লিখেছেন তাঁর দিনপঞ্জীতে : "একটি কথাও না বলে আমি শুনে যাচ্ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বাক্যপ্রবাহ অবিশ্রান্ত ভাবে চলতে লাগল (—তাঁকে নিয়ে খুবই মুস্কিল), সবই অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, তথ্যের ব্যাপারে অনির্দিষ্ট। …আমার ভয় হয়, শোনার চাইতে বলাটাই তাঁর বেশী প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা খুবই কঠিন। দীর্ঘায়িত ক'রে বলতে তিনি পছন্দ করেন, তাতে তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।…শ্রোতার যখন উত্তর দেবার মুহূর্ত আসে তখন তাকে একটি মাত্র প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়, যেখানে

---

১ এই সময়কার ভারতীয় নেতারা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে ও এমন কি সাধারণ রাজনীতি সম্বন্ধেও কতটা নাবালক ছিলেন তা *Modern Review*-এর মতো ভারতের শ্রেষ্ঠ ওয়াকিবহাল পত্রিকার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় ; এই অজ্ঞতার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল আধ্যাত্মিক দম্ভ ! "Italy atones for her sins in the past under the command of Mussolini, the high priest. If he is relentless and cruel it is because he feels it is to be his *Dharma*. In Mussolini, one sees the spirit of *Krishna* expounding the philosophy of *Gita* to *Arjuna* before the battle of Kurukshetra. He is reported to be dispassionate in his cruelty, when he chastises his fellows." (*October, 1926*).

রবীন্দ্রনাথ দশটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আসল সমস্যাগুলিতে আসছিলেন না। আমি অনেকক্ষণ ধরে কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম, এবং কিছু বলতে না পেরে অধীর হয়ে উঠছিলাম।" (*Inde, p. 112*)

রলাঁ কয়েকদিন ধরে রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবাদের উগ্র সাম্রাজ্যবাদীরূপ এবং তার জাতিবিদ্বেষ, হিংসা ও যুদ্ধবাজ চরিত্র সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ইতালিতে মুসোলিনি কিভাবে গণতন্ত্র পদদলিত করেছে ও মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ডিক্‌টেটরি শাসনব্যবস্থা স্থাপন ক'রে সমগ্র ইতালির মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও আমেন্দোলা, মাত্তেওত্তির মতো ইতালির শ্রেষ্ঠ মানুষদের হত্যা করেছে, বহু লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, শত শত লোক নির্বাসনে যেতেবাধ্য হয়েছে এবং বেনেদেত্তো ক্রোচের মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষীকে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে তার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথকে শোনালেন। তারপর, ইতালির সংবাদপত্রগুলিতে মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদের প্রশংসাসূচক রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে যে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল তাও পড়ে শোনালেন। কবি অনেকখানি বুঝলেন তবুও তাঁর দোমনা ভাব তখনও কাটল না।

ইতিমধ্যে ধূর্ত মুসোলিনি রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে। বিশ্বকবি যে ফ্যাসিবাদকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন একথাটা সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যায়

জড়িয়ে নানাভাবে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিল মুসোলিনি। এ পর্যন্ত জগতের কোনো মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিবাদকে সমর্থন জানাননি, বরং তীব্র ভাষায় তাকে নিন্দা করেছেন। জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এই সর্বপ্রথম স্তুতি আদায় করেছে মুসোলিনি। রবীন্দ্রনাথের এই কাজে পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীরা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন। রলাঁ চতুর্দিক থেকে চিঠি পেতে লাগলেন। সবদেশে কবির নিন্দা হতে লাগল। রলাঁ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কবির সুনাম আবার কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাই ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

২৯শে জুন আবার বৈঠক বসেছে—ফ্রান্সের বিখ্যাত সাহিত্যিক জর্জ ডুয়ামেলও উপস্থিত আছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতে ইংরেজের অত্যাচার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তুললেন। এ সুযোগ রলাঁ ছেড়ে দিলেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও মহলানবিশকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনারা ভারতে ইংরেজ শাসনের পশুবলকে নিন্দা করেন, অথচ সেই পশুবলকেই ইতালিতে গিয়ে সমর্থন করেন; ইংরেজরা ভারতে যেভাবে দমন-নীতি চালায়, মুসোলিনিও সেইভাবে আরও হিংস্রতার সঙ্গে ইতালীয় জনসাধারণকে পদদলিত করে। রলাঁ লিখছেন তাঁর দিনপঞ্জীতে :

"আমি আরও খোলাখুলিভাবে রবীন্দ্রনাথ ও মহলানবিশকে বললাম যে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কি ক'রে আপনারা মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদের পক্ষে ওজর খুঁজে বার করছেন।

যদি ইতালির অত্যাচার ও মিথ্যাকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ দিয়ে সমর্থন করা হয়, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকেও কোনো মতে সমর্থন করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ ও মহলানবিশ কোনো উত্তরই দিতে পারলেন না, মাথা নিচু ক'রে রইলেন ও মৌন সম্মতি জানালেন। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বললেন যে এই বিষয়ে তিনি লিখিতভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করবেন।" (*Inde p. 139*)

অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো যে রবীন্দ্রনাথ দুয়ামেলকে একটা ইণ্টারভিউ দেবেন এবং সেটা তিনি সমস্ত পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন। ঠিক হলো দুয়ামেল তাঁর প্রশ্নগুলি লিখে দেবেন ও রবীন্দ্রনাথ তার লিখিত জবাব দেবেন। কবি কিন্তু সে-প্রশ্নগুলির ধার দিয়েও গেলেন না; পরিবর্তে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখলেন, যা ছিল আগাগোড়া অস্পষ্ট উক্তিতে পরিপূর্ণ। ফ্যাসিবাদের কিছুটা নিন্দা করলেন বটে কিন্তু মুসোলিনি যে দেশের জন্য অনেক কিছু করেছে সে-কথাও বললেন ও মুসোলিনিকে নেপোলিয়নের সঙ্গে আবার তুলনা করলেন। দুয়ামেল ভীষণ চটে উঠে বললেন যে মৌলিক ব্যাপারগুলিতে কবির এই রকমের দোমনা অস্পষ্ট ভাব তিনি মোটেই পছন্দ করতে পারছেন না, এবং রলাঁকে ভয় দেখালেন যে এ সব কথা তিনি প্রকাশ ক'রে দেবেন। রলাঁ তখন দৃঢ়ভাবে দুয়ামেলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যুদ্ধের সময় তিনি (দুয়ামেল) নিজেও কি ভাবে দোমনাভাব দেখিয়েছিলেন এবং মনস্থির করতে তাঁর অনেক সময় লেগেছিল।

ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ ভারতীয় কবির পক্ষে এই রকম দোদুল্যমান অবস্থা তো খুব অস্বাভাবিক নয়। ৩রা জুলাই রলাঁ মহলানবিশকে বললেন :

"ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর কাব্য ততটা নয়—লোকে তাঁর কবিতা খুব কমই জানে বা কিছুই জানে না—যতটা যুদ্ধের সময়ে তাঁর মহান্ ও উদার বাণী, সাম্রাজ্যবাদ, যান্ত্রিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ শক্তিগুলির ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাসুলভ নিন্দা এবং তাঁর পবিত্র ভূমিকা যা জনসাধারণ মেনে নিয়েছে। অতি নিকৃষ্টতর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও একটা পাশবিক ডিক্‌টেটরশিপের সঙ্গে আপস করার মতো অবস্থায় আসার ফলে এক নিমেষে তিনি সমস্ত কিছু হারাতে বসেছেন। যে হুয়ামেল আমার চাইতেও নরমপন্থী, তাঁর মতো একজন লেখকের বিদ্রোহ হচ্ছে বিপদের সঙ্কেত।" (*Inde, p. 153*)

৪ঠা জুলাই রবীন্দ্রনাথকে স্টেশনে বিদায় দিয়ে আসবার পর রলাঁ কবি সম্বন্ধে তাঁর দিনপঞ্জীতে যা লিখেছিলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :

"এই মহান্ জীবনের আংশিক বিফলতার ধারণাটা খুবই বেদনাদায়ক। তাঁর সত্তা চিরন্তন দু' ভাগে বিভক্ত—একটি হলো কবিময় যা তাঁর স্বভাবজাত, অপরটি হলো তাঁর সামাজিক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ভূমিকা (*Social prophetic role*), যে ভূমিকা গ্রহণ করতে বাস্তব অবস্থা তাঁকে বাধ্য করেছে। এই ভূমিকা সুমহান্, আবেশময়ী প্রেরণার মুহূর্তগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তার উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি নিজেকে অবস্থান করান না। কবি এবং অভিজাত তাঁকে দখল ক'রে বসে এবং তারা

জনসাধারণ ও তাঁর মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই জন্যই তাঁর মনে সব রকমের দোদুল্যমান অবস্থা, এই জন্যই তাঁর ভূমিকার অর্ধসমাপ্তি, পরিকল্পিত কর্ম মাঝপথে বর্জিত, অনুশোচনা, বিরাগ, আন্দোলিত হওয়ার উত্তেজনা, অনেক অর্থহীন উক্তি এবং অবিরাম খণ্ডিত হওয়া (*perpetual fragmentation*)। এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁর এমন কোন সঙ্গী নেই যিনি তাঁর অসম্পূর্ণতা পূরণ ক'রে দিতে পারেন, এবং যে মুহূর্তে কবি হাল ছেড়ে দেন তখন শক্ত হাতে সেই বন্ধু হাল ধরতে পারেন। এই সব ভারতীয়দের মধ্যে, এমনকি যাঁরা সব থেকে বুদ্ধিমান তাঁদের মধ্যেও, সংগঠন করার এবং লেগে-থাকার ক্ষমতা নেই।··· একটা সভা থেকে আর একটা সভায়, একটা শহর থেকে আর একটা শহরে, এই এত দৌড়োদৌড়ি আমার নিকট কী নিষ্ফলই না মনে হয়, কোনো কিছুরই মূলে যাওয়া হয় না, কোনো কিছুই সংগঠিত হয় না।···" (*Inde, p. 156*)

জুরিক, ভিয়েনা ইত্যাদি শহরে কবির সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট ইয়োরোপীয়দের আলাপ আলোচনা হলো। নানা স্থান থেকে অনেক বিখ্যাত লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বহু চিঠিও তিনি পেলেন। সকলেই ফ্যাসিবাদের ঘোরতর নিন্দা করলেন। অবশেষে ভিয়েনা থেকে রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে লিখলেন:

"ইতালিতে গিয়ে আমি যে পাপ করেছিলাম, সে-পাপের প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে।" (*Inde, p. 159*)

এই সময় ফ্যাসিবাদবিরোধী কতকগুলি বিবৃতিও রবীন্দ্রনাথ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের এইসব বিবৃতি ও চিঠিপত্র একত্র ক'রে রলাঁ সেগুলি তাঁর মাসিকপত্র 'ইয়োরোপ'-এ ছাপালেন।

ইয়োরোপের প্রগতিশীল পত্রিকাগুলিও তা সঙ্গে সঙ্গে ছাপাল। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের সুনাম আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

প্রকাশ্যে এইভাবে ফ্যাসিবাদের নিন্দা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর মুসোলিনি ও ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্রগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং বিচিত্র ভাষায় তাঁকে বিশ্বাসঘাতক, রেনেগেড, ইতালির নিন্দাবাদী ইত্যাদি বলে গালাগালির ঝড় শুরু করল। মুসোলিনির মুখপত্র *Popolo d' Italia* রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য ক'রে বলল: "এই অসৎ তারতুফটি[১] যাকে দুনিয়ার গর্দভগুলি মহত্ত্বের আসনে বসিয়েছে…"। আর একটি ফ্যাসিস্ট সংবাদপত্র বলল, যে ইতালির রুটি রবীন্দ্রনাথ খেয়েছিলেন, সেই ইতালির প্রতি তিনি রুটি-হারামী করেছেন।

ভিয়েনা থেকে রবীন্দ্রনাথ ২১শে জুলাই এন্‌ড্রুজকে একটা চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠির কপি এন্‌ড্রুজ আবার রলাঁকে পাঠিয়ে দেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ একস্থানে লিখেছিলেন:

"ইয়োরোপের রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, এবং ইতালিতে সব নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করবো এই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু কর্মফলের শৃঙ্খলে আমি বাঁধা পড়ে গেলাম।"

এই কথার উপর রলাঁ মন্তব্য করেছেন:

"কর্ম একটা সুবিধাজনক অজুহাত। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের

১ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ে'র *(Molier)* বিশ্ববিখ্যাত নাটক *Tartuffe*-এর মধ্যে ঐ নামেরই ভণ্ড চরিত্র।

মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মা কখনও নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যে যখন আমরা একটা ভুল করি, আমরা বলি না, 'এটা আমার কর্মফলের জন্য হয়েছে, আমরা বলি, '*Mea culpa*—অপরাধ আমারই'।"

রবীন্দ্রনাথের ইতালি ভ্রমণের জের আরও অনেকদিন চলেছিল। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখলেন :

"ভারতীয়দের মধ্যেও ফ্যাসিবাদের প্রতি যে প্রবণতা আছে তার বিরুদ্ধেও লড়াইয়ের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের যে সব সহচর আছেন, তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এক পুত্র *Modern Review* পত্রিকায় এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদ বিরোধী উক্তিগুলি সন্দেহজনক। তার জন্য রবীন্দ্রনাথ খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন।" (*Inde, p. 184*)

এই সময়ে ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে ফ্যাসিবাদের প্রসংশা-সূচক কিছু কিছু লেখা বার হতো, রলাঁ কয়েকটির প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রলাঁ দুঃখ ক'রে তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখলেন :

"হায়, ইতালীয় ফ্যাসিবাদের আওতা থেকে মুক্ত হতে না হতেই, রবীন্দ্রনাথের এই দলটি আবার গিয়ে হাঙ্গারীয়ান ও বলকান ফ্যাসিবাদের খপ্পরে পড়েছেন। খুবই পরিতাপের বিষয়। কতকগুলি নিকৃষ্ট জীবের হাতে তিনি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন—তারা তাঁকে একচেটিয়া ক'রে ফেলেছে ও তাঁকে ব্যবহার করছে। এক আশ্চর্য রকমের সরলতার দ্বারা চালিত হয়ে মহলানবিশ বলে বেড়াতে লাগলেন : 'এডমিরাল হর্থী (হাঙ্গারীর ফ্যাসিস্ট

ডিকটেটর) কী চমৎকার লোক!' শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের ধারকাছ দিয়েও এঁরা যান নি। উপরন্তু, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও এই যে তার দেশভ্রমণের বালসুলভ লোলুপতা, এর জন্য তিনি নিজেকে ফ্যাসিস্ট দালালদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁরা যেসব সভার আয়োজন করেছে তাতে প্রবেশাধিকার প্রচুর অর্থ-সাপেক্ষ, সুতরাং সেখানে ধনী ও উন্নাসিকদেরই মাত্র প্রবেশাধিকার। এইভাবে তিনি সর্বত্র একটা তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথ, যিনি সব থেকে নিঃস্বার্থ, এই ধারণার সৃষ্টি করেছেন যে তিনি একজন অর্থলোলুপ, দাম্ভিক ও অসার ব্যক্তি। এর চাইতে অনুতাপের বিষয় আর কি হতে পারে?" (*Inde, p. 184*)

এই সব ঘটনার কয়েক বৎসর পর যখন মুসোলিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছিল তখন রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে বিখ্যাত "আফ্রিকা" কবিতা লিখেছিলেন তা চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৩০-এর জুন মাসে ডঃ কালিদাস নাগের সঙ্গে রলাঁর আবার সাক্ষাৎ হলো। তাঁর নিকট রলাঁ রবীন্দ্রনাথের সব খবর পেলেন। কবির নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেরই মৃত্যু হয়েছে; এবং আরও নানা কারণে তাঁর মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। শান্তিনিকেতন বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। কবি এখনও বিচ্ছিন্ন হয়েই আছেন। দেশের যুবসমাজ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রলাঁ ছাড়া তাঁর আর কোনো বন্ধু নেই। উল্লেখযোগ্য বড় একটা কিছু তিনি লিখছেনও না। নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি এখন

ছবি আঁকায় মন দিয়েছেন। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি আবার ভ্রমণে বেরোবার উদ্যোগ করছেন, এটা তাঁর পক্ষে একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবি বলেন: "আমি কলকাতায় আর থাকতে পারছি না। এটা আমার কাছে একটা শ্মশানের মতো মনে হচ্ছে।" (*Inde, Pp. 276-77*)

১৯৩০ সালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ঘুরে আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ জেনেভায় এসেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার পথে। রলাঁ সেখানে এসেছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। কবির স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল, মনও বেশ প্রফুল্ল। কবির সঙ্গে ক্ষাণিকক্ষণ কথাবার্তা বলে রলাঁ বুঝলেন যে খুব একটা মস্ত বড় আশা নিয়েই তিনি সোভিয়েতে যাচ্ছেন।

রলাঁর সদ্য প্রকাশিত "রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে আলোচনা উঠল ; অনেক বিষয়ে কবি রলাঁর সঙ্গে এক মত নন। ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উদারতা ও সহিষ্ণুতা কল্যাণকর নয়। একেশ্বরবাদীরা বহু দেবদেবীর প্রতি সহানুভূতি দেখান নি। কালীপূজা ও ধর্মের নামে জীবহত্যাকে কবি তীব্রভাষায় নিন্দা করলেন। (রলাঁ: "এত উত্তেজনা ও ক্রোধের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে আমি কখনো শুনিনি।") তাঁর বাল্যকালের কলকাতায় এক কালীপূজার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময় রাগে ও ঘৃণায় তিনি কাঁপছিলেন।

"তিনি খুব আবেগের সঙ্গে বললেন যে এইসব রক্তাক্ত নীচ প্রবৃত্তিগুলি থেকেই আসে যুদ্ধ ও হত্যা করার স্পৃহা।"

এবিষয়ে তিনি কোনো আধ্যাত্মিক অথবা প্রতীকীবাদ-

ভিত্তিক ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। এই ভয়ঙ্করী দেবীকে যারা পূজা করে তাদের সততা ও মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কবির যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে তিনি এই দেবীর সম্পূর্ণ বিলোপ কামনা করেন এবং মানবমনের প্রধানশত্রু এই কুসংস্কারের আস্তাবল পরিষ্কার করার জন্য যদি ভারতে নাস্তিকতাবাদের প্রয়োজন হয় তো তাতেও তাঁর আপত্তি নেই।[১]

এই প্রসঙ্গে রলাঁ লিখেছেন :

"আমি শুধুমাত্র বাইবেল সম্বন্ধে আমার প্রতিক্রিয়া ও বিরূপ মনোভাবের কথা তাঁকে বললাম। তার প্রথম পৃষ্ঠাগুলি থেকেই দেখা যায় জিহোবা আবেলের রক্তাক্ত বলি গ্রহণ করছেন আর কেইনকে ভর্ৎসনা করছেন কেননা কেইন তাঁকে তার পরিশ্রমের প্রথম ফসল উপহার দিয়েছিল।...সব থেকে উচ্চ পর্যায়ের একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির উৎপত্তিও ভারতের কালীপূজার মতোই রক্তাক্ত।" *(Inde, p. 285)*

জেনেভায় কবি এবার অতিথি হয়েছেন মিস্ স্টোরী নাম্নী এক ইংরেজ মহিলার। আর তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর গার্ডিয়ান-এঞ্জেল এন্ড্রুজ। কবি যাতে রুশদেশে না যান সেই চক্রান্তই তাঁরা দিনরাত করতেন।

রাজনৈতিক ভীতি প্রদর্শন তো ছিলই, তাছাড়া তাঁরা তাঁকে

---

[১] এই আলোচনার যে সারমর্ম অরনসন ও কৃষ্ণ কৃপালনী সম্পাদিত "*Rolland and Tagore*"-এ দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ বিকৃত। এই বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন : "We do not know who took down the notes of these conversations at that time. They are obviously incomplete and seem to have been taken down rather hurriedly."

বোঝাতেন, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য, রুশিয়া রূঢ় কঠিন দেশ, সেখানে ভাল হোটেল নেই, তাঁকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে, ইত্যাদি।[১] রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের, এবং তিনি সেখানে অনেকবার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু পূর্বে যাওয়া ঘটে ওঠেনি। এবার তিনি সেখানে যেতে বদ্ধপরিকর।

রবীন্দ্রনাথ মস্কো যাচ্ছেন বলে তাঁর মন খুব খুশী। রলাঁ লিখেছেন:

"সেই দেশের নতুন সমাজ ব্যবস্থা দেখবার জন্য তিনি খুবই আগ্রহান্বিত—He is burning with curiosity about this country and the new order—তিনি আমাকে এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন।"

এবার রলাঁ লক্ষ্য করলেন যে রবীন্দ্রনাথ যেন কবিকে ভুলেই গিয়েছেন, তিনি তাঁর চিত্র নিয়ে একেবারে আত্মহারা। কবি তাঁকে বললেন: "আমার অন্যান্য কাজে এখন আমি

---

[১] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "রবীন্দ্রজীবনী"তে লিখেছেন (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩): "এবারও জেনেভা বাসকালে কবির ইংরেজ বন্ধুবান্ধবরা তাঁহার শরীর খারাপের অজুহাতে তাঁহাকে রুশ যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিলেন না।" সেই সময় একজন আমেরিকান সাংবাদিক লিখেছিলেন: "...the coteri of Englishmen who surrounded him while here (Geneva), was continuously against his trip (to Russia) for reasons of health." (*New York World*, Sept. 5, 1930)।

সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবলমাত্র একটি বিষয়ে আমি গর্বিত—তা হচ্ছে আমার চিত্র।”

এই প্রসঙ্গে রলাঁ বলছেন:

“এই চিত্রগুলি যে ভাবে ইয়োরোপে সমাদৃত হয়েছে তা তাঁকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। এই সমাদরের মধ্যে কতখানি উন্নাসিকতা ও মিথ্যা ভদ্রতা লুকিয়ে আছে তা কবি দেখতে পাচ্ছেন না। …জার্মান সরকার তাঁর ৩।৪ খানা চিত্র বার্লিন গ্যালারীর জন্য কিনেছে। তিনি খুবই খুশী কিন্তু তাঁর বলতে একটুকু বাধল না যে, ‘দুনিয়াতে এখন যা'ই ঘটুক না কেন আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এখন আমার সত্যিকারের আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। আমি স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করেছিলাম, গান ছাড়া আর কোনো চিন্তা আমার ছিল না। আমি যে ভাবে শুরু করেছিলাম, সেই ভাবেই শেষ করবো। পাখি গান করে, যেমন সূর্যোদয়ে, তেমনই সূর্যাস্তে।’ এই সব কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।” (*Inde, p. 286*)

যাই হোক, কোনো ‘হিতাকাঙ্ক্ষী’র কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, মনে নানা দ্বিধা ও সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও, কবি অবশেষে ছুটলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে যেখানকার মানুষ ‘সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, শক্তিশালীর শক্তি, ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে একটা’ নতুন জগৎ, একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তুলবার জন্য এক ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছে। বিশ্ব-মানবতার কবি, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কবি, বিশ্ব-শান্তির কবিই

যদি সেই মহাযজ্ঞে অংশ গ্রহণ না করবেন, তাহলে কে করবে ?

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য শ্রেণীবিভক্ত দেশগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে যা সব থেকে বেশী পীড়া দিত তা হচ্ছে ধনগত বৈষম্যের বড়াই ও ইতরতা। রাশিয়াতে তা দূরীভূত হয়েছে দেখে কবি খুশী হয়ে তাঁর "রাশিয়ার চিঠিতে" লিখলেন :

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার ভাল লেগেছে সে হচ্ছে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষাভুষা সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। এটা দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েছি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গিয়েছে। অনেক কথা বলবার আছে। বলবার চেষ্টা করবো।"

সেসব কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী কালের বহু কবিতা, নাটক, প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে ("কালের যাত্রা," "প্রশ্ন," "পঁচিশে বৈশাখ" ইত্যাদি) বলে গিয়েছেন।

পৃথিবীব্যাপী জনজাগরণ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে শিল্পী রমঁ্যা রলাঁর যে নবজন্ম হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথেরও অনেকটা তাই হয়েছিল—এক নতুন উদ্দীপনা, এক নতুন বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর শেষজীবনে তাঁকে পুনরায় আশাবাদী ক'রে তুলেছিল।

রলাঁ ও গান্ধী[১]

১৯১৯ সালে ভারতে যখন গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো তা তৎক্ষণাৎ রলাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল:

"আমার চিন্তাগগনের দিগন্তে গান্ধীর সুদূর তারকা দেখা দিল। এই তারকার আলোককেই আমি পরে সমস্ত ইয়োরোপে প্রতিফলিত করি।"

তিনি আর এক স্থানে বলেছিলেন:

"এই সময় আমার চোখে পড়িল ভারতের বুক আলোড়িত করিয়া শীর্ণ অথচ অনমনীয় এক মহাত্মা আত্মবলের ঝড় তুলিয়াছেন। ইয়োরোপের বুকে এই আলোড়ন তুলিবার জন্য আমি সংগ্রাম শুরু করিলাম। গান্ধীর আদর্শ তখন আমার মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৪১)

তখন ইয়োরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশই বিপ্লবের পথে চলতে শুরু করেছে, দুইটি স্বতন্ত্র পথ—হিংসা ও অহিংসা—উভয়ই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। রলাঁও এই দুইটি

---

১ এই অধ্যায়ের কিছু অংশ ত্রৈমাসিক পত্রিকা "দেশব্রতী"র ১৩৭২ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পথের কার্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। রলাঁ বারবুসকে লিখলেন :

"আমার মতে যে সকল শক্তি পৃথিবীর রূপান্তর আনে—বিবেক শক্তি তাহাদের অন্যতম। অতএব এই শক্তির প্রয়োগের কৌশল বিপ্লবকে শিখিতে হইবে।...সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের ন্যায্য দাবির সহিত আত্মার স্বাধীনতার সমান ন্যায্য দাবির সমন্বয় সাধনই আমাদের বর্তমান সমস্যা।"

সেই সময় গান্ধী সম্বন্ধে ইয়োরোপে বিশেষ কেউ কিছু জানতো না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল খুব কমই ছিল। ১৯২০ সালের আগস্টে রলাঁর সঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের সাক্ষাৎ হয়। রলাঁ তাঁর নিকট থেকে গান্ধী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানলেন। তার এক বৎসর পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন দেখা হলো, তাঁর কাছ থেকেও রলাঁ অনেক কিছু জানলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গান্ধী সম্বন্ধে। এর কিছুদিন পরেই মাদ্রাজের প্রকাশক গনেশান গান্ধীর *Young India*-র পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে ঐ বইয়ের ভূমিকা লেখার জন্য রলাঁকে অনুরোধ জানালেন।

রলাঁ বইয়ের ভূমিকা লিখতে অস্বীকার ক'রে জবাবে লিখলেন :

"বাস্তবিক পক্ষে এই মহৎ লোকটির প্রতি আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত নই। তিনি একজন আদর্শবাদী জাতীয়তাবাদী, (আমার মতো) একজন আন্তর্জাতিক নন।" (*Inde, p. 34*)

গান্ধীর *Young India* ভিত্তি ক'রে রলাঁ দুই মাস অসাধারণ

পরিশ্রম ক'রে "*Mahatma Gandhi*" লিখলেন।[১] ১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তা প্রথমে Europe পত্রিকায় প্রকাশিত হলো ও তার পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষাতেও তার অনুবাদ হলো। ১৯২৪ সালে গান্ধীর *Young India*ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হলো রলাঁর ভূমিকা নিয়ে। রলাঁই প্রথম যিনি গান্ধী জীবনীর মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইয়োরোপের জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে রলাঁর মতো মনীষী গান্ধী ও ভারতীয় স্বাধীনতার কথা প্রচারে উদ্যোগী না হলে বহির্জগতে গান্ধীর খ্যাতি এত দ্রুত প্রচার হতো না। ভারতীয় গণ-আন্দোলনকে ইয়োরোপের নিকট পরিচিত ও সহানুভূতিশীল ক'রে তোলার মূলে ছিলেন রলাঁ।

উৎসাহের আধিক্যে গান্ধী-জীবনীতে রলাঁ অনেক ক্ষেত্রে ভাবালুতার বশবর্তী হয়েছেন এবং গান্ধীকে আদর্শায়ীত এবং অনেক স্ববিরোধী কথা বলেছেন, তবে সেদিনও কতকগুলি মূল বিষয়ে রলাঁ তার স্বভাব-সুলভ বাস্তবতাবোধ ও বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি একেবারে বর্জন করেননি।

রলাঁ গান্ধীকে দেখলেন এমন একজন মহাপুরুষ হিসাবে যে-মহাপুরুষ তাঁর বিশ্বাসকে মানুষের বাস্তব সংগ্রামে রূপদান করেন—যে কাজ, রলাঁর মতে, টলস্টয়ও পারেন নি, তিনি

[১] রলাঁর ভগ্নী মাদলীন রলাঁ *Young India* ফরাসীতে অনুবাদ ক'রে ও নানাভাবে রলাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

নিজেও পারেন নি। রলাঁর মতে এই দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধী টলস্টয় থেকে মহত্তর। গান্ধীর মধ্যে সব কিছুই "স্বাভাবিক, সরল, বিনয়ী এবং পবিত্র; পক্ষান্তরে টলস্টয়ের মধ্যে গর্ব গর্বের বিরুদ্ধে, ক্রোধ ক্রোধের বিরুদ্ধেই লড়াই করে, সবই উগ্র, এমন কি তাঁর অহিংসাও।" গান্ধী হলেন "একজন কোমল টলস্টয়, তাঁর থেকে (বিশ্বজনীন অর্থে) আরও স্বভাব-জাত খ্রীষ্টান।" ("মহাত্মা গান্ধী" পৃঃ ৭৯) আর একস্থানে গান্ধীকে ইয়োরোপীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তুলনা ক'রে রলাঁ বলেছেন যে তিনি তাঁদের মতো কতকগুলি আইনকানুন পাশ করেননি, তিনি একটা নতুন মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের অতিশয়োক্তি ও বাস্তববিরোধী অবৈজ্ঞানিক উক্তি, যা সাধারণতঃ রলাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ, তিনি শুধু "মহাত্মা গান্ধী"তেই নয়, তাঁর "রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দ"-তেও করেছেন।

কিন্তু গান্ধী যত প্রশংসনীয়ই হন, যত বড় মহাপুরুষই হন, সেই প্রথম যুগেই গান্ধীর মধ্যে একটা বড় অভাব রলাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি গান্ধীর মধ্যে যেমন একজন বিশ্বাস-নির্ভর মানুষ (man of faith), একজন কর্মী-মানুষ (man of action) দেখেছিলেন, তেমনই তাঁর মধ্যে একজন বিদ্বান-মানুষকেও (man of letters) দেখতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব, বিজ্ঞানের বিরোধীতা, বর্তমান যুগের প্রগতির বিরোধীতা রলাঁর মনে যথেষ্ট আশঙ্কা জাগিয়েছিল। চরকাকে মানুষের প্রগতির প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করতে রলাঁর যুক্তিবাদী মন বিদ্রোহ

করেছিল। এই অসাধারণ মানুষটি যিনি তাঁর ইস্পাত-দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা হিমালয় পর্বতকে পর্যন্ত ঘোরাতে পারেন, তিনি কি সারা জীবন চরকাই ঘুরিয়ে যাবেন? গান্ধীর প্রতি রলাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও—যে শ্রদ্ধার ফলে গান্ধী-বিচারে তিনি অনেক সময় তাঁর স্বাভাবিক যুক্তিবাদও বর্জন করেছেন—রলাঁ গান্ধীর "মধ্যযুগীয় চিন্তার" বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ না ক'রে পারেন নি। গান্ধীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে রলাঁ বলেছিলেন যে এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাস "runs the risk of coming into clash with volcanic movement of the human spirit and of being shattered to pieces." (*Mahatma Gandhi, p. 30*) এই প্রসঙ্গে রলাঁ আরও বলেছিলেন যে বিশ্বাস যদি যুক্তির উপর স্থাপিত না হয় তাহলে এইরূপ অন্ধবিশ্বাস মানুষের মুক্তি আনার পরিবর্তে তার দাসত্বের বন্ধনকেই আরও দৃঢ় ক'রে তোলে।

চরকা, স্কুল কলেজ বয়কট, "এক বছরে স্বরাজ" ইত্যাদি নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মতবিরোধ ঘটেছিল, রলাঁ সে-বিতর্ক সম্বন্ধে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন এবং সে-সম্বন্ধে রলাঁর মত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। "গান্ধী হচ্ছেন একজন মধযুগীয় বিশ্বপ্রেমিক; মহাত্মাকে শ্রদ্ধা করেও, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত।" (ঐ, পৃঃ ৯৪)

রলাঁ আর একটা কথা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় জনজাগরণ ও গণআন্দোলনের স্রষ্টা গান্ধী নন, তা তাঁর নেতৃত্বের পূর্বেই ছিল।

"এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে গান্ধী যখন রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, তিনি তা করেছিলেন কেবলমাত্র 'হিংসার পথ থেকে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য।' বিদ্রোহ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাকে চালনা করার প্রয়োজন ছিল।" (ঐ, পৃঃ ১৭)

চৌরিচৌরার ঘটনার পর "ভগবানের নির্দেশে" যেরূপ অগণতান্ত্রিকভাবে ডিক্টেটরী কায়দায় বারদৌলিতে গণ-আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন গান্ধী, তা রলাঁ সমর্থন করতে পারেন নি। রলাঁ লিখেছিলেন :

"সমগ্র মানবতার আধ্যাত্মিক প্রগতির ইতিহাসে এমন মহানুভব ঘটনা কদাচিৎ দেখা যায়। এইরূপ কোনো কার্যের নৈতিক মূল্যের তুলনা হয় না। কিন্তু রাজনীতিক চাল হিসাবে এ কাজ হতাশ করে। সমস্ত সমবেত শক্তিকে একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক পদক্ষেপের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া, তাহার আবেগকে অধীরতার মধ্যে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত রাখিয়া অবশেষে হাত তুলিয়া শেষ নির্দেশ প্রদান করিবার মুহূর্তে অকস্মাৎ যখন সেই দুর্বার যন্ত্র গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাকে হাত নামাইয়া এক বৎসরের মধ্যে তিনবার থামিতে বলা, ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক। ইহাতে জনসাধারণের উদ্দীপনা ও আশা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে।" (*Mahatma Gandhi, p. 111*)

কিন্তু এ সময়ে রলাঁ নিজেও ভাববাদী, গান্ধীর অহিংসা-নীতি সম্বন্ধে তিনি অনেক বিভ্রান্তিকর আশা পোষণ করতেন।[১] ইয়োরোপীয় সাম্রাজবাদের হিংসানীতি ও মহাযুদ্ধের

[১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রলাঁর সঙ্গে ম্যাক্সিম গর্কীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। গর্কী টলস্টয়বাদ বা গান্ধীবাদ সম্বন্ধে কোনো

বীভৎসতা তাঁকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ক'রে তুলেছিল ; অন্যধারে বিপ্লবের নির্মমতাও তাঁর মনকে পীড়িত করছিল। তাই অতি আগ্রহের সঙ্গে ও অনেক আশা নিয়ে তিনি তাকিয়েছিলেন ভারতের দিকে, ভেবেছিলেন এখান থেকেই আসবে শুধু ভারতবাসীরই নয়, সমগ্র মানব জাতির মুক্তির নতুন আলো, অহিংসা ও প্রেমের পথ, নৈতিক শ্রেষ্ঠতার পথ। গান্ধী "ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে একটা নিরাপদ ও অধিকতর শান্তিপূর্ণ আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাবেন।" রলাঁ তাঁর গান্ধী-জীবনীতে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে আহ্বান করেছিলেন এই বলে :

"হে রবীন্দ্রনাথ! হে গান্ধী! ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গা দুটি মহানদী—আপনাদের যুগল আলিঙ্গনে আবেষ্টন করুন পূর্ব ও পশ্চিমকে। প্রথম জন, আপনি আলোকের সীমাহীন স্বপ্ন; দ্বিতীয় জন, আপনি আত্মোৎসর্গ ও শৌর্যের প্রতিমূর্তি। আপনারা উভয়ে ভগবানের আত্মজ! আজ হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিত এই পৃথিবী। ইহার বুকে আপনারা বিধাতার বীজ বিক্ষিপ্ত করুন।"

দ্বিভ্রান্তি পোষণ করতেন না এবং এ বিষয়ে তিনি প্রথম থেকেই রলাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। ফরাসী অধ্যাপক জাঁ-পেরুস (Jean Perus) "*Romain Rolland and Maxim Gorky*" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন : "Basically Gorky's one thought in the twenties was to rid Rolland of his Gandhi illusions. Gorky realised that a close resemblance existed between the philosophies of Gandhi and Tolstoy. But then Rolland himself acknowledged the only too apparent relation between his Gandhism and his admiration of Tolstoy, even while he denied that he was a Tolstoyan." (VOKS, No. 6, November-December, 1954, Moscow.)

চৌরিচৌরার ঘটনার পর গান্ধীর কারাদণ্ড হলে রলাঁ। তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ও ইয়োরোপে ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। ১৯২৪-এর জানুয়ারি মাসে গান্ধী মুক্তিলাভ করার পর রলাঁ। তাঁকে লিখেছিলেন যে যদি তাঁর গান্ধী-জীবনীতে তাঁকে বুঝতে ভুল হয়ে থাকে এবং সে-ভুল যদি গান্ধী সংশোধন ক'রে দেন, তা হলে তিনি বাধিত হবেন। গান্ধী তাঁর জবাবে লিখলেন :

"কোনো কোনো স্থানে ভুল থাকলেই বা কি এসে যায়? আশ্চর্য কথা এই যে আপনি এত কম ভুল করেছেন। এত দূরে এবং অন্য রকম পরিবেশে বাস করেও আপনি আমার বাণী সঠিক-ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।"

"মহাত্মা গান্ধী"র সাফল্যে আনন্দিত হয়ে রম্যাঁ রলাঁ। তাঁর ডায়েরীতে ১৯২৪-এর মার্চে লিখলেন :

"রুশ ভাষায়ও "গান্ধী" প্রকাশিত হলো। এখন প্রায় সব ভাষাতেই এর অনুবাদ হলো। ফ্রান্স ও জার্মানীতে দ্রুত একটার পর একটা সংস্করণ বেরিয়ে যাচ্ছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে, প্রটেষ্টান্টদের মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করছে। এ বই তাঁদের ঘুমন্ত খ্রীষ্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার মনে হয় মহাত্মা হচ্ছেন পুনরুজ্জীবিত খ্রীষ্ট।" (*Inde, p. 63*)

এই সময়টাতে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিলেন তাতে রলাঁ। গান্ধীকে "my Master" বলেই উল্লেখ করতেন, গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এত গভীর হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অন্যদেরও গান্ধীকে গুরু বলে গ্রহণ করতে রলাঁ। সাহায্য করেছিলেন।

"এই সময়ে একজন মহিলা আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, ইঁহার নাম মিস্ ম্যাডলিন স্লেড্, ইনি একজন ইংরেজ এডমিরালের কন্যা। না জানিয়া যে গুরুকে তিনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহার সন্ধান আমি তাঁহাকে বলিয়া দেই। ইনিই পরবর্তীকালে গান্ধীর মার্থা ও মেরী হন।"

গান্ধী আশ্রমে প্রবেশের পর ইনি মীরাবেন নাম গ্রহণ করেন।

গান্ধী জেল থেকে মুক্ত হবার পর রলাঁ তাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানালেন যে ইয়োরোপে আসা তাঁর একান্ত প্রয়োজন, কারণ সেখানকার যুবসমাজ আজ একটা নতুন পথ খুঁজছে, তারা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে, অনেকে তাঁকে বর্তমান কালের যীশু বলে মনে করে, তারা তাঁর নির্দেশের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে; অনেকে আবার তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা গুজবও রটাচ্ছে এই বলে যে তিনি একজন প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট, রুশিয়ার দালাল, তাঁর অহিংসা নীতি বিফল হয়েছে, তিনি শীঘ্রই রুশিয়া ভ্রমণে যাবেন, ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে রলাঁ সেই সময়ে ইয়োরোপে গান্ধীর একটা Divine Mission কল্পনা করেছিলেন।

এ পর্যন্ত গান্ধী কমিউনিজম বা সোভিয়েত সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মতামত ব্যক্ত করেন নি। এইবার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় (ডিসেম্বর ১৯২৪) এক প্রবন্ধে তিনি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নিজেকে ঘোষণা করলেন। পারীর বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'ল্য মাতাঁ' গান্ধীর এই উক্তি ফলাও ক'রে ছাপিয়ে লিখল যে, অনেক "মস্কো গোল্ড" গান্ধীকে পাঠানো হয়েছিল এবং ভারতে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তাঁকে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা

প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর ওপর রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে মন্তব্য করেছেন :

"চতুর্দিকে এইভাবে মিথ্যা প্রচার। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সত্য কথা জানবার উপায় নেই, আর যাঁরা জানেন তাঁদের পক্ষে প্রতিবাদ করার কোনো পন্থা নেই। কাদার মধ্যে আমাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।"

গান্ধী রলাঁর চিঠির জবাবে লিখলেন :

"জার্মানী কিম্বা রাশিয়া কোনো দেশ থেকেই আমি কোনো নিমন্ত্রণ পাই নি। এই দেশ দুটি ভ্রমণ করবার আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই। বিদেশে ভাগ্যান্বেষণে ঝাঁপিয়ে পড়বার আমার কোনো বাসনা নেই। আমার কাজকর্ম ও চিন্তা সম্বন্ধে সকলেই বেশ অবহিত আছেন, আমার লুকোবার কিছু নেই, আমি খোলাখুলি ভাবেই চলি। সকল প্রকার হিংসার পন্থা আমার চিন্তার বিরোধী। বলশেভিজম কি, সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার চিন্তাধারা আমি অধ্যয়ন করিনি এবং আমি জানি না রুশিয়ায় এর কোনো ভাল ফল ফলেছে কিনা। ভারতের পক্ষে এটা উপযুক্ত হবে কিনা সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু বলশেভিকরা যে-সব হিংসাত্মক কাজকর্ম করছে তার ফলে তাদের সমর্থন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি হিংসাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করি, এমন কি, সব থেকে বড় আদর্শের জন্যও। সুতরাং বলশেভিজম ও আমার মধ্যে কোথাও এতটুকু মিল নেই।" *(Inde, p. 63)*

সেদিনও একথা অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল যে যিনি বলছেন বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কিছু জানেন না, তিনি আবার একই নিঃশ্বাসে পরমুহূর্তে বলছেন, ও জিনিসটা

খারাপ! তাছাড়া, বলশেভিক মতবাদ বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে কি অগাধ বিশ্বাস! এই সব সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের সংবাদপত্রগুলিই কিন্তু ভারত বিদ্বেষ, এশিয়া বিদ্বেষ, পীতাতঙ্ক, নিগ্রো বিদ্বেষ সবই একসঙ্গে চালায়। বলশেভিকরা হিংসায় বিশ্বাসী, সেই জন্য গান্ধী সেখানে যেতে রাজী হননি, কিন্তু কয়েক বৎসর পর মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট ইতালিতে তো তাঁর যেতে আপত্তি হয় নি, সেখানে কি হিংসার তিনি কোনো গন্ধ পান নি?

ভারতে রবীন্দ্রনাথ নামেও জনৈক ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও সোভিয়েত সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসা শুনে ছিলেন, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, নিজের মনে নানা সংশয় থাকা সত্ত্বেও, তিনি সাগ্রহে নতুন পৃথিবীতে গিয়েছিলেন নিজের চোখে দেখবার জন্য, নিজের বুদ্ধি-বিচার দিয়ে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে হিংসা তিনি দেখতে পান নি, সেখানে দেখেছিলেন জাতিতে-জাতিতে, মানুষে-মানুষে মৈত্রী ও সহযোগিতা, দেখে-ছিলেন পূর্বেকার সমাজের অসংখ্য নির্যাতীত, অপমানিত, যারা সমাজের পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া হয়ে থাকতো, উপরের সবাই আলো পেত, আর তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ত, যারা উপোসে মরত, যারা জীবনযাত্রায় সর্বরকমের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো, সেই সব মানুষের কল্যাণের জন্য "কি বিপুল উদ্যম," "কী অসম্ভব সাহস।" এখানে "না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অসমাপ্ত থাকত।"

এর কিছুকাল পরে Youngmen's Christian Association-এর আন্তর্জাতিক কমিটি তাদের হেলসিংফর্স কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য গান্ধীকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রলাঁও তাঁকে সেখানে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেন। গান্ধী রলাঁকে জবাব দিলেন (২৯শে অক্টোবর, ১৯২৫):

"হেলসিংফর্সে আমি সানন্দে যেতাম যদি না আমি অনুভব করতাম যে এই নিমন্ত্রণটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। আর একটা কারণও ছিল: অন্তর থেকে একটা আহ্বানের অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু তা একেবারেই এল না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে যখন সে-আহ্বান আসবে, তখন আমি নিশ্চয়ই যাব।"

জড়বাদী ইয়োরোপের একজন লোকের পক্ষে এইরূপ গভীর ভারতীয় আধ্যাত্মবাদের কুহেলিকা ভেদ করা সম্ভবপর হয়েছিল কিনা তা কারো জানা নেই।

যে বিশ্ববিখ্যাত রম্যাঁ রলাঁ তাঁর সমস্ত আন্তরিতা, আত্মিক ঐশর্য ও নৈতিক শক্তি নিয়ে, এবং শুধু নিজেই নন, একটা গোটা ছুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেই রলাঁকে, সেই সংবেদনশীল ছুনিয়াকে গান্ধী কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছিলেন? এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

রলাঁর ৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯২৬ সালে একটি *Romain Rolland Birthday Book* প্রকাশিত হয়। জগতের বিশিষ্ট মননশীল ব্যক্তিদের নিকট সেই বইয়ে প্রকাশের জন্য

প্রবন্ধ আহ্বান করা হয়েছিল। অনেক ইতস্ততার পর গান্ধীজী এই বইয়ের সম্পাদককে লিখলেন :

"আপনারা যে সব প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন, আমি নিজেকে তাঁদের মতো যোগ্য বলে মনে করি না। এ আমার কৃত্রিম বিনয় নয়। এ হলো আমার অন্তরতম অনুভূতি।···আরও একটা কারণে আমি নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করি। আমি স্বীকার করছি যে I knew practically nothing about our good friend before he imposed upon himself the task of becoming my self-chosen advertiser. আপনারা শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন যে তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান তিনি আমার সম্বন্ধে যে-পুস্তিকাটি লিখেছেন তার ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই শুধু সীমাবদ্ধ। আমি যে সব জিনিস পড়তে চাই, কাজের চাপে তা পড়ার সময় পাই না। সুতরাং এখন পর্যন্ত তাঁর বিশিষ্ট বইগুলি আমি পড়ে উঠতে পারিনি।" (*Romain Rolland Birthday Book*, Zurich, 1926, p. 158)

রলাঁ গান্ধীকে "সরল," "বিনয়ী" ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করেছিলেন। গান্ধীর চিঠিখানা তাঁর সারল্য ও বিনয় কতখানি প্রকাশ করে সে-আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এই রুচিহীন অমার্জিত ও প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতাপূর্ণ চিঠিখানা সেদিন ইয়োরোপের অনেক গান্ধীভক্তদের চোখ খুলে দিয়েছিল। মোট কথা হলো গান্ধীবাদ ভক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—বুদ্ধি ও যুক্তি-বিচারের উপর নয়, তাই

মস্তিষ্ক-চর্চা গান্ধীবাদীদের প্রয়োজন হয় না। সেই জন্য গান্ধীর নিজেরও বিশেষ কিছু অধ্যয়ন করার প্রয়োজন হয় নি।

Romain Rolland Birthday Book-এ গান্ধীর এই বাণী পড়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই গান্ধীকে কিছু লিখেছিলেন। কারণ, আমরা দেখি গান্ধী রলাঁকে লিখছেন: "কবি আমাকে জানিয়েছেন যে আপনাকে আমার স্বেচ্ছাস্থিরিকৃত প্রচারক বলে বর্ণনা করায় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" জবাবে রলাঁ লিখলেন:

"আপনার কাজে নিজেকে লাগাতে পেরেছি বলে আমি আমার জীবনকে গৌরবান্বিত মনে করি। আপনার স্বেচ্ছাসেবকের এই ভূমিকা আমি বজায় রাখতেই চাই।...আপনার সান্নিধ্যে সকল প্রকার আত্মাভিমান বিলীন হয়ে যায়। কারণ আপনি উদাহরণ স্থাপন করেন; এবং যিনি কর্ম করেন, যেমন আপনি, তাঁর নিকট, যিনি লেখেন, যেমন আমি, মাথা নত করে।" (*Inde, p. 181*)

সেই সঙ্গে রলাঁ মীরাবেনকেও লিখলেন যে গান্ধী যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন—"ভগবানের আত্মার সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যখন আমার ঘটেছে, তখন আমার পক্ষে আত্মচিন্তা বা আত্মশ্লাঘা খুবই শোচনীয় হবে।" বিপ্লবের একটা নৈতিক ও আত্মিক পথের অন্বেষণে রলাঁ এই সময়টাতে গান্ধীবাদের প্রতি কতটা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তা তাঁর এই সব উক্তিগুলি থেকেই বোঝা যায়। তবে সেই সময়ে রলাঁ দুই দিকেই প্রখর দৃষ্টি রাখছিলেন, গান্ধীবাদে ও লেনিনবাদে। গান্ধীবাদে মোহভঙ্গ হতে রলাঁর বেশী বিলম্ব ঘটেনি।

এ সময়ে জহরলাল নেহেরু, তাঁর স্ত্রী, বোন শ্রীমতী পণ্ডিত

ও কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে ভিলন্যভে রলাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। রলাঁ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন যে গত বৎসর যখন নেহেরু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন তিনি ছিলেন খাঁটি গান্ধীবাদী অসহযোগী, কিন্তু এইবার

"আমার মনে হচ্ছে তিনি গান্ধীবাদ থেকে সরে গিয়েছেন, তিনি বলছেন যে জনসাধারণ এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীও গান্ধীবাদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে (যদিও তাদের মনে গান্ধীজী সম্বন্ধে সম্মান এখনও বজায় আছে), কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে (নেহেরুর কথায়) যে তাদের বাস্তব অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে গান্ধী কিছুই করছেন না; তিনি তাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে কিছু শুনতেই চান না এবং দুর্দশার প্রতিকার হিসাবে জীবনে পবিত্রতার কথা প্রচার করেন মাত্র। প্রধানতঃ ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই নেহেরুকে খুব বিচলিত করে তুলেছে এবং ইয়োরোপ থেকে ভারতবাসীর এই দুঃখদৈন্য তাঁর কাছে আরও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে···বিদ্রোহের মনোভাব চতুর্দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে; সর্বত্র ষ্ট্রাইক, কিন্তু সত্বর সেগুলিকে দমন করা সম্ভব হচ্ছে, কারণ শ্রমিকরা এখনও নিজেদের সংগঠিত করতে শেখে নি।" (*Inde, p. 191*)

এই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু গিয়েছিলেন জেনেভাতে International Committee for Intellectual Co-operation-এর একটা অধিবেশনে যোগ দিতে। এই সুযোগে জগদীশচন্দ্র রলাঁর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন এবং রলাঁ তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে ও নানা বিষয়ে তাঁর মতামত খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। জগদীশচন্দ্রের জীবনী-

শক্তি, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও তেজ রলাঁকে বিস্মিত করেছিল এবং আইনষ্টাইন তাঁর গৌরবময়-আবিষ্কারের কিছু পূর্বে ১৯১৫ সালে যখন প্রথমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে সেই আইনষ্টাইনের কথা রলাঁর বার বার মনে পড়েছিল। জগদীশচন্দ্র

"রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক বেশী সংবাদ রাখেন এবং চক্রান্তকারীদের জালে নিজেকে আবদ্ধ হতে দেন না। যেমন তিনি মুসোলিনির ইতালি পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। লীগ অব নেশনের কপটতা তিনি সহজেই ধরতে পেরেছেন এবং অন্যান্য যেসব বুদ্ধিমান এশিয়ানদের আমি জানি তাঁদের মতোই তিনি তাতে অবিশ্বাস করেন।" (*Inde, p.* 217)।

গান্ধী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অভিমত রলাঁ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"জগদীশচন্দ্র গান্ধীকে ভালভাবেই জানেন···কিন্তু তিনি মনে করেন গান্ধী অত্যধিক সঙ্কীর্ণমনা। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় পবিত্র আত্মিক ঐশ্বর্যের একান্ত অভাব। পক্ষান্তরে জগদীশচন্দ্র চান যুবশক্তিকে মনের সর্বপ্রকার সৃজনীশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে—যে সৃজনীশক্তি হলো বিশ্বপ্রকৃতিরই ঐশিক পরিকল্পনা। যুবশক্তির দ্বারা এই সৃজনীশক্তির অবিরাম বিকাশ না ঘটলে প্রকৃতি ঘুমিয়ে পড়ে ও নিষ্প্রাণ হয়ে যায়।" (*Inde, p. 226*)

১৯২৮ সালে রলাঁ গান্ধীর নিকট থেকে আর একটা ধাক্কা খেলেন। খুব উৎসাহিত হয়ে ও আনন্দ প্রকাশ ক'রে রলাঁ গান্ধীকে জানিয়েছিলেন যে ফ্রান্সেও অনেক গান্ধীপন্থী আছেন, যাঁরা সত্যই অহিংসপন্থী। বার্থালঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদাহরণ দিয়ে

বললেন যে এই সাধারণ কৃষাণ দুজন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে যোগ দিয়ে মানুষ মারতে অস্বীকার করেছিলেন; তার জন্য তাদের সামরিক আদালতের বিচারে শাস্তি হয়েছিল।

মীরাবেন গান্ধীর নির্দেশে রলাঁকে লিখলেন:

"বাপুজী মনে করেন না যে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মন সত্যকারের অহিংস হবার মত পবিত্র, কেননা যুদ্ধে যোগ দিতে তাদের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল তাদের পৈত্রিক মাটির প্রতি আকর্ষণ।"

গান্ধীবাদের প্রতি রলাঁর মোহ ইতিমধ্যেই কাটতে শুরু করেছে। তাঁর ডায়েরীতে তিনি লিখলেন:

"একটু হতাশই হলাম। এমন কি যাঁরা সব থেকে শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যেও মতবাদ প্রসূত কী সংকীর্ণতা! তাঁদের বিশ্ববাণীকে একটা ছোট গোষ্ঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান।" (*Inde, p. 230*)

রলাঁ মীরাবেনকে লিখলেন:

"বার্থালঁ ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে আপনারা যা লিখেছেন তা পড়ে আমি খুব দুঃখিত। এই সরল, অশিক্ষিত কৃষক দুটি, যাদের কোন গুরু নেই, যারা ধর্মের গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, যারা দুনিয়ার ঘটনাবলীর কোনো খবর রাখে না, যারা পুরাতন বাইবেলে বিশ্বাসী হয়েও একমাত্র স্বভাবজাত বিবেকের আলোকের দ্বারা চালিত হয়েছে—এই রকম দুটি সাধারণ মহৎ ব্যক্তি যদি অহিংসা মন্ত্রের গুরুর ধর্মীয় চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়, তাহলে গান্ধীর মহৎ আদর্শ কোনো দিন যে মানুষের সমাজে প্রবেশ করবে ও ফলপ্রসূ হবে তার কোনো আশা আছে বলে আমার মনে হয় না। গান্ধীর এই পবিত্র জেদ (intransigence) তাঁকে তাঁর আশ্রমের দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে রাখবে। গান্ধীকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি।

কিন্তু তাঁর মত লোকেরও ভুল হয়। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে গান্ধীর মনোভাব ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে সহযোগিতার সঙ্গে তাঁর অহিংসানীতির সামঞ্জস্য বিধান তাঁর পাশ্চাত্য অনুগামীদের মনে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।" (*Inde, p. 150*)

তার কয়েকদিন পর (১০ই ফেব্রুয়ারি) রলাঁ মীরাবেনের এক চিঠি থেকে জানলেন যে একটা খুব ক্লান্তিজনক ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে গান্ধী মীরাবেনের বাহুর মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েন; তিনি সব কিছু খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে কেবল ফলমূল খাচ্ছেন এবং বলছেন যে এই নতুন পথ্য প্রণালীর ফলে ও দৈবশক্তির বলে বেঁচেও যেতে পারেন; আর তাই যদি ঘটে তবে আধ্যাত্মিক শক্তির এটা হবে একটা মহৎ উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে রলাঁ তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন :

"যে-লোকটি মানব-ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্ঠি করতে শুরু করেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে অন্য রকমের পরিণতি আমি আশা করেছিলাম। আমি একটা কথা কখনই ভুলতে পারছি না যে পৃথিবীর সকল সাধু পুরুষদের (saints) জীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, সে-ব্যর্থতাকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত লৌকিক উপাখ্যানে আবৃত করে রাখা হয়েছে (উদাহরণ—সেন্ট ফ্রান্সিস), এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা মানুষের জন্য সব থেকে বেশী সফলতা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের জীবন হলো সব থেকে বিয়োগান্তক (যেমন ক্রুশবিদ্ধ যীশু।) গান্ধীর ভাগ্যে তা জুটবে না (যেমন জোটেনি বিবেকানন্দের)।" (*Inde, p. 231*)

কয়েকদিন পর রলাঁ আবার লিখলেন :

"এই বৃদ্ধ একগুঁয়ে লোকটি তাঁর ভুল ভ্রান্তি এতটুকু সংশোধন

করবেন না।·· বাস্তবিক পক্ষে এই লোকটি হচ্ছেন একটি অশ্বতর (mule), একটি সাধু অশ্বতর। তিনি নিজে কাউকে তাঁর মতে টানতে পারেন না, নিজের মতও বদলাবেন না। ইয়োরোপে আসবার জন্য এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য হঠাৎ তাঁর মস্তিকে একটা তীব্র ইচ্ছা প্রবেশ করেছে। এই সাক্ষাৎকারের পরীক্ষাকে আমি ভয়ের চক্ষে দেখছি—তার পক্ষেও বটে, আমার পক্ষেও বটে।" *(Inde, p. 231)*

গান্ধীর সঙ্গে রলাঁর চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে এবং আরও অনেকের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলে। তারপর ১৯৩১ সালে ইংলণ্ডে গোল-টেবিল বৈঠক শেষ করে দেশে ফিরবার পথে গান্ধী ভিলন্যুভে রলাঁর অতিথি হয়েছিলেন। এই রলাঁ-গান্ধী সংলাপ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো। তারও কয়েক বৎসর পর দীর্ঘকালের এই সব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে রলাঁ ১৯৩৪ সালে লিখেছিলেন :

"কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যেও রুশ বিপ্লবের আদর্শকে এবং সংগ্রামে নিমগ্ন থাকিয়াও নতুন জগৎ সৃষ্টির এই অতিমানবীয় প্রচেষ্টাকে আমি দ্বিতীয় আসন দেই নাই : ভারতের সহিত মস্কোর, আগুনের সহিত জলের মিলন সাধনের আপাত-বিপরীত কাজে আমি আত্মনিয়োগ করিলাম।···

"যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্বে জাঁ-ক্রিস্তফ গ্রন্থের উপসংহারে ফ্রান্স ও জার্মানীকে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়া লিখিয়াছিলাম, 'তাহারা যেন পাশ্চাত্যের দুইটি ডানা। একটি ভাঙ্গিয়া গেলে আরেকটিও অচল হইয়া পড়িবে।' ঠিক তেমনই ভাবে সোভিয়েত

ইউনিয়নের সংগ্রামশীল সাম্যবাদ এবং গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত অহিংস অসহযোগিতা (আইন অমান্য আন্দোলন) একই বিপ্লবের দুইটি বিরাট ডানা হিসাবেই আমি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। আমি চাহিয়াছিলাম ডানা দুইটি যেন পরস্পরের সহিত সহযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে পারে। এ প্রচেষ্টা আমার ব্যর্থ হইয়াছে এবং এ ব্যর্থতায় আমি বিস্মিত হই নাই।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৪২-৪৩)

রলাঁ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ

রলাঁ যখন ১৯২৮-২৯ সালে "রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দ" লেখেন তখন তাঁর ভাববাদ ও বিমূর্ত মানবতাবাদের শেষ পর্যায়। পুরাতন পৃথিবীর মুমূর্ষু চিন্তাধারাকে পুনরুজ্জীবীত করার এই তাঁর শেষ প্রচেষ্টা। রলাঁ শতবার্ষিকী বৎসরে অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় এই বই দু'খানার অনুবাদ প্রকাশ করছেন আধা-সরকারী প্রকাশন-সংস্থা সাহিত্য আকাদেমী। বাঙলায় ১৯৪৭-এর আগেই এই বই দুটোর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

রলাঁ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তার সেতুবন্ধনের কাজে নেমে ভারতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির যে অন্বেষণ করছিলেন, তা শুধু রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীতেই সীমাবদ্ধ রইল না, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দের মধ্যেও তা প্রসারিত করলেন।

রলাঁর চিন্তা ও শিল্প-কল্পনার দিগন্ত সর্বদাই সুদূরপ্রসারী। তাঁর *Tragedies of Faith* সিরিজে ছিল ৪ খানা নাটক, *Theatre of the Revolution* সিরিজে ১০ খানা নাটক, "জাঁ ক্রিসতফ" ১০ খণ্ডের উপন্যাস, "বিমুগ্ধ আত্মা" ৬ খণ্ডের, "বীর জীবনীমালা" ৩ খণ্ডের, "বেট্‌হোফেন" ৭ খণ্ডের, যুদ্ধের সময়কার ডায়েরী *Journal des Années de Guerre 1914-1918* ৭ খণ্ডের (১৯০০ পৃষ্ঠা), এবং ভারতের উপর দিনপঞ্জী বা ডায়েরী *Inde* ৬৪০ পৃষ্ঠার।

ভারত-মহিমার অন্বেষণে এসেও রলাঁ "গান্ধী"তেই থামলেন না, "রামকৃষ্ণ," "বিবেকানন্দ"ও লিখলেন। এক হিসাবে টলস্টয় থেকে গান্ধী, গান্ধী থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে পৌঁছনই স্বাভাবিক। এরাঁ সকলেই একটা মুমূর্ষু সভ্যতার শেষ মহান প্রতিনিধি। কিন্তু আবার র‍্যনেইসাঁসের শেক্সপীয়ার ও মিকেল আঞ্জেলো, ফরাসী বিপ্লবের বেট্‌হোফেন, আসন্ন রুশ বিপ্লবের দর্শন, এবং টলস্টয় থেকে গান্ধী হয়ে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ— পশ্চাৎ দিকে এত বড় একটা উল্লম্ফনও কম আশ্চর্যের কথা নয়!

যুদ্ধের পর রলাঁ যখন গান্ধীবাদ চর্চা করছিলেন, সেই সময়ে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের *The Face of Silence* পড়ে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ঠিক সেই সময় দিলীপকুমার রায় ও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের রলাঁর সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হতো এবং তাঁরা এই ব্যাপারে তাঁকে খুব উৎসাহ দিতেন। দিলীপ রায় অরবিন্দের প্রতিও রলাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন। তাঁদের কাছেই রলাঁ জেনেছিলেন যে

টলস্টয় শেষজীবনে বিবেকানন্দের বই পড়ে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। রলাঁর উৎসাহ এ সংবাদে আরও বেড়ে গেল।

রলাঁ "রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দে" কোনো বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন নি, কিংবা হিন্দু ধর্মকে গৌরবান্বিত করার জন্য বা তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য এ সব বই লেখেন নি। তিনি "গান্ধী"তে যেমন দেখেছিলেন আত্ম-প্রত্যয় ও কর্মের সমন্বয়, তেমনই বিবেকানন্দের মধ্যে দেখলেন আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে কর্ম-প্রেরণা, যার সন্ধান তিনি করেছিলেন তাঁর ইয়োরোপীয় "বীর জীবনীমালা" সিরিজের বইগুলির মধ্যে। বিবেকানন্দের মধ্যে রলাঁ শুধু ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ই দেখেননি, আরও দেখেছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তার সমন্বয়, "দুইটি জগতের শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ও অগণিত জনতার মধ্যে পবিত্র যোগসূত্র।" ইয়োরোপ ও এশিয়ার মানব প্রত্যয়ের ঐক্য সন্ধান করাই ছিল এই বই দু'খানার উদ্দেশ্য।

এই বই দু'খানার নামপত্রে লেখা : বর্তমান ভারতে অতীন্দ্রিয়বাদ ও কর্মের বিচার—(*A Study in Misticism and Action*)। "গান্ধী"তে রলাঁ দেখেছিলেন বিশ্বাস ও কর্মের ঐক্য ; "রামকৃষ্ণে" ও "বিবেকানন্দে" দেখলেন অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে মানুষের দুঃখবেদনা ও তার কর্মের সংযোগ। রলাঁ বিশুদ্ধ চিন্তা বা বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতাবাদের সমর্থক কোনো-কালেই ছিলেন না। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়"—এ কথা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, রলাঁরও। রলাঁ চেয়েছিলেন ধর্ম ও কর্মের সংযোগ এবং কর্ম বলতে বুঝেছিলেন সামাজিক

কর্ম। রলাঁ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে কি ভাবে দেখেছিলেন সে-সম্বন্ধে নিজেই একস্থানে বলেছেন :

"সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী ভারতের ফ্রান্সিস আসিসি, আমার প্রিয়তম মহর্ষি রামকৃষ্ণের দুঃসাহসী ঘোষণা আমার কানে বাজিতেছে : 'খালিপেটে ধর্ম হয় না।' মনের কাজও খালিপেটে হয় না। রামকৃষ্ণের শক্তিমান শিষ্য ভারতের সেণ্ট পল বিবেকানন্দের বিজয় পতাকায় লেখা ছিল এক বিষণ্ণ মহীয়সী বাণী—'দরিদ্র নারায়ণ।' তিনি বলিতেন, 'যতদিন আমার দেশে একটি কুকুর ক্ষুধিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে খাওয়ানোই হইবে আমার একমাত্র ধর্ম।'

"আমার ধর্মও তাই। ক্ষুধিত, নিপীড়িত, নির্যাতিতের সেবক আমি। আমার মনের ঐশ্বর্য তাহাদেরই জন্য, কিন্তু সর্বাগ্রে আমার কাছে তাহাদের দাবী : অন্নের সুবিচারের ; স্বাধীনতার। বুদ্ধিজীবীর বিশেষ সুযোগ সুবিধার অংশভাক্ আমি, সমাজকে সক্রিয় সাহায্য দানের ক্ষমতা আমার আছে। আর ক্ষমতা আছে বলিয়া কর্তব্যও আছে। তাই আমাকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে, সমাজ-প্রতারকদের মুখোশ খুলিয়া দিতে হইবে। যদি পারি তবে সমাজকে দিতে হইবে নির্ভুল পথের সন্ধান, সতর্ক করিয়া দিতে হইবে বিপদ সম্পর্কে। না, রাজনীতির দিক হইতে মুখ ফিরাইলে আমার চলিবে না ; চিন্তা ও কর্মের মহাসমন্বয়-কারী গান্ধীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও ঐ দু'এর মিলন ঘটাইতে প্রয়াসী হইব।" ("শিল্পীর নবজন্ম", ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২)

বিবেকানন্দের "দরিদ্র নারায়ণ," "নর-নারায়ণ," "বহুরূপে সম্মুখে তোমার," "তুমি বা আমি মুক্তি পাইলে তাহাতে

জগতের কি আসে যায়? আমাদের কাজ হইল সমস্ত জগৎকে আমাদের সহিত মুক্তিতে লইয়া যাওয়া," "মানব প্রকৃতি ভুলিও না, আমরাই মহানতম বিধাতা। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের দল অসীম সোঽহং সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র," "সর্বোপরি, শক্তিশালী হও, পৌরুষ লাভ করো" এই সব উক্তিগুলি রলাঁকে মুগ্ধ করেছিল। রলাঁ বিবেকানন্দের মধ্যে দেখেছিলেন ভারতের যুগ যুগের নিষ্ক্রিয়তার পর এক প্রচণ্ড কর্মোদ্যম। তিনি "বিবেকানন্দের" ভূমিকায় লিখেছিলেন :

"বেটোফেনের মতো বিবেকানন্দের কাছেও সকল সদ্‌গুণের মূল ছিল কর্ম। নিষ্ক্রিয়তাই প্রাচ্যের স্কন্ধে গুরুভার হইয়া চাপিয়া বসিয়াছিল। তাই নিষ্ক্রিয়তার প্রতি তাঁহার ছিল ঘৃণা।...তাঁহার অতি শক্তিশালী দেহ, তাঁহার অতি বিরাট মস্তিষ্ক আগে হইতেই তাহার বাত্যাব্যাকুলিত আত্মার রণক্ষেত্ররূপে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। সেখানে অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, স্বপ্ন ও কর্ম স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিল। তাঁহার জ্ঞান ও কর্মশক্তি এতই অধিক ছিল যে, তাঁহার নিজের স্বভাবের এক অংশকে বা সত্যের এক অংশকে বিসর্জন দিয়া কোনোরূপ সংগতি বিধান তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সে-সংগ্রামে তাঁহার সাহস, এমনকি তাঁহার জীবনও নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট জীবন ও সংগ্রামের অর্থ ছিল এক।

ইয়োরোপের "বীর জীবনীমালাতে"ও রলাঁ এই দুঃখভোগ ও আত্মোৎসর্গের আদর্শ দেখতে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ

নিজে একান্ত মোক্ষকামী হয়েও মানুষের স্বার্থে, দরিদ্রের স্বার্থে সেই মোক্ষকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—বিবেকানন্দের এই ট্রাজেডি রল াঁর নিকট খুবই মহান্। রলাঁ রামকৃষ্ণের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব দেখতে পান নি, কারণ রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে মহাপুরুষ হলেও ব্যবহারিকজীবনে বিবেকানন্দর মতো পূর্ণতা লাভ করেন নি। তবে রামকৃষ্ণ একেবারে নিরক্ষর হয়েও যে আধ্যাত্মিকতার সর্ব ধর্মের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, রল াঁর মতে, তারই জন্য তিনি মহৎ। গান্ধীর সঙ্গে তুলনা ক'রে রলাঁ লিখেছিলেন :

"কিন্তু গান্ধী ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই পার্থক্য চিরদিনের মতোই থাকিবে যে, বিবেকানন্দ ছিলেন বিরাট মনীষী—আর মনীষা গান্ধীর সামান্য মাত্রও ছিল না।" ("বিবেকানন্দ," পৃঃ ২৯৬)।

"রামকৃষ্ণ" ও "বিবেকানন্দ" লিখবার সময় (১৯২৭-২৮) রলাঁ তখনও ভাববাদী ও ব্যক্তিবাদী। তাই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কর্মপ্রেরণাই তাঁর বিবেককে টেনে নিয়ে গিয়েছে এমন সব কর্মের উৎসের সন্ধানে যেখানে সামাজিক কর্মের উৎস একেবারেই অবর্তমান। ব্যক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবেই রলাঁ লোকহিতৈষণার কর্মকে (philanthropy) সামাজিক কর্মের (social action) সঙ্গে এক ক'রে ফেলেছিলেন। এর পূর্বে রলাঁ নিজেই টলস্টয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন—টলস্টয়ের কর্ম কিছু লোকের দুঃখ মোচনে সাহায্য করেছিল বটে, কিন্তু নির্যাতিত মানুষের দুঃখমোচনের পথ কি তিনি দেখাতে পেরেছিলেন? এ প্রশ্ন তো রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও করা চলে।

হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম প্রথার অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং হিন্দু জনসাধারণের অগ্রগতির পক্ষে একটা প্রধান বাধা হচ্ছে এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী—এঁরা কেউই বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী ছিলেন না, বরং তাঁরা চেয়েছিলেন লোকহিতৈষী কর্মের দ্বারা এই পচা-গলা মৃতপ্রায় সমাজ-ব্যবস্থাকে কোনোমতে জীবিত রাখতে। হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ—প্রতিটি ধর্মসংস্থার লোকহিতৈষী কর্ম-প্রচেষ্টার রূপ একই—তাঁরা কেউই শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কামনা করেন না, এই সমাজের অসাম্যকে সহনশীল ক'রে রাখাই তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রকারের কর্ম কিছু মানুষের দুঃখ দৈন্য কতকটা লাঘব করতে পারলেও, তা সমগ্র নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষকে কোনো প্রকারেই সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই বিবেকানন্দের কর্ম-প্রচেষ্টাও, তা যত মহান্ ও বীরত্বপূর্ণই হোক না কেন, একটা কানা-গলির মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে নিঃশেষিত হয়েছিল। সামাজিক অসাম্য ও শোষণ ব্যবস্থা বজায় রেখে তার মধ্যে সামাজিক কর্মের স্থান কোথায়?

আধ্যাত্মবাদের কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই—সবই কাল্পনিক। সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদই আত্ম-প্রবঞ্চনা ও পলায়নী মনো-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত—আত্মকেন্দ্রিকতা ও দম্ভই তার পরিণতি। রলাঁ যে ভাবে মৃত-জগতের এই অতীন্দ্রিয়বাদের মায়াজালে জড়িয়ে পড়বার উপক্রম করেছিলেন, সেই বিপদ থেকে নতুন জগতের প্রতি তাঁর বুদ্ধি ও সততা এবং দায়িত্ববোধই

তাঁকে রক্ষা করেছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার ফলে রাজনৈতিক চিন্তা ও সমাজ-চেতনার পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে রলাঁ তাঁর ভুল সংশোধন ক'রে নিয়েছিলেন।

ভারতের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী, বিমূর্ত মানবতাবাদী এবং রাজনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী "কালচারিস্টরা" রলাঁর পরিচয় "গান্ধী," "রামকৃষ্ণ," বিবেকানন্দ" পর্যন্তই ধরে রাখতে চান, যেন এগুলিই রলাঁর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ অবদান, তার পর রলাঁর চিন্তার আর কোনো ক্রমবিকাশ ঘটে নি, যেন রলাঁর জীবন সেইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এঁরা রলাঁকে আধ্যাত্মবাদ ও গান্ধীবাদের প্রচারক হিসাবেই দেখাতে চান। সেই সঙ্গে "কালচারিস্টরা" রবীন্দ্রনাথকে জুড়ে দিতে পেরে আরও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।[১] এঁদের মতে রলাঁ ছিলেন

---

[১] এই জাতীয় একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক আর. কে. দাশগুপ্তের রলাঁ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে *Statesman*এ (২৯শে জানুয়ারি, ১৯৬৬)। প্রবন্ধটির শিরোনামা হলো: Rolland understood Gandhi as few did in West: He found in Mahatma what he missed in Tolstoy. অর্থাৎ টলস্টয় ও গান্ধীর মধ্যেই রলাঁ সীমাবদ্ধ; অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জন্য একটু স্থান ক'রে দেওয়া হয়েছে! স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে লেখক ১৯২৮ সাল অতিক্রম ক'রে আর অগ্রসর হতে চান নি। রলাঁ শতবার্ষিকী উপলক্ষে "জাতীয়" সংবাদপত্রগুলিতেও তাঁর সম্বন্ধে যেসব রচনা বেরিয়েছে সেগুলির দৌড়ও রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী পর্যন্তই। যেমন "যুগান্তরে"র ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত জনৈক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের "ভারতব্যাখ্যাতা রোমঁ্যা রলাঁ" লেখা

হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি, আধ্যাত্মবাদ, গান্ধীবাদের প্রচারক, রাজনীতির উর্ধ্বে, শ্রেণী সংগ্রামের উর্ধ্বে।

রলাঁর শিল্প, সাহিত্য ও মানবতাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দিলীপ রায়, কালিদাস নাগ প্রমুখ ভারতীয় "কালচারিষ্টরা" প্রথম মহাযুদ্ধের পর রলাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং সেবিষয়ে অনেক লেখালেখিও করতেন।[২] সেই সময়ে একটা সুবিধাও ছিল। তখন রলাঁ কোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, যদিও রাজনীতি সম্বন্ধে মোটেই উদাসীনও ছিলেন না—("যুদ্ধের উর্ধ্বে"ই তার প্রমাণ)। এইসব ভারতীয়রা কিন্তু সেদিন ছিলেন রাজনীতির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। নিরাপদ স্থানে থেকেই তাঁরা সব সময় "কালচার" ক'রে এসেছেন! (এই রকম একজন কালচারিষ্ট একদা বলেছিলেন—'আমি রাজনীতিকে ঘৃণা করি, কিন্তু যেখানেই কালচার আছে, সেখানেই আমি আছি!')

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে রলাঁ যখন ভাববাদ ও ব্যক্তিবাদ অতিক্রম ক'রে দুনিয়াব্যাপী জনসাধারণের শ্রেণী-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন, তখন থেকে এইসব উৎসাহী "কালচারিষ্টরা" একেবারে চুপ ক'রে যান। রলাঁর পরবর্তীকালের লেখাগুলি সম্বন্ধেও তাঁরা নীরবতা অবলম্বন

এবং "দৈনিক বসুমতী"তে (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬) প্রকাশিত জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "ভারতবর্ষ ও রম্যাঁ রলাঁ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

[২] রলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও আরও কয়েকজনকে কেন্দ্র ক'রে দিলীপ রায় যে "তীর্থঙ্কর" বইটি লিখেছেন তার নামটিই এত তাৎপর্য-পূর্ণ যে সেসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

করেন। এবং শেষের দিকে রলাঁ যে গান্ধী, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধীবাদ, আধ্যাত্মবাদ, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সমালোচক হয়েছিলেন সে-কথাটা তাঁদের ভাল ক'রে জানা সত্ত্বেও তাঁরা তা গোপন রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে এসেছেন এবং এখনও করছেন।" [১]

---

[১] ডঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ ব্যক্তিরা বহুদিন ধরে রলাঁ সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক থাকার পর রলাঁ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে "নিখিল-ভারত রম্যাঁ রলাঁ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি" (All India Romain Rolland Birth Centenary Committee) তৈরি করেছিলেন তার উদ্দেশ্যও দেখা গেল রলাঁকে গান্ধীবাদী আধ্যাত্মিকতাবাদী, বিমূর্ত মানবতাবাদী রূপে ভারতে প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রসঙ্গে গত ২৯শে জানুয়ারি কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সভায় নির্দিষ্ট সংখ্যক বক্তার বক্তৃতা অনুধাবন করলে সহজেই এই উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। এই সভায় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রলাঁকে "পরমাত্মার উপাসক ও বিশ্বে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিচিত্র কল্পনায় প্রবুদ্ধ এক মহান্ সাধক" বলে বক্তৃতা করেন। সভাপতি সুধীরঞ্জন দাস বলেন, "জাতিভেদ ও শ্রেণী-ভেদের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই রলাঁ নিজের দেশ হিসাবে সমগ্র বিশ্বকে এবং জাতি বলে মানবসমাজকে ভাবতে পারতেন।" ("যুগান্তর," ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৬)। খণ্ডিত রলাঁর প্রচারকারীরা এইভাবেই রলাঁ-বিকৃতি ক'রে চলেছেন। শিল্পীর সংগ্রামীরূপ এঁরা সযত্নে পরিহার ক'রে চলেন।

এই জাতীয় রলাঁ-সুহৃদদের নীরবতার সুযোগ নিয়ে জনৈক ফরাসী রোমান ক্যাথলিক অধ্যাপক পিয়ের ফালেঁ "শনিবারের চিঠি" (বৈশাখ, ১৩৬৪) পত্রিকায় রম্যাঁ রলাঁকে ফরাসী সাহিত্যের তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পী বলে উল্লেখ ক'রে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মতে "জাঁ ক্রিস্তফ যাঁরা পড়েন, তাঁরা হয় বিদেশী নয় অর্ধশিক্ষিত ফরাসী…"। এই প্রবন্ধটিকে প্রামাণিক মনে ক'রে কথাশিল্পী 'বনফুল'

"গান্ধী" জীবনীতে গান্ধীর কর্ম সম্বন্ধে রলাঁর যেরূপ সন্দেহ থেকে গিয়েছিল, "বিবেকানন্দে"ও তাই। সেখানে রলাঁ জিজ্ঞেস করেছেন :

> বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বানে "মৃত কি জাগিল? তাঁহার বাণীর ধ্বনিতে রোমাঞ্চিত ভারত কি তাহার এই অগ্রদূতের আশায় সাড়া দিল? তাঁহার কণ্ঠস্বর, উৎসাহ-উদ্দীপনা কি কার্যে পরিণত হইল? ঐ সময় মনে হইল, সমস্ত আগুন বুঝি কেবল ধোঁয়ায় পরিণত হইয়াছে।" ("বিবেকানন্দ," পৃঃ ১০৯)

তাঁর সভাপতির ভাষণে এর উল্লেখ ক'রে শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত "বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে" (১৯৫৯) এক বক্তৃতা করেন। রলাঁ-সুহৃদ বলে যাঁরা দাবি ক'রে থাকেন, তাঁরা ফালোঁর প্রবন্ধের উত্তর না দিয়ে যেমন তা মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি মেনে নিয়েছিলেন বনফুলের মতন কথাশিল্পীরা। একমাত্র "যুগান্তর" পত্রিকাতেই (২৭ মে, ১৯৫৯) এক সুদীর্ঘ প্রতিবাদ বেরিয়েছিল ফালোঁর সেই প্রবন্ধের। দ্বিতীয়তঃ, যে 'শয়তান মুসোলিনি'র (—রলাঁর ভাষায়) অনুচর হিসেবে তুচ্চি রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষকে অপযশের ভরাগাঙে ডোবাবার ষড়যন্ত্র করেছিল, —এবং রলাঁর হস্তক্ষেপে যে অপযশ থেকে রবীন্দ্রনাথ মুক্ত হয়েছিলেন, রলাঁ-রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বাধীন ভারতে সেই তুচ্চিকে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর শ্রেষ্ঠ সম্মান "দেশিকোত্তম" উপাধি অর্পণ ক'রে যখন দুই মনীষীর স্মৃতিকে অপমান করা হলো, সেদিনও একটি প্রতিবাদ "যুগান্তরে" প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবাদ দুটি পাঠিয়েছিলেন রলাঁর বইয়ের প্রকাশক বিমল মিত্র। রলাঁ-"সুহৃদবর্গ" এইভাবে নির্বাক থেকে কি রলাঁ-রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সম্মান রক্ষা করবেন? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফালোঁর এই অপকর্মের প্রতিবাদ করেছিলেন মাদাম রলাঁও "রলাঁ সুহৃদ সমিতি"র (*Association Des Amis de Romain Rolland, Paris*) পত্রিকায় (সংখ্যা ৪৭-৪৮, মে, ১৯৫৯)।

শুধু এই ব্যর্থতাই নয়, রলাঁ আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ এক শ্রেণীর ভারতীয়কে একটা বিকৃত, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও আধ্যাত্মিক দম্ভের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—"জন্মাবধিই এই বিপদ এর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।"

এই বইগুলি রচনার সময় বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের সঙ্গে রলাঁর বহু চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল। একটি চিঠিতে "প্রবুদ্ধ ভারতের" সম্পাদক স্বামী অশোকানন্দ ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও আধ্যাত্মিকতাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। রলাঁ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতের নৈতিক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান হলেও, কোনো প্রকার জাতীয় দম্ভ, তা যত আধ্যাত্মিকই হোক না কেন, সহ্য করতে পারতেন না। রলাঁ কোনো ব্যাপারেই অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না, সব কিছুই যুক্তিবিচার দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতেন। (অনেক ভারতীয়—যাঁরা না জানতেন কিছু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, না জানতেন ইয়োরোপ সম্বন্ধে—এমন বহু ভারতীয় রলাঁর আতিথ্যের সুযোগ গ্রহণ ক'রে তাঁর নিকট তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এক-একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন এবং রলাঁকে তা সহ্য করতে হতো।)

রলাঁ তাঁর জবাবে লিখলেন যে আধ্যাত্মিকতাবাদই হোক, আর যে কোনো-বাদই হোক, তা কোনোও একটি জাতির একচেটিয়া নয়; প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতিতে এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপেও আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল এবং বংশপরম্পরায় সেই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল

ইয়োরোপের অনেক মানুষ। এবিষয়ে "শ্রেষ্ঠ ইয়োয়োপ শ্রেষ্ঠ এশিয়ারই সহোদরা।" রলাঁ সেই চিঠিতে আরও লিখেছিলেন :

"মানব প্রকৃতির অভিন্ন ভিত্তিই হচ্ছে এই সাদৃশ্যের কারণ। ...আমি যখন কোনো ভারতীয় শাস্ত্র পাঠ করি তখনই আমার মনে এই চিন্তা আসে যে আমি একটা নতুন চিন্তা আবিষ্কার করছি না, যেন সেই চিন্তা আমার নিজের চিন্তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল, ছিল আদিমকাল থেকে আমার মনের মধ্যেই কোথাও। এই সব চিন্তাগুলিকে একটা বাছাই-করা জাতির মুষ্টিমেয় বাছাই-করা লোকের গুটিকতক চিন্তা-বীজ এরূপ ভাবলে শাশ্বত ঐশরিক শক্তিকেই হেয় করা হয়। শাশ্বত শক্তি সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই তার বীজ মুক্ত হস্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে হয়তো তার বীজ অঙ্কুরিত নাও হতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়, কোনো ক্ষেত্রে তা সুপ্ত থাকে, কিন্তু বীজ সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। এবং পর্যায়ক্রমে যা সুপ্ত থাকে তা জাগ্রত হয়ে ওঠে, যা জাগ্রত থাকে তা সুপ্ত হয়ে পড়ে। একটি লোক থেকে আর একটি লোকে, একটা জাতি থেকে আর একটা জাতিতে চিন্তা সব সময়ই গতিশীল। কোনো ব্যক্তি, কোনো জাতি তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। চিন্তা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শাশ্বত জীবনের অগ্নিশিখা—একই অগ্নিশিখা। আমাদের জীবনের কাজ তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখা।" (*Inde, p. 225*)

রলাঁ বহু লোকের নিকট থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের খবর পেতে লাগলেন—সামাজিক কর্মের দিকে বিশেষ কারো ঝোঁক নেই—নিজের মুক্তির জন্য ধর্মকর্ম নিয়েই সকলে ব্যস্ত। ১৯৩২-এর অক্টোবরে এই মিশনের স্বামী আশোকানন্দ আসেন রলাঁর

সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছিলেন। রলাঁ তাঁর ডায়েরীতে স্বামী আশোকানন্দ সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ করেছেন :

"লোকটি অত্যন্ত বদরাগী, অসহিষ্ণু, যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না··· টেবিলে কিল মেরে ও রূঢ় ভাষা ব্যবহার ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে চান।···তিনি এবং তাঁর স্বামীজী ভাইয়েরা, সর্বোপরি তিনি নিজে, সত্যের অধিকারী—এই দাম্ভিক নিশ্চয়তায় তিনি আত্মহারা হয়ে আছেন। আমাদের মফঃস্বলের পাদ্রীদের সঙ্গে লোকটির অনেক মিল আছে—স্থূল মস্তিষ্ক, ভোজনপুষ্ট নধরকান্তি, আত্মতৃপ্ত, সংকীর্ণ, কোনকিছু শিখতে অনিচ্ছুক, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মশগুল হয়ে আছেন। রামকৃষ্ণ বৃথাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যদি তাঁর উত্তর-পুরুষের শিষ্যরা এত উগ্র ও দাম্ভিক হয়!···এঁর মতে আত্মোপলব্ধিই সব, আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই ; এটাই যথেষ্ট সামাজিক কর্ম ; যাঁরা এই আত্মোপলব্ধি ছাড়া জগতে আর কোনো কর্মই করেন না, তাঁরা তাঁদের এই উদাহরণের দ্বারা জগতে সব থেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করেন।···এঁরাও যে অন্যদের মতো একই রকমের সুবিধাভোগী এবং নির্যাতিতদের শোষণকারী এটা আমি এত তীব্রভাবে ইতিপূর্বে কখনও অনুভব করিনি।···আমার আতিথেয়তার কর্তব্য থাকা সত্ত্বেও আমি দ্বিতীয়বার তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হলাম যখন তিনি আঘাত দেবার জন্য উগ্র ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন, যখন তিনি সেই মহৎ লোকটির পারিবারিক শোক ও দুঃখবেদনা ও তাঁর নিঃসঙ্গ ও যন্ত্রণাকাতর বার্ধক্যকে উপলক্ষ ক'রে অবজ্ঞাভরে—প্রায় হিংস্রভাবে—বললেন যে, 'তিনি দুঃখ-

ভোগ করতে পারেন না—দুঃখ কাকে বলে তা তিনি জানেন না।' (—এই ব্যক্তিটিই দুঃখভোগ করতে জানেন, এই সাধু-বাবাটি যিনি ধূমপায়ী ও অতিভোজনবিলাসী এবং আপাদমস্তক যার সিল্কে সজ্জিত ?) আমি তাঁকে বললাম : 'কারও দুঃখভোগ সম্বন্ধে অন্য লোকের বিচার করার অধিকার নেই।' …এই লোকটির পড়াশুনা, জ্ঞানগম্য নিতান্তই কম…কিন্তু এই লোকটির দাবি হচ্ছে—একমাত্র সত্যের, পূর্ণ সত্যের তিনিই একমাত্র অধিকারী। এবং আমি ভাবলাম যদি এরা জয়লাভ করে, তাহলে ইয়োরোপও পেছিয়ে থাকবে না—চক্ষুর বদলে চক্ষু! এদের মধ্যে রাজনৈতিক ঔদাসীন্যের ছদ্মবেশের অন্তরালে রয়েছে একটা সর্বগ্রাসী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ।" (*Inde, Pp. 404-6*)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অতীন্দ্রিয়বাদকে অতিক্রম ক'রে বর্তমান যুগের সত্যকে গ্রহণ করার পথে রলাঁ আরও কতটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন তা ১৯৩৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আহূত ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসভায় তিনি যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায় :

"আমাকে এই কথাটাই আপনাদের কাছে বলবার অনুমতি দিন যে এই মহাসভায় অংশগ্রহণকারীরা যেন অধিকতরভাবে সামাজিক কর্ম ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সমগ্র প্রচেষ্টা সংহত করতে পারেন। আমরা আজ জগতের ইতিহাসের এমন একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি, যখন যুগ যুগ ধরে যারা নিষ্পেষিত ও যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছিল, সেই সব মানুষ আজ সবদেশে সংঘবদ্ধ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান দাসত্ব, শোষণ ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্ত হবার জন্য। আসুন, সামাজিক সুবিচারের অভ্যুদয়কে আমরা সাহায্য

করি। আমাদের স্থান সর্বদাই তাদের পাশে যারা দুঃস্থ, যারা দুঃখভোগ করে, পরিশ্রম করে।"[১]

জঁা এর্‌বের (Jean Herbert) ছিলেন গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রমুখের একজন ফরাসী ভক্ত। তিনি ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষ ঘুরে এসে খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সব আশ্রমগুলির বিবরণ রলাঁকে দেন। অরবিন্দের তিনি বিশেষ গুণমুগ্ধ, তাঁর বাণী তিনি ইয়োরোপে প্রচার করতে চান। এর্‌বের রলাঁকে বললেন, অরবিন্দ সবসময়ই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন—কারও সঙ্গে দেখা করেন না—যা কিছু বলার তা তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ "মা"র[২] মারফৎ চিঠির দ্বারা জানান—বৎসরে তিনি মাত্র একবার দর্শন দেন; তিনি কেবল আলোক বিস্তার করছেন।

---

[১] ১৯৩৫ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষয়িত্রী ও মাতৃসংঘ, বিশ্বশান্তির জন্য ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে রোমের পোপ, বিশপ ও অন্যান্য ধর্মের প্রধানদের নিকট আবেদন করেছিল। এই আবেদনে সেই সঙ্ঘ রলাঁর সমর্থন চেয়েছিল। রলাঁ তার জবাবে লিখেছিলেন: "এই ব্যাপারে কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণে আমি বিশ্বাস করি যে কেবলমাত্র বিভিন্ন ধর্মের গুরুরাই নন, এমনকি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 'আধ্যাত্মিক নেতারাও' আপনাদের বিশেষ সাহায্য করবেন না, কারণ এইসব গুরু এ আধ্যাত্মিকতাবাদীরা হলেন সুবিধাভোগীর দল, তাঁরা সকলে চোখের উপর সোনার ঠুলি লাগিয়ে বসে আছেন, এবং কারা তাঁদের এই সুবিধাগুলি যোগাচ্ছে সেটা দেখবার জন্য তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই সেই ঠুলি খুলে নিতে রাজী হবেন। আমি একটি মাত্র 'পবিত্র সঙ্ঘের' কথাই জানি—তা হচ্ছে দুনিয়ার সব নির্যাতিত মানুষদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।" (*Inde*, *p. 455*)

[২] পল রিশার (Paul Richard) ছিলেন হিন্দু ও ইসলাম সভ্যতা বিষয়ে একজন বিদগ্ধ ফরাসী পণ্ডিত। তিনি ভারতে অনেক বৎসর

(তাঁর দিনপঞ্জীতে রলা মন্তব্য করেছেন : "যদিও সে-আলোকে কিছুই আলোকিত হয় না।")

এই প্রসঙ্গে রলা ডায়েরীতে লিখেছেন :

"ধরে নেওয়া যাক যে এই আলোকে একদল 'এলিতে'র আত্মিক শক্তি বিকাশ লাভ করবে। তা মেনে নিলেও আমি তাঁর এই আভিজাত্যকে ক্ষমা করতে পারি না। তাঁর আশ্রম কেবলমাত্র কয়েকজন ধনী ব্যক্তিদের জন্যই। নির্যাতন ও শোষণ বন্ধ করার জন্যে আজকের এই কঠিন সংগ্রামের দিনে, সিল্ক দিয়ে ঘেরাও করা একটা আশ্রমে শুধু নিজের মুক্তির সন্ধানকে আমি অত্যন্ত স্বার্থপর কাজ বলে মনে করি। এইসব খেলা সুবিধাভোগীদের পক্ষেই সম্ভব। নব্য ভারতের চিন্তানায়কদের সম্বন্ধে একটি পরবর্তী অধ্যায় লেখার ইচ্ছা আমার আছে।"

জাঁ-এর্বের এই সময়ে সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে একটা বৈদান্তিক পত্রিকা প্রকাশ করবার উদ্যোগ করলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য রলাঁর পূর্বেকার একটি লেখা এর্বের তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্য রলাঁর অনুমতি চাইলেন, কিন্তু রলাঁ যেখানে শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করার জন্যে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে নিন্দা করেছিলেন—সেই স্থানটি এর্বের বাদ

কাটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ—সকলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাঁদের আশ্রমগুলিতেও তিনি অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে যখন তিনি সস্ত্রীক পণ্ডিচেরীতে যান, শ্রীমতী রিশার স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে সেইখানেই থেকে গেলেন ও আশ্রমের 'মা' হলেন। ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তনের পর রিশার প্রায়ই রলাঁর সঙ্গে দেখা করতেন।

দিতে চাইলেন। রলাঁ এর্‌বেরকে জবাব দিলেন (২৯শে জুন, ১৯৩৭):

"আমার বিকাশ ঠিক বেদান্তসম্মত হয় নি, যদিও বেদান্তের প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখি। আমার এই শ্রদ্ধা জঁা-ক্রিসতফের মতো, যে ভণ্ডামি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাব আরও বদ্ধমূল হয়েছে। যে রোমের পোপরা বলেছেন যে তাঁদের ক্ষমতা দৃঢ় করার জন্য তাঁরা শয়তানের সঙ্গেও যেতে রাজী আছেন (—এ তাঁদের নিজেদেরই কথা), তাঁদের অপরাধ চাপা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করবেন না। বরং আমি অন্যান্য ধর্মের চার্চগুলিকেও নিন্দা ক'রে তার সঙ্গে যোগ ক'রে দিতে চাই: 'ইতিহাসে অতীতে ও বর্তমানে, প্রায় সব সময়ই দেখা যায় যে, সব ধর্মের চার্চের পোপ ও গুরুরা রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন এমং এখনও দিয়ে যাচ্ছেন, কেবলমাত্র এঁদের নিজেদের সুবিধাগুলি বজায় থাকলেই হলো। শোষণকারীদের যে ক্ষমতা পশুবলের দ্বারা স্থাপিত হয় তাকেই এঁরা চিরকাল সমর্থন ক'রে এসেছেন।'"
Inde, Pp. 495-6)

১৯২৭-২৮ সালের "রামকৃষ্ণ"-"বিবেকানন্দের" রলাঁর সঙ্গে, দশ বৎসর পরের সমাজ-বিপ্লবের আপসহীন যোদ্ধা রলাঁর সঙ্গে আকাশ পাতাল প্রভেদ। রলাঁর এই পরিবর্তন মৌলিক ও গুণগত।

রলাঁ-গান্ধী সংলাপ

প্রথম মহাযুদ্ধের মত এমন একটা বর্বর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কি কারণে ও কি যুক্তিতে গান্ধী অহিংসবাদী হয়েও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিলেন সে-সম্বন্ধে গান্ধীর নিকট রলাঁ উত্তর চেয়েছিলেন। তাতে গান্ধী লিখেছিলেন যে, "আমার মনে হয় খ্রীষ্টানরাই ছিলেন প্রথম যাঁরা শয়তানকে কেবলমাত্র একটা কুনীতি বলেই মনে করেন নি, অশুভের মূর্তিমান প্রতীক বলেও মনে করতেন। এটা বিনা কারণে নয়। সম্ভবত আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই সে আধিপত্য বিস্তার করছে, আমাদের কাজ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা—এইটাই হলো মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য।"

তারপর গান্ধী আরও বললেন যে রলাঁর প্রশ্নের জবাব তিনি তাঁর "আত্মজীবনীতেই" দিয়েছেন—তা পড়ে রলাঁ যেন তাঁর মতামত তাঁকে জানান।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, গান্ধী যুদ্ধ ও শান্তি, হিংসা ও অহিংসা এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত বাস্তব ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে রাজী নন, সেগুলিকে একটা বিমূর্ততার আবরণ দিয়ে এড়িয়ে যাওয়াই হলো তাঁর চিরন্তন কৌশল। গান্ধী জেনে শুনে, অনেক বিচার-

বিবেচনা করেই যুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করেছিলেন ; তিনি সচেতনভাবেই, নিজের শ্রেণী-স্বার্থের জন্যই যে সেই কাজ করেছিলেন সে-বিষয়ে তিনি ভালভাবেই জানতেন। এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বণিক ব্যবসায়ীশ্রেণী দ্রুত ও বহুল পরিমাণে মুনাফা লাভ করছিল। গান্ধী আজীবন ছিলেন এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। গান্ধীর আর যে কোনো দোষই থাকুক, বিচারবিবেচনা না ক'রে, খেয়ালের বশে তিনি কোনো কাজ করতেন না। রলাঁর প্রশ্নের কোনো সদুত্তরই তিনি খুঁজে বার করতে পারলেন না ; অবশেষে নিজের দোষ ঢাকবার জন্য একটা কাল্পনিক শয়তানের স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করলেন না।

কিন্তু রলাঁর অনন্য-সাধারণ সততা ও বুদ্ধির নিকট কোনো প্রকারের চিন্তার চাতুরী কার্যকরী হয় না। গান্ধীর অনুরোধ মত রলাঁ তাঁকে ১৯২৮-এর মার্চে যে চিঠি লিখেছিলেন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, এবং যেহেতু ফরাসী ভাষায় লিখিত এই দলিলটি ভারতে আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নি, সে-চিঠিখানা দীর্ঘ হলেও, এখানে তার প্রায় সবটার অনুবাদ দেওয়া হলো :

"একথা বলার জন্য আমাকে মাপ করবেন যে আপনার চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করতে ও সেগুলিকে সমর্থন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি তা পারিনি। যাঁরা দেশের জন্য ও জাতির জন্য যুদ্ধকে পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করেন ও যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মনে করেন, তাঁরা যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আমি তাঁদের বুঝতে পারি।

আমার এই রকম অনেক বন্ধু আছেন যাঁরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন ও চার বৎসর ধরে লড়েছিলেন...আমি তাঁদেরও বুঝতে পারি যাঁরা যুদ্ধকে বিভীষিকা বলেই জানেন এবং জাতির প্রতিও যাঁদের তেমন আকর্ষণ নেই, কিন্তু যুদ্ধে না গিয়ে যাঁদের নিস্তার নেই এবং পালাতে গেলে বন্দুকের গুলিতে মরতে হবে, কিম্বা যাঁদের কোন নৈতিক শক্তি ও বিশ্বাস নেই...কিন্তু আপনার মত একজন ব্যক্তি, যাঁর এত প্রচণ্ড সাহস ও বিশ্বাসের জোর, যিনি সর্বক্ষেত্রে মানুষ হত্যা ও জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে আপসহীন ভাবে নিন্দা করেন, তিনিই তাতে অংশ গ্রহণ করলেন, এবং তাতে বাধা না দিয়ে তিনি সে-পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন,—কেউই আমাকে এটা বোঝাতে পারবে না, আমি এটা কখনই মেনে নিতে পারি না। অধিকন্তু, আপনি যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছেন (আমাকে মাপ করবেন—) তা আমার নিকট মোটেই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। আমি একথাও সাহস ক'রে বলবো যে আপনার কাজটাকে ভাল বুঝতে পারতাম যদি তা যুক্তির দ্বারা নয়, বিনা যুক্তিতে হতো। আপনার এই যুক্তিগুলি বিচার করা যাক। আপনি তিনটি বিকল্প যুক্তি দিয়েছেন—প্রথম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে (স্বেচ্ছায়ই হোক আর পশুবলকে স্বীকার করেই হোক,) তার রক্ষণাবেক্ষণে উপকৃত হয়ে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আপনার জাতির জন্য স্বায়ত্তশাসনের আশা ক'রে, তাদের সংকটের সময় তাদের সাহায্য করতে, অর্থাৎ তাদের নৃশংস অত্যাচারে যোগ দিতে নিজেকে বাধ্য বলে মনে করলেন ; এবং আপনি বিশ্বাস করলেন যে এই প্রকার বীরত্বপূর্ণভাবে স্বীকৃত পাপের মধ্য থেকে কল্যাণের উদ্ভব হবে—অর্থাৎ ইংরেজরা আপনার জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে, তারপর নিজের ঘরের

মালিক হয়ে আপনারা আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ন্যায় ও মানবতার নীতি, অহিংসা প্রতিষ্ঠা করবেন।—বাস্তবের দিক থেকে, ঘটনাবলী আপনাকে তার উত্তর দিয়েছে। যদি কেবলমাত্র ফলাফল দ্বারাই বিচার করা যায়, তাহলে আপনার এই অত্যন্ত রাজভক্তিমূলক সুবিধাবাদ কোন কাজেই লাগে নি। পক্ষান্তরে যদি বা তা সত্যই সফল হতো ও আপনারা স্বাধীনতা পেতেন—হে বন্ধু, আপনার প্রতি একটা কঠিন বাক্য ব্যবহার করতে আমাকে অনুমতি দিন—সাম্রাজ্যবাদের জন্য কোটি কোটি মানুষের রক্তাক্ত আত্মাহুতির ফলে, এই মূল্যে, যদি আপনাদের স্বাধীনতা লাভ হতো, তা হলে তা হতো ভগবানের নিকট বিষম অপরাধ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের ললাট সেই রক্তের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকত; আর সেই রক্ত ভগবানের সমক্ষে ভারতকে অভিশাপ দিত। দ্বিতীয়, আপনার মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে যুদ্ধ বয়কট করা সম্ভব নয়—এরূপ মত পোষণ করার অধিকার আপনার আছে। তৃতীয়, ব্যক্তিগত অসহযোগ ও কারাগারের যন্ত্রণাভোগ। এই তৃতীয় পন্থা আপনি মুখে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, ঐ সময়ে কর্মে পরিণত করেন নি। কেন? আমি তা বুঝতে পারছি না। এই তিনটি পন্থার মধ্যে এই তৃতীয়টিই আমার মনে হয় নৈতিকভাবে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা, যদিও সেটাও যথেষ্ট নয়। এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে সরাসরি-ভাবে, অনর্থক বাক্যব্যয় না ক'রে, বাস্তব ফলাফল হিসাব না ক'রে, বিবেকানুমোদিত একমাত্র পন্থা বলেই তা আপনি প্রয়োগ করেছেন যার জন্য কেবলমাত্র ভগবানের নিকটই আপনি দায়ী। কিন্তু 'সব থেকে ভয়ানক অপরাধের' (the greatest crime) সময় যখন কোটি কোটি মানুষ তাদের কু-নেতাদের দ্বারা পরি-

চালিত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করছিল, আপনি তখন এ পন্থা প্রয়োগ করেন নি কেন? আমি বুঝতে পারছি না। আমার কাছে এটা খুবই বেদনাদায়ক যে, সাম্রাজ্যবাদী নেতারা তাদের ঘৃণিত স্বার্থের যুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার হতভাগ্য জনগণকে—যাদের তারা শোষণ ক'রে আসছে ও যাদের তারা কামানের খোরাক হিসাবে ইয়োরোপীয় মাংসপিণ্ডের চাইতেও কম মূল্যবান দ্রব্যের মত ব্যবহার করে—সৈন্যবাহিনীর তালিকাভুক্ত করার কাজে আপনার সাহায্যের উদাহরণকে অনুমোদন স্বরূপ (sanction) তাদের পৈশাচিক কাণ্ডে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। আমি খোলাখুলিই আপনাকে এইসব কথা লিখলাম এবং আমি আশা করি যে এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা শীঘ্রই পরিষ্কার করতে পারবো।" (*Inde, Pp 233-35*)

রলাঁর ৭ই মার্চের এই চিঠিখানা পাবার পর গান্ধী খুবই দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রলাঁ যে ভাবে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উপর জোর দিতে শুরু করেছেন, তাতে তাঁকে হেয়ালী কথা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। অহিংসা ও গান্ধী-বাদের এত বড় একজন শিষ্য হাত ছাড়া হয়ে যাবেন! গান্ধী মীরাবেনকে দিয়ে লেখালেন (১৬ই মার্চ) :

"বাপু চান যে আপনাকে আমি পরিষ্কার ক'রে বলি যে ইয়োরোপের কনফারেন্সে যাওয়ার প্রশ্নটা তাঁর নিকট গৌণ। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্তরের আহ্বানই তাঁকে সব থেকে বেশী প্রভাবান্বিত করেছে। এই আহ্বান সব সময়ই ছিল কিন্তু আপনাদের সাম্প্রতিক চিঠি বিনিময়ের ফলে এটা আদেশমূলক হয়ে পড়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বাপু আপনার

সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটাতে চান, যাতে ক'রে আপনারা পরস্পরের বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন, পরস্পরের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, এবং যাতে আপনাদের সামান্যতম ভুল বোঝাবুঝিগুলিও চিরদিনের মতো দূরীভূত হতে পারে।"

রলাঁ এই কথাগুলি একেবারেই পছন্দ করলেন না। প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে গান্ধীর যা বক্তব্য তা তিনি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলুন। এটা তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন কেন? রলাঁ ৩১ শে মার্চ মীরাকে লিখলেন:

"আমার ভয় হয় যে গান্ধী যদি আমার জন্যই ইয়োরোপে আসেন, হয়তো আমার দ্বারা তিনি নিরাশ হতে পারেন। আমি তা সর্বান্তঃকরণে পরিহার করতে চাই।"

দু'জনার মধ্যে আরও কয়েকখানা চিঠির বিনিময় হলো। রলাঁ ১৬ই এপ্রিল আবার গান্ধীকে লিখলেন:

"আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে যুবসমাজকে একটা ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। আমার সন্দেহ নেই যে এমন একটা ধ্বংসের যুগ, এমন একটা জগৎব্যাপী মহাযুদ্ধের যুগ আসছে, যার তুলনায় অতীতের যুদ্ধগুলি ছেলেখেলা বলে গণ্য হবে। আমাদের দু'জনকে হয়তো এই দানবের সম্মুখীন হতে হবে না কিন্তু তাদের জন্য আমরা কি নৈতিক বর্ম রেখে যাচ্ছি? আরও দেখতে হবে আমাদের কথা যেন দ্ব্যর্থমূলক না হয়। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের সব থেকে বড় উদাহরণ স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট—যাঁর প্রশংসনীয় ধর্মগ্রন্থে দ্ব্যর্থমূলক এত অত্যধিক অংশ আছে যেগুলিকে তাঁর অসৎ অনুচরেরা অপকর্মে ব্যবহার করেছে।...ভবিষ্যৎ সংকটের দিনে গান্ধী-উক্তিতে যেন দ্ব্যর্থবাচক কিছু না থাকে। আর একটি

কথা—যে নির্দেশ তিনি দেবেন, তার সমস্ত ফলাফল বিচার ক'রেই যেন তা তিনি দেন। আরও তাঁকে দেখতে হবে, কোন্ মানুষের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে তিনি সে-নির্দেশ দিচ্ছেন।...নৌকার হাল ধরে আপনি বসে আছেন, এই ঝড়ের মধ্যে নৌকার গতি নির্ণয় ক'রে নাবিকের আদেশ করার ক্ষমতা আপনারই আছে। সেই আদেশ দিন। যে বন্দর আমরা পরিত্যাগ ক'রে এসেছি (—১৯১৪ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা একমত হতে পারছি না, আর তা আমাদের আলোচনাকে জটিল ক'রে তুলছে—) তার কথা ভেবে কাজ কি? যে বন্দরে আমাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল—তারই কথা আমরা ভাবি...ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠতর অংশ আজ যে সমস্ত উদ্বেগ ও প্রশ্নের দ্বারা জর্জরিত সেগুলি আমি জানি। আমি তাদেরই কথা আপনার নিকট পৌছে দিলাম।" (*Inde, Pp. 239-40*)

ইতিমধ্যেই গান্ধীবাদ অতিক্রম ক'রে সমাজ-চিন্তায় রল্যাঁ যে কতখানি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন তা তাঁর গান্ধীবাদী এদ্‌মঁ প্রিভাকে (Edmond Privat) লিখিত (৫ই মে, ১৯৩১) চিঠি থেকেই বোঝা যায়:

"গান্ধীর বিশ্বাস ও কর্মনীতি পবিত্র।...কিন্তু তা শাশ্বত (absolute) নয়। (তিনি নিজেই তাঁর "সীমাবদ্ধ" অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছেন।) ভারতও শাশ্বত নয়। আমাদের সত্যান্বেষীদের কাছে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে ইয়োরোপে এই ভারতীয় অভিজ্ঞতার বাস্তব মূল্য নির্ণয় করা।...

"এমনকি গান্ধীকেও আজ তাঁর দিগন্ত প্রসারিত করতে হবে। শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি যা লিখেছেন, তা

বোঝা যায় সে বর্তমানে সমস্ত দুনিয়া যে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন। একটা মান্ধাতা আমলের শ্রেণী-অসাম্যের সম্বন্ধের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সে-সম্বন্ধের মধ্যে পরস্পরের সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। গান্ধীর ধনতন্ত্র আহ্‌মেদাবাদের কয়েকটি সাধু ও ধার্মিক সুতাকলের মালিকদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে যাঁরা তাঁর কথা দ্বারা প্রভাবান্বিত (—তিনি তাই মনে করেন) এবং যাঁরা শ্রমিকদের সংস্পর্শে থাকেন। পুঁজির অশারীরিক ও হৃদয়হীন নতুন শক্তি—বেনামী কোম্পানী, আন্তর্জাতিক ট্রাস্ট, যে অন্ধ দানবগুলি "যন্ত্র" থেকেও ভয়ঙ্কর (যে "যন্ত্র"কে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী নিষ্ফলভাবে অনেক বানই নিক্ষেপ করেছেন এবং যে পুঁজি হচ্ছে অদৃশ্য যন্ত্র)—এসব সম্বন্ধে গান্ধীর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। এই পুঁজিই আজ সমস্ত রাষ্ট্র ও সমস্ত জনমত শাসন করে। গুটিকতক নিষ্ঠুর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অথবা কয়েক শত রাজ-রাজড়া (মন্ত্রী, প্রতিনিধি) যাদের রক্ত মাংসের শরীর আছে—আর সেই সব শক্তি যাদের শরীর নেই, যা নামহীন, যার মধ্যে মানবীয় কোন কিছুই নেই—এই উভয়ের বিরুদ্ধে কি রণকৌশল একই হবে?"

অবশেষে গান্ধী এলেন লণ্ডনের গোল-টেবিলের বৈঠকে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। গান্ধী কি ভাবে জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়ে ও জনমত উপেক্ষা ক'রে গোল-টেবিলের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, এবং সে-বৈঠক ভারতীয়দের পক্ষে কি অপমানজনক ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, সে-ইতিহাসে প্রবেশ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই বৈঠকে গান্ধীর যোগদান সম্বন্ধে

এবং সেই বৈঠকে গান্ধীর ভূমিকা সম্বন্ধে রলাঁরও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যাই হোক, ঠিক হলো, বৈঠকের শেষে ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে ভিলন্যভে রলাঁ-গান্ধী সাক্ষাৎ হবে।

এই সাক্ষাতের জন্য গান্ধী যাতে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারেন সেই জন্য রলাঁ তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি জানিয়ে গান্ধীকে মীরার মারফৎ চিঠি লিখলেন এবং তাঁকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উপর চিন্তা ক'রে আসতে অনুরোধ করলেন :— যুদ্ধ ও শান্তি, হিংসা ও অহিংসা, সাম্রাজ্যবাদ, বিপ্লব, পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, শ্রমিকরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ও ফ্যাসীবাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি।

গান্ধী ভিলন্যভে এসে পৌঁছলেন ৬ই ডিসেম্বর, এবং ১১ তারিখ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পিয়ারীলাল, মহাদেব দেশাই, মীরাবেন, দেবদাস গান্ধী। সেই দিনই রলাঁ-গান্ধী সংলাপ শুরু হলো। গান্ধীর সেদিন মৌন দিবস। রলাঁ দেড় ঘণ্টা ধরে তাঁর সমস্ত বক্তব্য বললেন ও প্রধান প্রধান প্রশ্নগুলি তুলে ধরলেন। গান্ধী সমস্ত সময়টা চুপ ক'রে নোট নিচ্ছিলেন, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে মাথা উঁচু ক'রে রলাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন, যেমন—রুশিয়ার "বস্তুবাদ" সমর্থন ক'রে ও মানব জাতির হিতার্থে রুশিয়ার জনসাধারণের আত্মত্যাগের প্রশংসা ক'রে রলাঁ যখন বললেন যে, "আমি সেখানে এমন একটা আদর্শবাদ দেখতে পাচ্ছি যা পশ্চিমের মেকী আদর্শবাদ থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ,

পশ্চিমের মৌখিক আদর্শবাদীরা কোনো ত্যাগ স্বীকার করেন না।”

ইয়োরোপের পরিস্থিতি সম্বন্ধে রলাঁ বললেন যে যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের কর্ণধাররা শান্তি স্থাপনে অক্ষম হলেন। জন-সাধারণের মন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। আজ সব কিছুরই প্রভু ও চালক পশ্চিমের ধনশক্তি এবং সে-শক্তি মানুষের জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে। তার একটা অংশ আজ ফ্যাসীবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

“দুনিয়া জুড়ে যে শোষণ চলেছে তারই বিরুদ্ধে আজ জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে সত্যাগ্রহ প্রকৃতপক্ষে সফল হতে পারে তা হচ্ছে অস্ত্র উৎপাদনের ও অন্যান্য কারখানাগুলির শ্রমিকদের সত্যাগ্রহ, প্রলেটারিয়েটদের সত্যাগ্রহ। অর্থশক্তির অক্টোপাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য এরাই হলো প্রধান নায়ক। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির ফলে এই একটি উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক উভয় কর্মেরই সামঞ্জস্য ঘটেছে। দানবীয় ধনতন্ত্রের পথে এরাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের সামনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে কৌশলের প্রশ্ন। তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার : শ্রমজীবী জনসাধারণকে বিজয়ী হতেই হবে। কিন্তু কোন্ উপায়ের দ্বারা—হিংসা, না, অহিংসা দ্বারা সে-লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে? সেই উপায়ই হবে শ্রেষ্ঠ উপায় যা ন্যায়পরায়ণ সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারবে। অহিংসা কি তা পারবে?

“যাই হোক, বর্তমানে অবস্থাটা এইরূপ। ১৯১৭ সালে ভীষণ আত্ম-ত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা রুশদেশে একটা নতুন জগৎ স্থাপন করেছে, তারা অস্ত্রবলে বলীয়ান। এই অস্ত্রবল আত্মরক্ষার জন্য

তাদের নিতান্ত প্রয়োজন। পুরাতন জগতই তাদের এতে বাধ্য করেছে। পাঁচটি প্রধান শক্তির দ্বারা যুগপৎ সশস্ত্র আক্রমণ ও তারপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য দুনিয়ার অর্থ-শক্তির অবিরাম উস্কানি ও জঘন্য ষড়যন্ত্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে : আমরা পাশ্চাত্যের লোকেরা কি করবো? হাত গুটিয়ে শান্ত ভাবে বসে থাকবো? সোভিয়েতকেও তাই করতে বলবো? আমরা বিশ্বাস করি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ার মানুষেরও আশাভরসা নষ্ট হয়ে যাবে। রুশ-বিরোধী আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকদের কি ধর্মঘট করতে হবে? কিন্তু তা হবে বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ—একথাটা ভাল ক'রে বুঝতে হবে। আপনি আমাকে বলবেন যে ইউরোপে শ্রমিকশ্রেণী আত্মবিসর্জন করুক। কিন্তু কার জন্য আত্মবিসর্জন? দয়াময় ভগবানে বিশ্বাস থাকলেই সেকথা উঠতে পারে। কিন্তু তারা ভগবানে বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে একটি আদর্শে, সামাজিক ন্যায়ে। এটা কম কথা নয়। যদি কেউ এই আদর্শকে বস্তুবাদের নাম ক'রে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে, আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি; এই আদর্শই হচ্ছে, মানুষের সব থেকে বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের উৎস। কিন্তু এই আত্মোৎসর্গ অহিংসা বোঝায় না। আমি আবার বলি যে সমস্যাটা বাস্তব কর্মের (practical action) সমস্যা রূপে দেখা দিচ্ছে—এমন কর্ম যা সব থেকে কার্যকরী ও সব থেকে তৎপর হবে। এতে যদি কোন বাধা আসে, তা মানুষের দ্বারাই হোক, অন্য যেভাবেই হোক, তাকে নির্মম ভাবে অপসারণ করতে হবে।"

লেনিনের উদাহরণ দিয়ে রলাঁ বললেন :

"লেনিনের কোনো প্রকার ব্যক্তিগত হিংসা ছিল না। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। যে উপায়কে তিনি কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন সেই উপায়ই তিনি মানবের কল্যাণের জন্য অবলম্বন করেছেন। এই উপায়ের বিরুদ্ধে অহিংসাকে একটা আদর্শ হিসাবে উপস্থিত করলেই চলবে না, উভয় উপায়ের ফলাফলের মূল্য দিয়েই তাদের বিচার করতে হবে।" *(Inde, p. 308.)*

সর্বশেষে রলাঁ গান্ধীর ইতালি ভ্রমণের প্রশ্ন তুললেন। রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে চক্রান্ত ক'রে মুসোলিনি তার কাজ হাসিল করার চেষ্টা করেছিল, গান্ধীকেও মুসোলিনি সেইভাবে তার কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে; মুসোলিনি কিভাবে খোলাখুলি হিংসানীতি অনুসরণ ক'রে, বিশেষ ক'রে আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করেছে, রোমের পোপও সেই চক্রান্তে জড়িত, ইত্যাদি সবই বোঝালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন এই অবস্থায় গান্ধী সেখানে কি ক'রে যেতে চাইছেন?

এই দিনকার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রলাঁর বক্তব্য যখন শেষ হয়ে গিয়েছে গান্ধীর ইংরেজ শিষ্যা মিস্ মুরিয়েল লেস্টার কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কারও বিনা অনুমতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এদের একজনের নাম হলো ইভানস্ (Evans), ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। রলাঁ লিখেছেন:

"বিনা অনুমতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করার জন্য আমি হয়তো মিস

লেস্টারকে ক্ষমা করতাম যদি তিনি আরও লোকজন সঙ্গে না নিয়ে আসতেন এবং আমি পূর্বে জানতে পারলে ইভানস্‌কে তো ঘরে ঢুকতেই দিতাম না।—গান্ধী তাকে "বন্ধু" বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (এটা কি সরলতা, না উদাসীনতা? আমার মনে হয় দ্বিতীয়টাই, কারণ গান্ধীর মধ্যে কিছুই সরল নয়।) কিন্তু এটা খুব বিপজ্জনক। বলা হয় এই সব পুলিশদের কাজ হলো গান্ধীকে রক্ষা করা। কিন্তু আসলে তারা তাঁর উপর নজর রাখছে। তাঁর গতিবিধি, কাজকর্ম ও তাঁর সাক্ষাৎকারীদের তারা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এই বিরাটকায় ইভানস্‌ তা লুকোবারও চেষ্টা করল না। সে এদমঁ প্রিভাকে জিজ্ঞেস করল গান্ধী ও আমি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। এবং ভাল মানুষ প্রিভা তাকে সারল্যের সঙ্গে বললেন যে আমি গান্ধীকে রুশিয়া সম্বন্ধে বোঝাচ্ছি। (এর ফল হলো এই যে, একটি সুইস্‌ সংবাদপত্র সকলকে সাবধান ক'রে দিল এই ব'লে যে "বলশেভিক রমঁ্যা রলাঁ" গান্ধীকে সোভিয়েত সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করছেন এবং বীর সুইসদের মস্কোর কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেবার জন্য তাঁরা চক্রান্ত করছেন।)" (*Inde, p. 216*)

রলাঁ এই সহজ কথাটা বুঝতে পারেন নি যে বিশ্বপ্রেমিক গান্ধীর নিকট সাম্রাজ্যবাদীরাও এবং তাদের পুলিশরাও তাঁর "বন্ধু"। এবং তিনি ও তিনি যে পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি সেই শ্রেণীর কেউই কোনোদিনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলেন না— সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করাই ছিল তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পরদিন গান্ধী তাঁর নিজ হেঁয়ালিময় অধ্যাত্মিক ভাষায়

তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। আরও লক্ষ্যণীয় যে একটা আত্মম্ভরিতা ও একটা *holier than thou* মনোভাব (যা সব ভারতীয় আধ্যাত্মবাদীদেরই একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য) তাঁর প্রতিটি কথায় প্রকাশ পায়। প্রথমেই গান্ধী তাঁর ইতালি ভ্রমণ সম্বন্ধে উত্তর দিলেন .

"আমি ইতালির লোকদের শান্তির বাণীই শোনাতে চাই—তারা তা গ্রহণ করুক আর নাই করুক···আমি পোপের সঙ্গেও দেখা করতে চাই, তাহলে আমি ভারতীয় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে পারব। আমি যেমন মুসলমান প্রধানদের সঙ্গে দেখা করেছি, তেমনই খৃষ্টান প্রধানদের সঙ্গেও দেখা করবো।"

গান্ধী আরও বললেন যে বম্বেতে ইতালির কনসাল তাঁকে বলেছেন যে এটা রাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ নয়, বস্তুতঃ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন রোমের *Instituto di Cultura*, আর *Banque d' Italia* র ডাইরেক্টরের স্ত্রী তাঁর অতিথি হতে তাঁকে অনুরোধ করেছেন।

"যদি মুসোলিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে আমি কোনো ইতস্তত না ক'রে তাঁর সঙ্গেও দেখা করব। কিন্তু গোপনে নয়। আমি কারো সঙ্গেই গোপনে দেখা করি না।"
(Inde, p. 318)

পূর্বে গান্ধী সোভিয়েত যেতে অস্বীকার করেছিলেন, কারণ সোভিয়েত তাঁর মতে হিংসার দেশ। কিন্তু ফ্যাসীবাদী ইতালি ও মুসোলিনি সম্বন্ধে হিংসা-অহিংসা প্রশ্ন তিনি তুললেন না; যে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড হিংসার দ্বারা, পশু বলের দ্বারা

ভারতকে পদানত ক'রে রাখছিল, সেই ইংলণ্ডে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপস আলোচনা চালাতে তাঁর আপত্তি হয়নি।

রলাঁ যে সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্ন গান্ধীর নিকট উত্থাপন করেছিলেন তিনি তার প্রায় সবগুলিই এড়িয়ে গেলেন, কোনোটারই সরাসরি উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন :

"আমি আমার জীবনে যে কোনো সিদ্ধান্তেই আসি না কেন, আমি কোনো দিনই তা ইতিহাস থেকে নেই নি। আমার চরিত্র গঠনে ইতিহাসের ভূমিকা খুবই নগণ্য। আমার পন্থা হচ্ছে পরীক্ষামূলক (empirical) এবং আমার সিদ্ধান্তগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। আমি বুঝতে পারছি এর ফলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। আমি অনেক পাগলকে জানি যারা অনেক বিষয়ে বিশ্বাসী ও তাদের সেই ভুলগুলি সংশোধন করা অসম্ভব, কারণ সেগুলি তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। একজন পাগলের অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান খুবই কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অভিজ্ঞতার উপর আমার বিশ্বাস কমে যেতে পারে না। পুরাতন কালের ঋষিদের অভিজ্ঞতাগুলি ছিল তাঁদের স্বজ্ঞাত অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। তাঁরা যে ভুল করেন নি তা সকলেই জানেন এবং ইতিহাসই তা প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। আমিও গর্ব ক'রে বলতে পারি যে আমার বিশ্বাসগুলিও ভিত্তিহীন নয়।...

"গতকাল আপনার কথাগুলি শুনে আমি ভাবছিলাম : বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কি করতে হবে ? এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি না যে আমার মত এই রকম (অর্থাৎ, যেমন আপনি

পারেন)। যে-সব সমস্যাগুলি আপনি আমার সামনে তুলে ধরেছেন সেগুলি সাংঘাতিক সমস্যা। অহিংসা নীতি ভারতবর্ষে সফল হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে কিন্তু এটা সম্ভব যে ইউরোপে তা সফল হবে না। কিন্তু সে-কারণে আমি চিন্তিত নই। আমি বিশ্বাস করি যে অহিংসা নীতি সকল দেশেই প্রযোজ্য। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার এই বাণী আমি ইউরোপকে দিতে পারি না। অনেক সৎ ইংরেজকে আমি বলেছি, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মনে বিশ্বাস না জাগবে, আপনারা এক পা'ও নড়বেন না, কিন্তু আমি, দুনিয়ার সব লোক বিশ্বাস না করলেও, আমি তাতে বিশ্বাস করব'।..."

রুশ দেশ সম্বন্ধে গান্ধী বললেন যে, "রুশ দেশে যা ঘটছে তা একটা ধাঁধা। আমি রাশিয়া সম্বন্ধে খুব কমই জানি।" "জানি না" বলে তার পরেই এক মামুলী দীর্ঘ বক্তৃতা—রাশিয়া পশুশক্তির দেশ, হিংসার দেশ, সেখানে সমাজতন্ত্র সফল হবে না। তিনি রলাঁকে একথাও বললেন যে তিনি লর্ড লোদিয়ানের মত তাঁর অনেক ইংরেজ ও আমেরিকান বন্ধুদের কাছে শুনেছেন যে রাশিয়া সন্ত্রাসবাদের আওতায় বাস করে ইত্যাদি, ইত্যাদি। সর্বশেষে গান্ধী ইয়োরোপের সমস্যাগুলি খুব সংক্ষেপে সমাধান ক'রে দিলেন:

"আমি ইয়োরোপে যা দেখেছি তাতে আমার মনে হয় যে অহিংসা ছাড়া তার আর গতি নেই। সুখের বিষয় যে তার জন্য একটা বড় সংগঠনের প্রয়োজন হয় না। এমন একজন মহাপুরুষের এখানে প্রয়োজন যিনি অহিংসায় বিশ্বাসী হবেন, তার জীবন্ত আদর্শ হবেন। যতদিন পর্যন্ত সেই মহাপুরুষের

আবির্ভাব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, আশা পোষণ ক'রে যেতে হবে ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। (*Inde, Pp. 322-23*)

"রলাঁ: একজন নেতার অধীনে যদি অহিংসাকে একটা বিস্তৃত ক্ষেত্রে সংগঠিত করা যায়, সময়মত একদিন তা সফল হতে পারে। কিন্তু ইয়োরোপের পক্ষে সময়টাই হচ্ছে আজ সব থেকে বড় প্রশ্ন। আমরা এমন একটা ভীষণ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যে হিংসার শক্তির আঘাতে মানবের সমস্ত আশা ভরসা এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবার বিপদ দেখা দিয়েছে এবং তা হলে পুনরুত্থানের আর কোনো সম্ভাবনাও থাকবে না। সমস্ত পৃথিবীর উপরই আজ এই হিংসার বিপদ। অহিংসাবাদে জনসাধারণের রূপান্তর ঘটা, আদৌ সম্ভব হলেও, তা সত্বর ঘটতে পারে না। খ্রীষ্টের চিন্তা প্রচার করার জন্য একশত বৎসরের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা যদি এই মুহূর্তে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। অহিংসা ইয়োরোপে কি রূপ (form) নেবে?

"গান্ধী: এই রকম একটি প্রশ্নের উত্তর আমি প্যারীতে দিয়েছি। দুনিয়াটা সত্য সত্যই পৌত্তলিক! এই পৌত্তলিকতা থেকে খ্রীষ্টধর্মও নিস্তার পায় নি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্তত একটা দিয়ে তার প্রত্যক্ষভাবে দেখা, স্পর্শ করা, অনুভব করার প্রয়োজন, মনস্থির করার পূর্বে অহিংসার সফলতা সম্বন্ধে তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণের প্রয়োজন। এবং এই প্রমাণ ভারত তাকে দিচ্ছে। যদি তা সফল হয়, সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস যে তার জন্যে ২০ বৎসর লাগবে না। যদি ভারত সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করে, তাহলে সমস্ত দুনিয়া তার প্রমাণ পাবে এবং আমি

মনে করি যে ইয়োরোপীয়ানরা দেখতে পাবে তা কত সহজ। ইংলণ্ড যা করার তা করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যদি ভারতে হিংসা দেখা দেয়, অথবা হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া বেধে যায় এবং সকলকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে, তাহলেও আমি আমার বিশ্বাস হারাব না। এখন পর্যন্ত অহিংসা কেবলমাত্র সুফলই দিয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে ইংরেজদের চিন্তাও তার প্রভাবে এসেছে (যদিও তা এখনও যথেষ্ট নয়।) সমস্ত দুনিয়া দেখতে পাচ্ছে যে যদি অহিংসা না থাকত তা হলে গোল-টেবিল বৈঠক বসতে পারত না। আকাঙ্ক্ষিত ফল তাতে পাওয়া যায়নি ঠিকই কিন্তু তার পরোক্ষ ফল বহু। আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি যদি নাও সফল হই, আমি আমার বিশ্বাস হারাব না, কিছু মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে, যারা আমার প্রতি অনুগত থাকবে আমি আত্মশুদ্ধি করবো। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমায় ৬ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ভারতে আমি ১৯২২ থেকে আজ পর্যন্ত সংগ্রাম করতে পারি নি। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে বাণী এসে থাকে, এসেছে এবং আসবে। আমি মনে করি যখন প্রয়োজন হবে, আপনারাও সংগ্রামে নামতে পারবেন। কিন্তু আমি আপনাদের কিছুই বলতে পারি না। ইয়োরোপের অবস্থা অত্যধিক জটিল।

রলাঁ: ভারতীয় অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব সুবিস্তৃত।...কিন্তু আমাদের ইয়োরোপীয় সমস্যাগুলি দ্বিগুণ বা তিনগুণ: জাতীয় প্রশ্নে, সামাজিক প্রশ্নে। যেসব জাতি ১৯১৯ সালের ভেরসাই সন্ধিচুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে অসহযোগ আন্দোলন লোকে বুঝতে পারে ও অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু সামাজিক পীড়নের ক্ষেত্রে অসহযোগের কৌশল অচল অথবা যথেষ্ট নয়।

…ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে ও এশিয়াতে (জাপান) নারী ও শিশুদের শোষণ ভীতিজনক। এইরূপ নির্যাতিত শ্রেণীর নিকট মুক্তির বাণী পৌঁছে দিতে হবে। যখন আত্মরক্ষার জন্য তারা সংগঠিত হয় তখন কি তাদের দোষ দেওয়া যায়? জার ও ধনতন্ত্রের অধীনে রুশিয়ার নির্যাতিত অবস্থার কথা ভেবে দেখুন। আজ কি তাকে বলা যায় যে ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান যদি আক্রমণ করে তাহলে তাদের বাধা দিও না? বরং রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য পাশ্চাত্যের শ্রমিকদের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। ইয়োরোপে আজ জাতীয় প্রশ্নের চাইতে সামাজিক প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠেছে। বস্তুতঃ, পুঁজিবাদীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর সংঘর্ষটা আন্তর্জাতিক। আজ পৃথিবীতে পরস্পর বিরোধী দুইটি আন্তর্জাতিক…

"গান্ধী : …ইংলণ্ডে ৮০ লক্ষ বেকার আছে। আমি মালিক শ্রেণীর সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্বন্ধটা ভালই। আমি শ্রমিকদের বলেছি যে প্রতিকার হচ্ছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা নয়, তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করা। তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তারা পুঁজিপতিদের নিকট দাবি জানায়, অবশ্য পুঁজিপতিরা তাদের প্রতি বিরূপ নন, কিন্তু তাদের আজ আর বাজার নেই, যদি পুঁজিপতিদের ধনসম্পদ সব বেকার শ্রমিকদের বিলি ক'রে দেওয়া হয়, তাতে বেশী দিন চলতে পারে না। আমি তাদের বললাম : 'তোমরা নিজেদের সাহায্য কর, তোমরা গৃহ-শিল্প গ্রহণ কর।' ওয়েলস্-এ গৃহ-শিল্প নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা হচ্ছে যদিও তা নগণ্য। কয়েকজন খনি-শ্রমিক তাদের পূর্বেকার পেশায় ফিরে গিয়েছে এবং তারা বুঝতে পারছে যে তাদের মুক্তি তার মধ্যেই। রাষ্ট্রের

সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে কারোও বাঁচা উচিত নয়।" (*Inde Pp. 323-25*)

দুই দিন এইরূপ সংলাপ চলার পর রলাঁ তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—

"গান্ধী এসেছেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসল কথাটা স্বীকার করলে বলতে হয় যে এই দিন বুঝতে পারলাম যে গান্ধীর পথ পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে, এবং—অনেক ব্যাপারেই—আমার থেকে তা এত স্বতন্ত্র যে আমাদের মধ্যে আলোচনা করার আর বিশেষ কিছুই নেই। আমরা উভয়েই জানি অন্তজন কোন্‌দিকে যাচ্ছেন।…আমাদের নতুন ক'রে বলবার আর কি আছে? …যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" (*Inde Pp. 334*)

যে গান্ধী সম্বন্ধে রলাঁ এত উচ্চাশা পোষণ করতেন এবং যার প্রতি তাঁর এত অগাধ বিশ্বাস ছিল সেই গান্ধী সম্বন্ধে রলাঁর এই কথাটা বুঝতে অনেকদিন লেগেছিল যে গান্ধী এমনই একজন ব্যক্তি যিনি ফরাসী বিপ্লবের সময়কার শাসক-গোষ্ঠি বুরবঁদের মতো কিছু শেখেনও না কিছু ভুলেও যান না। এবং তিনি মান্ধাতা আমলের কাল্পনিক রামরাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে আসতে একেবারেই নারাজ। রলাঁ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার শোষণ ও অসাম্য বজায় রাখার জন্য গান্ধীর এইসব চিন্তাধারা হচ্ছে তাঁর কৌশল।

আর একদিন পুনরায় ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্ন উঠল—বেকার সমস্যা, ছাঁটাই, শ্রমিকদের

নিম্ন বেতন ইত্যাদি। গান্ধীর নিকট এই সমস্ত সমস্যাগুলিরই সমাধান অত্যন্ত সহজ।

"গান্ধী : শ্রমিকদের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ ঐক্য (Perfect unity) থাকে, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শ্রমিকরা তাদের দাবিগুলি কার্যকরী করতে পারবে। তারা নিজেদের সর্ত ছাড়া অন্য কারও সর্তে কাজ করতে রাজী নয় এইটাই যথেষ্ট।

"রলাঁ : আপনি বলছেন যে শ্রমিকদের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ ঐক্য হয় তাহলে তারা মালিকশ্রেণীর উপর তাদের সর্তগুলি চাপিয়ে দিতে পারবে। আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার কথাটাও চিন্তা করতে হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় না। কারণ মালিকশ্রেণী চক্রান্ত ক'রে শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করে, তারা অনেককে কিনে নেয়। এই অবস্থায় সংখ্যালঘু সক্রিয় ও সচেতন শ্রমিকরা যারা বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তারা মনে করে যে ঐক্যবদ্ধ হতে সমস্ত শ্রমিকদের বাধ্য করা প্রয়োজন। এটাই হচ্ছে, যে শ্রমিকশ্রেণীকে পশুবলের দ্বারা দাবিয়ে রাখা হয়েছে, তারই স্বার্থে সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (dictatorship of the Proletariat)।

"গান্ধী : আমি এর সম্পূর্ণ বিরোধী, কারণ এর অর্থ হচ্ছে যে শ্রমিকরা মূলধন দখল করবে ; এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মূলধন দখল করাটা একটা নিকৃষ্ট উপায়। আপনি যদি শ্রমিকদের নিকট একটা খারাপ উদাহরণ স্থাপন করেন তাহলে শ্রমিকরা কোনো-দিনই তাদের শক্তি উপলব্ধি করতে পরেবে না। (*Inde Pp. 357*)

তারপর গান্ধী আহ্‌মদাবাদে কি ক'রে ৬৬,০০০ অশিক্ষিত

শ্রমিকদের ইউনিয়নে এনেছেন, তাদের তিনি কি ভাবে বুঝিয়েছেন যে "তাদের ভাগ্য, তাদের নিরাপত্তা তাদের নিজেদের হাতেই রয়েছে," "আমি তাদের এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করেছি যে তারা একটি শক্তিহীন, পরনির্ভরশীল শ্রেণী নয়, আমি তাদের শিখিয়েছি যে তারাই হচ্ছে সত্যিকারের পুঁজিপতি, কারণ পুঁজি কোনো ধাতুর মুদ্রা নয়, পুঁজি হচ্ছে কাজ করার শক্তি ও ইচ্ছা, এইটাই তাদের অফুরন্ত পুঁজি," "বম্বেতে একটি ছোট কমিউনিস্ট দল আছে যারা নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করছে, ...কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা সফল হয় নি,"... (বম্বে ও অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের উপর ইংরেজ শাসকদের যে নির্যাতন ও ভারতীয় মালিকদের যে শোষণ চলছিল তার উপর এবং মীরাট মামলার বন্দীদের সম্বন্ধে গান্ধী কোনো উল্লেখও করলেন না, যে মামলার বিরুদ্ধে রলাঁ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন ও ইয়োরোপে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন), "কারখানা থেকে কি ভাবে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হতে হয় তা আমরা আহ্‌মদাবাদের শ্রমিকদের শিখিয়েছি; তাদের যে প্রাপ্য তারা ন্যায্য বলে মনে করে তা যদি কারখানা থেকে তারা না পায়, তাহলে চরকায় সুতা কেটে সামান্য আয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, অথবা পাথর ভেঙ্গে রোজগার করতে হবে," "শ্রমিকদের একটা নিজস্ব ক্রমবিকাশ আছে, আমি সেখানে হিংসার আমদানি ক'রে কোনো গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে চাই না," ইত্যাদি।

রলাঁর নিকট বিদায় নিয়ে গান্ধী গেলেন ইতালি ভ্রমণে,

মুসোলিনির অতিথি হয়ে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে যখন ইতালিতে গিয়েছিলেন তখন ফ্যাসীবাদের স্বরূপ ভারতীয়দের চোখে ধরা পড়েনি। রলাঁর প্রচেষ্টায় ও তৎপরতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভুল ধরতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করেছিলেন এবং তারপর থেকে সর্বদাই ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৯৩১ সালে গান্ধীর ইতালি ভ্রমণের সময় ফ্যাসীবাদের দানবীয় চরিত্র খুব কম লোকেরই অবিদিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও জগতের সকল মনীষীদের ফ্যাসীবাদ-বিরোধী উক্তিগুলি গান্ধীর অজানা ছিল না। রলাঁও ফ্যাসীবাদের হিংসাত্মক রূপ সম্বন্ধে গান্ধীকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে "আপনার সেখানে যাওয়াটাই হবে মুসোলিনির পক্ষে একটা নৈতিক বিজয়।" রলাঁ এও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে গান্ধীর ইতালি ভ্রমণ কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

রাশিয়া হিংসায় বিশ্বাস করে—এই অজুহাতে তিনি রাশিয়া ভ্রমণে যেতে রাজী হননি। কিন্তু ফ্যাসিস্ত ইতালির ক্ষেত্রে হিংসার প্রশ্ন গান্ধীর মনে একবারও উঠল না! মুসোলিনির রক্তরঞ্জিত করমর্দনে তাঁর অহিংস বিবেকে এতটুকু বাধল না কিন্তু গান্ধীর এইরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সারাজীবন ব্যাপী কোনো সময়েই তাঁর অহিংসা-নীতিতে সংগতি ছিল না। তাঁর অহিংস নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্র ছিল শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে—তাদের বিপ্লবের পথ থেকে দূরে রাখাই ছিল এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

তাঁর এই নীতি কোনোদিনই তিনি শাসক-শোষক শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বলেননি। বুয়োর যুদ্ধে, জুলু যুদ্ধে ও প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সাম্রাজ্যবাদী হিংসাকে নিন্দা করেন নি ; যে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের জন্য নিরীহ মানুষকে তাদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছিল, অনগ্রসর দেশগুলিকে পশুবল ও হিংসার দ্বারা পদানত ক'রে রাখছিল, সেই সাম্রাজ্যবাদীদেরই গান্ধী বার বার সাহায্য করেছিলেন। গাড়োয়ালী সৈন্যরা যখন তাঁরই অহিংসনীতি অনুসরণ ক'রে পেশোয়ারে জনসাধারণের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিল, সেই ক্ষেত্রেও গান্ধী গাড়োয়ালীদের সেই কার্যের সমর্থন না জানিয়ে, তাদের নিন্দা করেছিলেন।

গান্ধী ইতালিতে অহিংসা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছিলেন তার একটা কথাও ইতালির সংবাদপত্রগুলি ছাপে নি। তারা ছেপেছিল গান্ধী মুসোলিনির সঙ্গে করমর্দন করছেন, ফ্যাসিস্ট যুবকদের স্যালিউট গ্রহণ করছেন ইত্যাদি। ইতালির জনসাধারণ জানতে পারল যে মুসোলিনি ও ফ্যাসীবাদকে গান্ধী আশীর্বাদ ক'রে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এর দু'চার বছর পরেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থনে মুসোলিনি আবিসিনিয়া আক্রমণ করেছিল এবং স্পেনের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল।

ফ্যাসীবাদ ও মুসোলিনির দ্বারা গান্ধী যে কতখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা ভারতে ফিরবার পথে পিলস্‌না জাহাজ থেকে রলাঁকে যে চিঠিখানা ১৯৩১, ২০শে

ডিসেম্বর তারিখে লিখেছিলেন তাতেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

"আমার নিকট মুসোলিনি একটা ধাঁধা। তাঁর অনেক সংস্কারের কাজ আমি সমর্থন করি। আমার মনে হলো তিনি কৃষাণদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। অবশ্য, লৌহদস্তানা সেখানে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্ত্যে পশুবলই (হিংসাই) হলো সমাজের ভিত্তিমূল, মুসোলিনির সংস্কারগুলি সেই প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষভাবে বিচার করার যোগ্য। আমি মনে করি গরীবদের প্রতি তাঁর দরদ, 'বৃহৎ'-শহরীকরণের (Super-urbanisation) প্রতি তাঁর বিরোধিতা, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা—এগুলি আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার মত জানতে পারলে বাধিত হবো। আমার যেখানে মৌলিক সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তা হলো—এই সংস্কারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজেও তো একই পন্থায় এই কাজ-গুলি হয়ে থাকে। আমাকে যা আকর্ষণ করেছে তা হলো মুসোলিনির কঠোরতার পশ্চাতে রয়েছে তাঁর জনসাধারণকে সেবা করার বাসনা। এমন কি তাঁর কড়া বক্তৃতাগুলির পশ্চাতে রয়েছে একটা সততা ও তাঁর দেশবাসাদের প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেম। আমার আরও মনে হয় যে ইতালির জনসাধারণ মুসোলিনির বজ্রমুষ্টিকে পছন্দ করে।" *(Inde, p. 372)*

রলাঁ যখন খবর পেলেন যে গান্ধী দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্দী হয়েছেন এবং ভারতে পুনরায় দমননীতি শুরু হয়ে গিয়েছে, রলাঁ তৎক্ষণাৎ তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

গান্ধীকে একটি ছোট চিঠিতে সহানুভূতি জানিয়ে লিখলেন, ভারতের এই সংগ্রাম "সমস্ত পৃথিবীর সংগ্রাম।" এইসময় রঁলা "*Europe*" পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ *England Declares War On India* লিখেছিলেন। আর একটি প্রবন্ধে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ প্রভৃতির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না কেন? তিনি ইউরোপের খ্রীষ্টীয় সমাজকে আহ্বান জানালেন ভারতের মহান্ সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সমর্থন জানাবার জন্য। তিনি বললেন, অহিংসনীতির দ্বারা সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের এইটাই শেষ সুযোগ।

"ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের ফলে, অথবা ভারতীয়দের এই অত্যাচার প্রতিরোধে অক্ষমতার ফলে, যদি এই অহিংস-আন্দোলন বিফল হয়ে যায়, হিংসার পথ ছাড়া মানব-ইতিহাসে আর অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেই এর জন্য দায়ী হতে হবে। গান্ধী অথবা লেনিন! যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, সামাজিক সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।...এই সংগ্রামে ভারতীয় সত্যাগ্রহ যদি পরাজিত হয়, তাতে যীশু খ্রীষ্টেরই পরাজয় হবে, তরবারির আঘাতে ক্রসের ধ্বংস হবে। এবার আর পুনরুত্থানেরও (resurrection) আশা নেই। আমি অখ্রীষ্টান হয়েও (যদিও আমি খ্রীষ্টান হয়ে জন্মেছিলাম, আমি আর সেই ধর্মমতে বিশ্বাস করি না) খ্রীষ্টানদের দৃষ্টি এই সম্বন্ধে আকর্ষণ করছি।" (*Inde, p. 374*)

রলাঁ পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে পা মিলিয়ে

চলছিলেন, পুরাতন পৃথিবীর জরাজীর্ণ চিন্তাধারার স্থানে সদ্যজাত নতুন পৃথিবীর চিন্তাধারা গ্রহণ করছিলেন, একথাটা রল্যাঁর মুখে বারবার শুনেও গান্ধী যেন তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, অথচ কথাগুলি উপেক্ষা করার মতোও নয়। রল্যাঁর অন্যান্য পুরাতন বন্ধু ও গুনমুগ্ধরাও, বিশেষ ক'রে বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা সকলেই বলতে লাগলেন—Rolland must fix his position vis-a-vis Bolshevism—রল্যাঁ স্পষ্ট ক'রে বলশেভিজম সম্বন্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করুন। এঁদের মধ্যে ছিলেন টলস্টয়ের নাতনী সোফিয়া বার্তোলিনি (Sofia Bertolini), যিনি একজন ধনী ইতালীয় সংবাদপত্রের মালিককে বিবাহ করেছিলেন। ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩১, গান্ধী একটু কায়দা ক'রে রল্যাঁকে লিখলেন:

"আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে বলশেভিজম সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিয়ে টলস্টয়ের নাতনীর (যাঁর সঙ্গে আমার রোমে দেখা হয়েছিল) কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন।"

মীরার নিকট থেকেও এই অনুরোধ এল।

১লা জানুয়ারি, ১৯৩২, রল্যাঁ মীরার চিঠির জবাবে লিখলেন:

"ইয়োরোপের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থা (—যা ইয়োরোপ থেকে সমস্ত দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে) এবং শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারকারী সোভিয়েত শ্রমিকরাষ্ট্র—এ দুটো পাশাপাশি বেশী দিন বাস করতে পারে না। প্রথমটা হলো মৌলিক নীতিহীনতার এক সর্বধ্বংসী সমাজ-ব্যবস্থা, যার অপসারণ অবশ্য করণীয় এবং যার সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে সমগ্র

মানব জাতির জীবন-মরণ। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ ক'রে শ্রমিকশ্রেণীকেই ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হতে হবে এবং যদিও শ্রমিকশ্রেণী কি ভাবে তার শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত করবে, তার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা চলতে পারে কিন্তু কোন সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে ধনতান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

"অর্থনৈতিক প্রশ্ন (যেমন যন্ত্রবাদ ও শিল্পায়ন—machinism and industrialization) এবং কৌশলের প্রশ্ন (সমাজের স্বার্থরক্ষার্থে হিংসানীতি বা অহিংসানীতির প্রয়োগ)—এ দুটোকে পৃথক-ভাবে বিচার করতে হবে। ভারতের অবস্থায় চরকা প্রভৃতি গৃহশিল্পের যতখানি প্রয়োজন থাকতে পারে, আমি মনে করি, সোভিয়েতের অবস্থাতেও যন্ত্র প্রয়োগ ও শিল্পায়নের ততখানিই প্রয়োজন।···তাজিকিস্থানের বিরাট মরুভূমিকে (যা ২।৩ হাজার বৎসর ধরে ঐ অবস্থায় পড়ে ছিল এবং যাকে কেবলমাত্র মানুষের বাহুশক্তির দ্বারা জয় করা সম্ভব হয় নি) শক্তিশালী যন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা মাত্র ৫।৬ বৎসরের মধ্যে উর্বরা ভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যন্ত্র মৃত্যুকে ধ্বংস করেছে এবং জীবনকে অঙ্কুরিত ক'রে তুলেছে। যন্ত্রের নিজস্ব কোনো নৈতিক অথবা অনৈতিক রূপ নেই (neither moral nor immoral in itself)। এটা একটা শক্তি। সব কিছু নির্ভর করে তাকে কি ভাবে প্রয়োগ করা হয় তারই উপর।" (*Inde, p. 368*)

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এককালে রলাঁ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ তিনজনই যন্ত্র-সভ্যতার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বর্তমান যুগের মানুষের দুর্গতির জন্য তাঁরা সকলেই যন্ত্র-সভ্যতাকে দায়ী করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের সংস্পর্শে এসে এসম্বন্ধে রলাঁর

মতের যে কতখানি পরিবর্তন হয়েছিল তা উপরের উদ্ধৃতিতেই যথেষ্ট পরিষ্কার।

সোভিয়েত ভ্রমণ করার পর রবীন্দ্রনাথেরও রলাঁর মতোই মত বদলেছিল। তিনি লিখেছিলেন :

"এরা নানাজাতির লোক কলকারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্যে এত অবাধ উৎসাহ এবং সুযোগ পেয়েছে তার একমাত্র কারণ, যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনী লোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্য যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্য শাস্তি দিই তালগাছকে।"...

"এরা তিনটে জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি, যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে।" (রাশিয়ার চিঠি)

পুঁজিপতির হাতে যন্ত্র মানুষকে দাস ক'রে রাখে, তাকে রক্তশূন্য ক'রে দেয়। শ্রমিকশ্রেণীর হাতে যন্ত্র হয়ে ওঠে তাদের মুক্তির হাতিয়ার। গান্ধী যন্ত্র বর্জন করেছিলেন, চরকাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরেছিলেন, এটা কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় ব্যাপারই নয়; যন্ত্র যাতে মালিকশ্রেণীর হাতে থেকে যেতে পারে, চরকা ছিল তার একটা কৌশল মাত্র।

জার্মানীতে নাট্সীতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে, হিটলার মুহুর্মুহুঃ যুদ্ধের হুঙ্কার দিচ্ছে—পৃথিবীর সঙ্কট চতুর্দিক থেকে আরও ঘনীভূত হয়ে আসছে। সেই সময়ে (৮ই নভেম্বর, ১৯৩৪) গান্ধীকে রলাঁ লিখলেন :

"হিংসার যতগুলি রূপ আছে, তার মধ্যে বর্তমানে সব থেকে

নির্মম হলো অর্থ। অর্থের শক্তি সর্বদাই প্রচণ্ড; কিন্তু বিগত অর্ধশতাব্দী থেকে, বিশেষ ক'রে গত যুদ্ধের পর থেকে, বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে (ভারী শিল্প, যুদ্ধাস্ত্র শিল্প, রসায়ন শিল্প) এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে (যার শোষণ সমস্ত জাতির মধ্যে বিস্তার করছে) একত্রিত হয়ে তার আধিপত্য আরও ভয়ানকভাবে সম্প্রসারণ করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিও আজ অর্থের দখলে—সরকারগুলি তার খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং যারা এই দানবীয় শক্তিগুলি ব্যবহার করে তাদের এমন মানসিক বিকার ঘটেছে যা সমস্ত দুনিয়াটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বৃহৎ শিল্প সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে। মানুষের মৃত্যু নিয়ে তাদের খেলা (টক্সিক গ্যাস, আফিং এবং তার চাইতেও মারাত্মক—হেরোইন ইত্যাদি)। এবং আরও দুঃখের বিষয় এই যে মধ্যবিত্তশ্রেণী কিছু বিচার বিবেচনা না করেই অন্ধভাবে এই অপরাধমূলক জুয়াখেলার লভ্যাংশ গ্রহণ করছে। শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা অধিকতর সুস্থ, ন্যায়সঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য তারা সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। যে অহিংসনীতি তাদের এই বিদ্রোহকে হিংসা বলে নিন্দা করে, তাকে এটা বুঝতে হবে যে হিংসার উৎসের বিরুদ্ধেই তাদের এই লড়াই—লড়াই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দুর্নীতি ও ধ্বংসপরায়ণতার বিরুদ্ধে—যা তাদের অবশ্যম্ভাবীরূপে দুইটি ভিন্ন কার্যক্রমের সম্মুখীন ক'রে দেয়: বিপ্লব অথবা মৃত্যু। এই সংঘর্ষে—যার মধ্যে সকলকেই একটা-না-একটা দিক বেছে নিতে হবে—আপনার কণ্ঠস্বরের নিতান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে এটা বিশেষ জরুরী, কারণ আপনার চিন্তার অপব্যাখ্যার দরুন জনসাধারণের

মধ্যে সে-সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি আছে। আপনার সম্বন্ধে তাদের এই ভুল বোঝাবুঝি যাতে বজায় থাকে তাতে অনেকেই আগ্রহান্বিত। আপনার মতোই আমিও সারাজীবন ধরে বিরুদ্ধ-শক্তিগুলির মধ্যে সামাঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছি। এমন একটা সময় ছিল যখন বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে এই সামঞ্জস্য গড়ে উঠতে পারত। সেযুগ আর নেই; এমন কি পার্লামেণ্টারী "লিবারালিজম"ও মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁচেছে; অনেকদিন ধরে স্রেফ মিথ্যার দ্বারাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। আজ আমরা যা দেখছি তা হলো অর্থের ও হিংসার একটা বল্গাহীন অরাজকতা। ধনতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদ বিভিন্ন রূপে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে কর্মের পবিত্রতা ও সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজ-ব্যবস্থা। তারই জন্য আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনিও এই রূপই চিন্তা করেন। মুক্ত কণ্ঠে তা ঘোষণা করুন। শুধু ভারতবাসীরই নয়, সমস্ত দুনিয়ার মুক্তির পথ এইটাই।" (*Inde, p. 465-66*)

রলাঁর এই চিঠির জবাব গান্ধী দেননি! ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বরে বোম্বেতে গান্ধী সমাজতন্ত্রের নিন্দা ক'রে যে বক্তৃতা করেছিলেন তা পড়ে রলাঁ খুব আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর ভগ্নীকে দিয়ে পিয়ারেলালকে চিঠি লেখালেন। সেই চিঠির জবাবে গান্ধী সংক্ষেপে মাদলিন রলাঁকে লিখলেন (২৮.৩.৩৫):

"সত্যই আমাকে ঋষির নিকট একটি সম্পূর্ণ চিঠি লিখতে হবে। কিন্তু এই "সম্পূর্ণ" বিশেষণটি আমাকে শঙ্কিত ক'রে তোলে। তাঁর চিঠির বিশদ উত্তর দিতে হলে যে দীর্ঘ চিঠি লেখার প্রয়োজন

তার সময় এখন আমার নেই। আগামী মৌন দিবসগুলিতে আমি তার চেষ্টা করবো। আপনার প্রশ্নটি সহজ। সমাজতন্ত্রবাদ যেভাবে এখানকার official [পার্টির] কর্মসূচীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমার বিরোধিতা তারই সম্বন্ধে। সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব অথবা দর্শনের বিরুদ্ধে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু এখানে যে কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে, তা হিংসা ছাড়া কার্যকরী করা যায় না। সমাজতন্ত্রীরা কোনো পরিস্থিতিতেই হিংসা বর্জন করতে চায় না। যদি তারা দেখে যে অনধিকার ভাবে ক্ষমতা দখল করা যেতে পারে (usurp power), তাহলে খোলাখুলিভাবেই তারা অস্ত্র ধারণ করবে। ··এদের এই কর্মসূচীতে এমন অনেক অংশ আছে যার সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রোয়োজন মনে করি। আমি জানতে চাই এটা আপনার প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর হয়েছে কিনা? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কোথায় আপনাদের বোঝার অসুবিধা হচ্ছে তা সঠিকরূপে আমাকে জানাবেন।" *(Inde, p. 474)*

এর পর রলাঁ ও গান্ধীর মধ্যে আর বিশেষ কোনো পত্রালাপ হয়নি। ১৯৩৫ সালে রলাঁর "সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি" (*Par la Revolution la Paix*) প্রকাশিত হয়, তাতে রলাঁ গান্ধী সম্পর্কে এই ফুটনোটটি যোগ ক'রে দিয়েছিলেন :

"গান্ধী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তা গ্রহণও করবেন না, অধ্যয়নও করবেন না। সামঞ্জস্য বিধান করাই হচ্ছে তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু যে সময়ে তাঁকে একটা দিক বেছে নিতে হবে, সেই সময়ে তিনি দুইটি দিকের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। সামাজিক সংঘর্ষের সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ইতস্ততঃ করার অর্থই হলো তার দ্বারা শোষিতশ্রেণীর বিরুদ্ধে

শোষকশ্রেণীকেই লাভবান হতে দেওয়া। গান্ধীর এই মনোভাব তাঁর অহিংসার প্রতি গভীর মৌলিক বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত, এবং তিনি নিজেই বলেছেন যে তাঁর এই বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই বিশ্বাস যত পবিত্রই হোক না কেন, তা তাঁর দৃষ্টির (vision) স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। সামাজিক অভিজ্ঞতা সবসময়ই মুক্ত, সবসময়ই চলমান। তা কখনো কোনো ধর্মবিশ্বাস বা অনুভূতি সাপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে না। অতীতের এই প্রভাব যা গান্ধীর অগ্রগতিতে এখন বাধাসৃষ্টি করছে—তা থেকে তিনি যদি নিজেকে মুক্ত না করতে পারেন, তাহলে মহান্ ভারতীয় আন্দোলনের গতিপথ তিনি হারিয়ে ফেলবেন—যে গতিপথ ইতিমধ্যেই তাঁর চিন্তার বাইরে চলে যেতে শুরু করেছে।"(*p. 74*)

রলাঁ ও সুভাষচন্দ্র

অসহযোগ আন্দোলন যখন খুব প্রবল হয়ে ওঠে সেই সময় ১৯৩২ সালে সুভাষচন্দ্র বোসকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ১৯৩৩ সালে ভিয়েনা যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেইসময়ে ১৯৩৫-এর এপ্রিলে সুভাষচন্দ্র ভিলন্যভে রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র রলাঁকে যা বলেছিলেন রলাঁ তাঁর ডায়েরীতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন :

"তিনি আমাকে বোঝালেন কি ক'রে, তাঁর মতে, গান্ধীর

নেতৃত্ব এমন একটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হলে গান্ধী-নেতৃত্ব থেকে তাকে পৃথক হতে হবে। তাঁর মতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এই আন্দোলন বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে সক্ষম হয় নি। যে আন্দোলন গান্ধী পরিচালনা করেন তার শেষ ধাপ পর্যন্ত তিনি কখনই যেতে রাজী হন না।···যে সব ভারতীয় বণিকরা ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করতে অস্বীকার করছিল তাদের বাধ্য করাবার জন্য গান্ধী তাঁর সহযোগী-দের অনুমতি দেন নি। এই আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে ইংরেজ শাসকরা অনেক দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত ক'রে ও অনেক ইতস্তততার পর এই আন্দোলন দমন করার পথ খুঁজে পেয়েছে। পূর্বে তারা যেমন হাজার হাজার লোককে ধরে জেলে পাঠিয়ে দিত (সব জেলগুলিই ভর্তি হয়ে যেত), এখন আর তা তারা করে না। এখন তারা শুধু নেতাদেরই জেলে নিয়ে যায়—যাঁরা হলেন আন্দোলনের প্রাণ ; কিন্তু আর সব রকম গণ-আন্দোলনই তারা নির্মমভাবে দমন করে। গান্ধীবাদীদের সত্যাগ্রহ আর তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় না। তারা জানে যে এই দিক থেকে তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। এমন কি ওয়েজউড বেন-এর মতো একজন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের (সমাজতন্ত্রী) নেতা—যিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সব থেকে সহানুভূতিশীল—তিনি রাধাকৃষ্ণাণকে সম্প্রতি বলেছেন : 'ভারতীয়রা নিজেরাই যখন আমাদের বিতাড়নে অক্ষম, আমরা তা হলে কেন ভারত ছেড়ে চলে আসবো ?'

"সুভাষচন্দ্র সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ সমর্থন ক'রে বললেন যে শুধু এইসব কাজগুলিই ভারতে ইংরেজদের দুশ্চিন্তিত

ক'রে তুলেছে। সন্ত্রাসবাদীরা যদিও সংখ্যায় খুব অল্প এবং প্রায় বাঙলা দেশেই সীমাবদ্ধ, তাদের প্রভাব খুবই গভীর। ইংরেজ কর্মচারীরাই সুভাষচন্দ্রকে একথা বলেছে। এবং এই পন্থা যদি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ইংরেজরা খুবই দমে যাবে। তবে, তিনি পুনরায় বললেন যে, সন্ত্রাসবাদকে একটা প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক উপায় বলে তিনি মনে করেন না এবং তিনি চান একটি সুসংগঠিত সংগ্রাম, হিংসাকে বাদ দিয়ে নয়, বরং প্রয়োগ ক'রে। সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো জনসাধারণকে সংগ্রামে আকৃষ্ট করা।

"দেশের সমস্ত পার্টি ও সকল শ্রেণীর মধ্যেই গান্ধীর প্রচণ্ড প্রভাব কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য তা তিনি কাজে লাগান না। সন্দেহ নেই যে গত ১৫ বৎসর ধরে জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য ও সব শ্রেণীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু তিনি স্বভাবগতভাবেই মধ্যপন্থী, যিনি চরম বৈপরীত্যের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ও বিভিন্ন পার্টির মধ্যে আপস ঘটাতে চান। এইভাবেই তিনি সততার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন কিন্তু তিনি আবার বর্ণভেদ প্রথাকেও সমর্থন করেন। শ্রমিকদের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ আছে কিন্তু মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হতে বাধার সৃষ্টি করেন। তিনি এখন আর যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে মুখর নন, বাঁকা পথে সমাজ-সংস্কারের জন্য গ্রামাঞ্চলে গৃহশিল্পের (চরকা) উপরই জোর দেন মাত্র; কিন্তু কার্যত তাঁর এই প্রচেষ্টা থেকে দেশ খুব সামান্যই উপকৃত হয়; পক্ষান্তরে তাঁর এই কাজ প্রয়োজনীয় যৌথ শিল্পায়নের আন্দোলন থেকে দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ারই নামান্তর। সব বিষয়েই

তিনি আমাদের অগ্রগতির রাশ টেনে ধরছেন। বিশেষ ক'রে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যেতে তিনি সব সময়ই সচেষ্ট। এবং, বোসের মতে, যদি সমাজতন্ত্রীরা সফলতার সঙ্গে কাজ করতে চায়, তা হ'লে এই বিষয়েই তাদের জোর দিতে হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে হবে, তাদের দাবিগুলির সমর্থন করতে হবে এবং কৃষকরা যাতে জমি পায় তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সমাজতন্ত্রীদের গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এ কাজের আরও প্রয়োজন এই জন্য যে, গ্রামগুলিই একমাত্র স্থান যেখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সহজে পৌঁছনো যায়, কারণ সেখান থেকেই সিপাহীদের রিক্রুট করা হয়; সিপাহীদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য গ্রামে প্রভাব বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। বোস ঢাকবার চেষ্টা করলেন না যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব প্রয়োজন এবং ব্রিটিশ অস্ত্রশস্ত্রের নিকট ভারতবর্ষ নিতান্তই দুর্বল। তিনি একথাও লুকোলেন না যে শীঘ্রই ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধবে ও ইংলণ্ড তাতে জড়িত হয়ে পড়বে এবং তারই সুযোগে ভারত বিজয়ী হতে সক্ষম হবে...

"প্রধানতঃ তিনি এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা ক'রে এ সব বিষয়ে আমার মত কি জানবার জন্য, বিশেষ ক'রে আমি তাঁকে সমর্থন জানাবো কিনা সেই জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে যেখানে হিংসার পথ বর্জন করা হবে না। সেইরূপ সংগ্রামের খোলাখুলি বিরোধিতা আমি করবো কিনা, তার জন্য তিনি খুবই চিন্তিত। আমি জানি না কেন, কোনো কোনো ফরাসী বন্ধুরা আমার নাম ক'রে নাকি তাঁকে নিশ্চিত-ভাবে বলেছেন যে, (অবশ্য খারাপ মতলবে নয়—কিন্তু আমার

হয়ে তাঁদের সে-রকম কোনো কথা বলার অধিকার নেই,—) যদি ভারতীয়রা গান্ধীবাদের কর্মপন্থা থেকে সরে যায়, তা হ'লে ভারত সম্বন্ধে আর আমার কোনো আগ্রহ থাকবে না। আমি তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম যে, আসলে ঘটনা হলো বিপরীত। আমাদের আলোচনার মৌলিক বিষয়ের উপর—বিপ্লব, হিংসা ও অহিংসা—আমি বর্তমানে কি মত পোষণ করি এবং সে-সম্বন্ধে আমি যা লিখেছি তা বোসকে বোঝাবার জন্য আমার সদ্য প্রকাশিত *Quinze Ans de Combat* ("শিল্পীর নবজন্ম") থেকে অনুবাদ ক'রে তাঁকে শোনান হলো, কারণ তিনি ফরাসী জানেন না। গান্ধীর মহান্ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও (এবং বোসও এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত), আমি বলবো যে তাঁর মতবাদের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ নেই ; সেই মতবাদ হচ্ছে, আমার মতে, একটা মহান্ পরীক্ষা (experiment) ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অতি সীমাবদ্ধতা এবং নেতিবাচক ফলাফল সত্ত্বেও গান্ধী যদি তাঁর মতবাদ নিয়ে একগুঁয়েভাবে চলেন—বিশেষ ক'রে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষে তিনি যদি দৃঢ়তার সঙ্গে আপসহীনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে যোগ না দেন, তাহলে, তাঁর বিরুদ্ধে হলেও, আমার স্থান শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গেই। আমি একথা কখনও গোপন করি নি।···

"আমার মনে হয় বোস কমিউনিজমের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে এখনও তিনি পরিষ্কার কিছু বলতে চান না। সম্ভবত, তাঁর বিরাগের কারণ ব্যক্তিগত, ভারতের বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সম্বন্ধে। তিনি বললেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়তো ভারতের মুক্তিসংগ্রামে

সাহায্য করবে ; তবে অনুযোগের ভাষায় বললেন যে মনে হয় সোভিয়েত যেন এখন বিশ্ববিপ্লবের প্রতি অনাসক্ত, তার জাতীয় সমস্যা নিয়েই সে ব্যস্ত।" (*Inde, Pp 473-76*)

উপরিউক্ত আলোচনার একটা সারাংশ সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ও পত্রিকায়[১] পাঠাবার পূর্বে রলাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সম্মতির জন্য। এই প্রসঙ্গে রলাঁ নিম্নলিখিত উত্তরটি সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন :

"১। আপনি বলেছেন যে যদি ভারতে গান্ধী ও 'যুব সমাজের' মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, তাহলে আমি তরুণদের সঙ্গে থাকব। আমি ঠিক এই ভাবে আমার মত ব্যক্ত করি নি। দুইটি পুরুষের (generation) মধ্যে অথবা দুইটি রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে আমাকে একটা বেছে নিতে হবে এমন ভাবে প্রশ্নটি আমার কাছে কখনও ওঠে নি। (উপরন্তু, আপনার কথাবার্তায় আপনি সঠিকভাবে সেরকম কোনো পার্টির উল্লেখ করেনও নি। 'তরুণ' বলতে আপনি কি সোসিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, বামপন্থী, স্বতন্ত্র ইত্যাদিদের বোঝাচ্ছেন ?) না, আমার কাছে প্রশ্নটা অনেক বৃহত্তর। সেটা হলো শ্রমিক জগতের আদর্শের প্রশ্ন। আমি পরিষ্কার করেই বলছি : 'যদি ঘটনাচক্রে গান্ধী (অথবা সেরকম কোনো দল) শ্রমিকদের স্বার্থ অথবা তাদের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের দিকে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে আগ্রহ দেখান অথবা তা থেকে দূরে থাকেন—

---

১ সুভাষচন্দ্রের এই প্রবন্ধ Modern Reviewতে (September, 1935) প্রকাশিত হয়েছিল এবং রলাঁ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐ পত্রিকায় (February, 1966) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

আমি কিন্তু শ্রমিক জগতের সঙ্গেই চলবো, আমি তাদের প্রচেষ্টা ও তাদের সংগ্রামের সঙ্গেই থাকবো। কারণ তাদের পক্ষেই রয়েছে সত্যিকারের ন্যায় ও মানবসমাজের প্রয়োজনীয় বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম।'

"২। আপনি বলেছেন যে অহিংসার ব্যাপারে মনোভাব স্থির করতে এবং আমি যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি তার জন্য আমি আমার ১০ বৎসর (অথবা ১৫ বৎসর) ধরে একটা নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছি। যে মানসিক সংগ্রাম আমাকে করতে হয়েছিল তা ছিল একটা বৃহত্তর এবং অনেক বেশী জটিল ক্ষেত্রব্যাপী। যুদ্ধের পর থেকে আমার সমস্ত সামাজিক ধ্যানধারণা (Social ideals), এমন কি আমার সমস্ত ভাবাদর্শ (ideology) আমাকে পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছিল। এই বিতর্কের মধ্যে অহিংসার প্রশ্নটি ছিল একটি নগণ্য অংশ মাত্র। এবং আমি অহিংসার বিরুদ্ধে একেবারেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি নি। তবে এই সিদ্ধান্তে আমি এসে পৌঁচেছি যে, অহিংসা সকল প্রকার সামাজিক কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। উপায়গুলির মধ্যে অহিংসা হচ্ছে মাত্র একটি যা নিয়ে পরীক্ষা চলছে। আমাদের চিন্তাজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বপ্রথম যা স্থাপন করতে হবে তা হলো একটা উচ্চতর ও অধিকতর ন্যায়সঙ্গত ও অধিকতর মানবিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনের চিন্তা। এবং তাকে জোর করেই স্থাপন করতে হবে। সর্বাগ্রে যে-পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে তার মরণ-আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে, কারণ এই মুমূর্ষু-সমাজ সামাজিক-বৈষম্য, ধনতান্ত্রিক শোষণ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্ররোচনা, এবং দুনিয়ার নয়-দশমাংশ লোকের নির্যাতনের উপর

প্রতিষ্ঠিত। এই ঘৃণ্য পাশবিক অবস্থার বিরুদ্ধে, এই যুগযুগান্তরের অপরাধের (crime) বিরুদ্ধে দৃঢ়তা ও দুঃসাহসের সঙ্গে এবং মূহূর্তকাল বিলম্ব না ক'রে সংগ্রাম করা আমাদের নিকট একেবারে বাধ্যতামূলক। (কারণ এই ক্ষমতাভোগী ও চিরস্থায়ী অপরাধ (crime) কারও জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে না।) এই জরাজীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক'রে না দেওয়া যায়, তা হলে সে-ই সমগ্র মানবসমাজকে শেষ ক'রে দেবে।) সুতরাং তার বিরুদ্ধে হিংসা-অহিংসার সমস্ত প্রকারের অস্ত্র নিয়ে সংগ্রামে নামতে হবে, যে সব অস্ত্রের দ্বারা সবথেকে সত্বর, সব থেকে নিশ্চিতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। আমি কোনো অস্ত্রই বর্জন করতে চাই না, কেবলমাত্র দেখতে হবে যে যারা দুঃসাহসী, সৎ ও নিঃস্বার্থ তাদেরই হাতে থাকবে এই অস্ত্র। এই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা, এই সামাজিক অপরাধ (Social crime) যা সমগ্র মানবজাতিকে দাসত্ব বন্ধনে বেঁধেছে, তাকে শোষণ করছে—এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গত কয়েক বৎসর ধরে সমস্ত হিংসা ও অহিংসার বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য আমি চেষ্টা ক'রে আসছি। ১৯৩২-এর আগস্ট মাসে আমস্টার্ডামে যুদ্ধ-বিরোধী, ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সর্বদলীয় বিশ্বকংগ্রেসে এই ছিল আমার ভূমিকা। আমি মনে করি যে অহিংসবাদীদের মধ্যে আজও একটা প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যার সাহায্য আমাদের নিতে হবে (যেমন, সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করা, অস্ত্র, রসায়ন কারখানায়, যানবাহন প্রভৃতিতে সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি।) সুসংগঠিত অহিংসাবাদ ও সুশৃঙ্খল বিপ্লববাদ উভয়কেই দুইটি সংযুক্ত বাহিনীতে পরিণত হতে হবে, উভয়কেই তার স্বতন্ত্র কৌশল বজায় রেখে, মানব-

জাতির সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের সকলের সংগ্রামের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে—আমাদের সেই শত্রু হচ্ছে যুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ সামরিক ও অর্থনৈতিক ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি।" (*Inde, Pp. 478-79*)

রলাঁ পরে একখানা চিঠিতে ১৯৩৫ সালে সুভাষচন্দ্রকে যা লিখেছিলেন, তাতে রলাঁর রূপান্তরিত জীবনদর্শন সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।[১]

"আমাদের বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যেককেই সেই সব প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, যা আমাদের ক্লান্ত, বিচলিত মুহূর্তে মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে পারে—সেই সব প্রলোভন যা আমাদের টেনে নিয়ে যেতে পারে সংগ্রামের বাইরে এমন এক জগতের দিকে, যে জগতের নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর, অথবা শিল্প, অথবা চিত্তের স্বাধীনতা, অথবা অতীন্দ্রিয় আত্মার সুদূর জগৎ। সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। কারণ আমাদের সমস্ত কর্তব্যই সমুদ্রের এ পারে, যেখানে অবস্থিত মানবের কুরুক্ষেত্র।"

---

১ চিন্মোহন সেহানবীশের প্রবন্ধ "রলাঁ প্রসঙ্গে" ("আন্তর্জাতিক," শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২) দ্রষ্টব্য।

"বিমুগ্ধ আত্মা"

জাঁ-ক্রিস্তফ শিশু পৃথিবীকে কাঁধে নিয়ে নদী পার হয়েছিল। "বিমুগ্ধ আত্মা"র আনেৎ রিভিয়েরও সেই নদী, সেই নদীর নামেই তার নাম—*Rivière*—সেই জীবন্ত জলধারা, সেই চির প্রবহমান জীবন।

"বিমুগ্ধ আত্মা"[১] (*L'Ame Enchantee*) "জাঁ-ক্রিস্তফ"এরই অনুবৃত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী পটভূমিতে বিধৃত "জাঁ-ক্রিস্তফ"এর কাহিনী। যুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধ পরবর্তী বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের কালান্তরের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে "বিমুগ্ধ আত্মা" উপন্যাস। "বিমুগ্ধ আত্মা"র প্রথম দুই খণ্ড—"দুই বোন" ও "সুদূরের পিয়াসী"—১৯২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়, ৩য় খণ্ড "মা ও ছেলে" শেষ হয় ১৯২৬ সালে ; ৪র্থ খণ্ড "ঘোষণাকারিণী"র (*L'Annonciatrice*) লেখা শুরু হয় ১৯২৯ সালে এবং সমাপ্ত হয় ১৯৩৩ সালে। "বিমুগ্ধ আত্মা" রলাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি ; এতে তাঁর ভাব, চিন্তা আরও পরিণত, আরও গভীরতর, আরও বেদনাপ্লুত।

---

১ "বিমুগ্ধ আত্মা"র প্রথম তিন খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ৪র্থ খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

আনেৎ ও তার পুত্র মার্ককে কেন্দ্র ক'রে "বিমুগ্ধ আত্মা"র কাহিনী। তার প্রথম দুই খণ্ড ভূমিকা মাত্র—অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সমাজের চিত্র। প্রথম থেকেই প্রশ্ন জাগে—আনেৎ কি জাঁ-ক্রিস্তফকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? আনেৎ-এর জন্ম ধনী বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া পরিবারে। ধনীর ঘরে বিয়ে ক'রে সে অনায়াসে সেই সমাজের গতানুগতিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারত। কিন্তু সে-পথে সে গেল না। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ক'রে বসল। কৈশোরেই সে লক্ষ্য করতো তার বাবা-মা'র মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান। তাতে তার হৃদয় ব্যথিত হতো, তখন থেকেই সে লক্ষ্য করেছে বুর্জোয়া সমাজে নারীর অনুন্নত স্থান। আনেৎ দেখেছে দিনের পর দিন তার মাকে দগ্ধ হতে, দেখেছে তাঁকে কক্ষের অভ্যন্তরে নীরব প্রতিবাদে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মান বজায় রাখবার চেষ্টা করতে; বিদুষী আনেৎ-এর পক্ষে সম্ভব হলো না সেই বুর্জোয়া সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে।

আনেৎ-এর প্রেমিক রোজে ব্রিসোর সঙ্গে বিয়ে হবার পাকাপাকি কথার পূর্বে সংশয়ে দোদুলমান আনেৎ তাকে জিজ্ঞেস করল:

"কিন্তু তোমার আনেৎকে নিয়ে ঠিক তুমি কি করতে চাও, বলতো।"
"কেন, আমার অর্ধাঙ্গিনী হবে সে!"
"এই তো! কিন্তু বন্ধু, আমি তো আধখানা নই, আমি যে গোটা মানুষ।"...
"কেন, কি ভাবছো বলতো? কিসের ভয়? আচ্ছা, কথাটা কি?

তুমি আমায় ভালবাস, কেমন? বাস্—এইটেই তো আসল কথা। বাকী আর যা আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না! সে হচ্ছে আমার কাজ, আমি দেখে নেবো'খন। আমি, আমার পরিবার, সব তোমার। আমরা সবাই মিলে এমনভাবে তোমার ব্যবস্থা ক'রে দেবো যে তোমার কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। তোমার চলতেও হবে না। আমরা ঠিক তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাবো।" ("বিমুগ্ধ আত্মা" : দুই বোন, পৃঃ ১৪৩-৪৪)

অনেক প্রলোভন, অনেক মোহনীয় আবেদন সত্ত্বেও আনেৎ শেষ পর্যন্ত দাসত্ব স্বীকার ক'রে নিতে পারল না। তাকে অন্যরা চালিয়ে নিয়ে যাবে, তাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না—এটা তার পক্ষে অসহ্য—সে যে নিজে চলতে চায়! সে রক্ষা করবে তার নিজের সত্তাকে। সে মাথা তুলে দাঁড়াল; বুর্জোয়া ধনী সমাজ পরিত্যাগ ক'রে সে বেরিয়ে পড়ল শিশুপুত্র মার্ককে বুকে নিয়ে জীবিকা, সত্য ও মুক্তির অন্বেষণে, আনেৎএর চরিত্র Ibsenএর *Doll's House*এর নোরার কথা মনে করিয়ে দেয়। আনেৎ শুধু সাধারণ মানুষের মুক্তি-সংগ্রামেরই নয়, ফরাসী দেশের নারীর মুক্তি-সংগ্রামেরও প্রতীক সে। বারবার তাকে পুরুষের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হিংস্র লড়াই করতে হয়েছে।

মরবার পূর্বে ক্রিস্তফ বলেছিল : "আবার নতুন সংগ্রামের জন্যে আমি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করবো।" আনেৎ ও মার্কের মধ্যে ক্রিস্তফের পুনর্জন্ম হলো। যুদ্ধ ঘোষণার সময় থেকে "মা ও ছেলে"র কাহিনী শুরু এবং আনেৎ-এর সংগ্রাম শুরু

যুদ্ধের বিরোধিতায়। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতাই হলো সমাজ-চেতনার দিকে আনেৎ-এর প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু আনেৎ যুদ্ধ-পূর্ব প্রজন্মের মানুষ, ব্যক্তিত্ববাদই ছিল তার জীবন-দর্শন। সে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তার দর্শন তাকে পথ দেখাতে পারছিল না। অনেক সময় তার মনে হতো তার সব প্রচেষ্টাই যেন ব্যর্থ। শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ তার মনে অনেক সময়ে উঁকি ঝুঁকি মারলেও, তাদের সঙ্গে তখন পর্যন্ত তার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি, তাদের সম্বন্ধে তার ধারণা তখনও খুব অস্পষ্ট। সে একা, তার একমাত্র সম্বল তার দুর্দান্ত নৈতিক সাহস ও আপসহীন মনোভাব।

কিন্তু যুদ্ধ-বিরোধী কর্মের দিকে আনেৎ যতই অগ্রসর হয়, ততই তার সমাজ-চেতনার উন্মেষ হতে থাকে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আনেৎ ও মার্ক উভয়েই দেখতে পেয়েছে স্বাদেশীকতার ব্যবসায়ীদের প্রতারণা ও ভণ্ডামী, বুর্জোয়া সমাজের মিথ্যাচার ও অন্তঃসারশূন্যতা। তারা আরও দেখতে পেয়েছে স্বাধীনতার চন্দন-প্রলেপের নীচে কি "ভয়ানক দাসত্ব" লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু তখনও তারা বুঝতে পারছে না শত্রু ঠিক কে, তারা এটাও জানে না যে শত্রু কোথায়, কখন, কি ভাবে আঘাত করবে, তারা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"মা ও ছেলে"র কাহিনী শেষ হলো যুদ্ধ বিরতিতে— "যে সময়ে আনেৎ ও মার্ক উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিল যে-কোনো মুহূর্তে মার্কের যুদ্ধে যাবার ডাক আসবে। এখন যুদ্ধ বিরতির ঘোষণায় সেই দুঃস্বপ্নের শেষ। সেই যুদ্ধ শেষ

হয়ে গেছে। কিন্তু সে (আনেৎ) তো এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। ভীরু সে, নতুন পৃথিবীর স্বাদ গ্রহণ করতে বুঝি তার ভয়।" মানুষের সব থেকে বড় মোহ স্বপ্ন—সবাই স্বপ্নে বিভোর, আনেৎ এবং মার্কও শান্তির স্বপ্ন, সুখের স্বপ্ন দেখে। আনেৎ-এর চোখ ফিরে এল মার্কের দিকে—"তার ছেলে, তার প্রিয় স্বপ্ন!" জীবিতের চোখে আবার পড়ল তার চোখ। তার মুখে হাসি, সে আবার শুয়ে পড়ল—"হাঁ, শীগগিরই আমরা জেগে উঠব।" এইখানেই "মা ও ছেলে"র শেষ।

মৃত্যুর পূর্বে মার্ককে উদ্দেশ ক'রে আনেৎকে জেরমাঁ বলছে :

"…আনেৎ, তুমি তাকে মুক্তির গান শোনাও। সেই বিচ্ছেদের গান, যে দিন সে তোমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাকে আমার নাম ক'রে বোলো, আমার মতো সব কিছু জেনে যেন সে সন্তুষ্ট হয়ে না থাকে আর তোমার মতো যেন সবাইকে ভালো না বাসে। সে নিজে বেছে নিক তার পথ। ন্যায়পরায়ণ হওয়া তো ভালো কিন্তু প্রকৃত ন্যায়বিচার কি শুধু দাঁড়িপাল্লার কাছে বসে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হয়! তাকে বিচার করতে দাও, সে হানুক আঘাত। স্বপ্ন তো যথেষ্ট দেখেছি আমরা, এবার আসুক জাগার পালা।" ("মা ও ছেলে," পৃঃ ২১৬)

বর্তমান বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থাটাকে জানা, তার নগ্ন মূর্তিটাকে দেখা, তার পাশবিক দানবীয় চরিত্রটাকে বুঝতে পারাটাই সব নয়, অনেক পণ্ডিতই তা ভালভাবে জানেন, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে পুরাতন ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে, তার

স্থানে নতুন পৃথিবী গড়তে হবে। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে যে শিশুটি জন্ম গ্রহণ করেছে এইটাই হলো তার মর্ম কথা। ঠিক এই কথাটাই কার্ল মার্কস বহু পূর্বে বলে গিয়েছিলেন— The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point however is to change it—দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু এখন তাকে বদলাতে হবে। এই কথাটাই জেরমাঁর ভবিষ্যতের নির্দেশ। পথের নির্দেশও সে দিয়ে গেল: শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিতকে, নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতকে সবাইকেই ভালবাসা যায় না—বেছে নিতেই হবে। বুর্জোয়া বিমূর্ত মানবতাবাদ ছেড়ে বাস্তব সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের নতুন পৃথিবীর দিকে এই হবে প্রথম পদক্ষেপ।

"বিমুগ্ধ আত্মা"র শেষ খণ্ড "ঘোষণাকারিণী" (*L'Annonciatrice*) রলাঁর সব থেকে পরিণত লেখা। "ঘোষণাকারিণী" দুইভাগে বিভক্ত—"একটি যুগের মৃত্যু" ও "শিশুর আগমন"। কালান্তরের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব রলাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি সেই দ্বন্দ্বের সমাধান ক'রে বলতে পেরেছিলেন: "হে অতীত, বিদায়!" এইটাই রলাঁর জীবনের সব থেকে মহান্ ও গৌরবময় জয়। তিনি ব্যক্তি-মানুষের ও গণমানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাতে পেরেছিলেন। "একটি যুগের মৃত্যু" বুর্জোয়া সমাজের গৌরবহীন মৃত্যু-কাহিনীর ইতিবৃত্ত; এ-সংঘাত সর্বস্তরে, শিল্পে, সাহিত্যে চিন্তায়, কর্মে, সব শ্রেণীতে, সব কিছুতে। "শিশুর আগমন"—

নতুন পৃথিবীর জন্ম, শ্রমিক বিপ্লব, তার জীবনেতিহাস, তার নতুন মূল্যবোধ, নতুন জীবনদর্শন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তারই প্রেক্ষাপটে এ এক মহাকাব্য।

"ঘোষণাকারিণী" লেখা হয়েছে ফ্যাসীবাদ ও ধনতন্ত্র এবং তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। অক্টোপাসের মতো ধনতন্ত্র কি নির্মমভাবে সমগ্র সমাজের রক্তশোষণ করে তা তিমঁর মতো চরিত্রের মাধ্যমে আনেৎ ও মার্কের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সমাজের নিকৃষ্টতম স্তর থেকে আবির্ভূত এই ভুঁইফোঁড়টি সর্বদেশের ধনতন্ত্রেরই প্রতিভূ। তিমঁ সম্পূর্ণরূপে বিবেক দয়ামায়া বর্জিত, কোনো অপকর্মতেই তার বাধে না, তার মুনাফার অঙ্ক বাড়লেই হলো। কি অপূর্ব শিল্পদক্ষতার সঙ্গেই না রলাঁ "একটি যুগের মৃত্যু"র ছবি এঁকেছেন—যে গৌরবভ্রষ্ট যুগের মৃত্যু ঐতিহাসিকভাবেই অনিবার্য। রলাঁর সামাজিক বিকাশের নিয়মের জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও "ঘোষণাকারিণী"তে সর্বত্র পরিস্ফুট। সচেতন পাঠক সর্বসময়ই অনুভব করবে যে ভবিষ্যতের শক্তিই শক্তিশালী হচ্ছে এবং সে-শক্তি শোষকদের আধিপত্য ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হবে না, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপনের ভিত্তি রচনাও ক'রে যাচ্ছে। "জাঁ-ক্রিসতফ"এ ও "বিমুগ্ধ আত্মা"য় বুর্জোয়া জগতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ক্রিসতফও পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছিল কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পায়নি, কারণ সমাজবিকাশের অন্তর্নিহিত ধারার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল

না। "ঘোষণাকারিণী"তে আনেৎ ও মার্কের সমাজ-চেতনার স্তর অনেক অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এটি বারবুসের *Under Fire*-এর মতোই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি উদাহরণ।

এই বাস্তবতা কতকগুলি বাইরের খুঁটিনাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের জীবনের একটা নতুন ক্ষেত্রে—মানুষের চিন্তা ও কর্মের উৎসে—রলাঁ প্রবেশ করতে পেরেছেন। মানুষের চিন্তার ও কর্মের সমগ্র জীবনকে নিয়েই এই বাস্তবতা।

আনেৎকে বহুদিন ধরে "ধনতন্ত্রবাদের জঙ্গলে" ঘুরতে হয়েছিল। তার স্বভাবজাত মর্যাদাবোধ ও তার মহত্ত্বই তাকে এই জঙ্গল অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল। বুর্জোয়া জঙ্গলে আনেৎ-এর চিত্রটি রলাঁর একটি চমৎকার সৃষ্টি। যদি এই খানেই আনেৎ-এর কাহিনী শেষ হতো, তাহলেও তার চরিত্রটি সাহিত্যে অমর হয়ে থাকত কিন্তু এটা শুধু তার ভবিষ্যতের ভূমিকা মাত্র—তার মহৎ জীবনের মহৎ কর্মের প্রস্তুতি। আনেৎ ও মার্ক ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তারা এখন আর একা নয়, শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষ নয়। বহু মানুষ একই আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা নিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তারা একাত্ম বোধ করছে।

আনেৎ-এর অসাধারণ স্নেহযত্ন ও শিক্ষায় মার্ক এখন মানুষ হয়ে উঠেছে। মার্কের যৌবনের ও তার ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের সব দিকগুলিই গভীরতার সঙ্গে দেখান হয়েছে—কোথাও কোনো যান্ত্রিকতা নেই, জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই

সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই বিকাশলাভ করেছে। সামাজিক ন্যায় বিচারের সংগ্রামে সেও তার মা'র মতনই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাকেও বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের বিভ্রান্তিগুলির (illusions) সম্মুখীন হতে হয়েছিল ; তারও প্রধান বাধা ছিল তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, "যুদ্ধের উর্ধ্বে" ইত্যাদি বিভ্রান্তিগুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালের এই বিভ্রান্তিগুলি তাকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল। অন্যদের মতো কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সব বিভ্রান্তিগুলি থেকে তাকে মুক্ত হতে হয়েছিল। তাকেও দ্বৈত ব্যক্তিত্বকে বর্জন ক'রে অখণ্ড ব্যক্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এই ভাবেই মার্ক নৈরাশ্য অতিক্রম ক'রে এসেছিল কর্মোদ্যমে। মার্কের এই ক্রমবিকাশ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে রলাঁ এঁকেছেন।

রলাঁ এইখানে বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের মরুভূমির বিভ্রান্তিগুলি ও তার গোপন উৎস সম্বন্ধে গভীরভাবে বিচার করেছেন। সমাজ-সংগ্রামে এই বিভ্রান্তিগুলিই লেখক, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সর্বস্তরের বুদ্ধীজীবীদের পূর্ণ বিকাশের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। এই সামাজিক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাদের "চরম মুহূর্তের" সম্মুখীন হতে হয়, ভবিষ্যতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় ও তাদের পথ বেছে নিতে হয়।

এই সময়ে ফ্রান্স ছিল বিশ্ব-সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দুও বটে। বিশ্ব-সংস্কৃতির এই পীঠস্থানের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী-প্রতিনিধিদের কালান্তরের মানসিক সংগ্রাম

যেভাবে "বিমুগ্ধ আত্মা"র এই 'ঘোষণাকারিণী' অংশে বিবৃত হয়েছে তা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। (লুই আরাগঁও তাঁর বিখ্যাত সুবৃহৎ উপন্যাস—*Les Communists* এ এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি অনেক স্থলে উত্থাপন করেছেন। অস্তিত্ববাদী সার্ত্র-এর (Sartre) নিকটও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্ন।) চিয়ারেঞ্জা (Bruno Chiarenza) ও জুলিয়াঁ ডাভী (Julien Davy) বুদ্ধিজীবী সমাজের ঋষি (রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ—সকলেই এঁদের মধ্যে প্রতিভাত)।[১] বুর্জোয়া সভ্যতার ধ্বংসে এই ঋষিরা নৈরাশ্যবাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, হতাশার অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে দেন। চিয়ারেঞ্জা মনুষ্য সমাজ পরিত্যাগ ক'রে মধ্য এশিয়ার মরুভূমির মাঝে এক আশ্রমে আত্মার মুক্তির অন্বেষণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শান্তি ও অহিংসবাদ প্রচারের চেষ্টাও করেছিলেন। অবশেষে জনসাধারণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে কিভাবে

---

১ "বিমুগ্ধ আত্মার" ভূমিকায় রলাঁ বলেছেন: "আমি গান্ধী ও লেনিন উভয়কেই সম্মান করতাম—এবং উভয়কেই শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করতাম কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ এমনই ছিল যে তাঁরা নিজেদের মধ্যেই ছিলেন পরস্পরের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদের সংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে—যা মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে—লেনিন ও গান্ধীর দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নিজেকে যোগসূত্র রূপে স্থাপন করবার প্রচেষ্টায়, মার্কের মতো, আমিও নিঃশেষিত হয়েছিলাম।" (Introduction to *L' Ame Enchantee*, 1st January, 1934—"বিমুগ্ধ আত্মা"র ভূমিকা, ১লা জানুয়ারি, ১৯৩৪।)

অতীতের ভাববাদ ও সংশয়বাদের সীমা অতিক্রম ক'রে নিজেদের রূপান্তর ঘটিয়েছেন, নৈরাশ্যবাদ থেকে মুক্ত হয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন, *L' Annonciatrice*-এর মধ্যে বিধৃত এই সামাজিক ও মানসিক প্রক্রিয়া সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে অতুলনীয়। হাইনরিখ মান বলেছিলেন, এঁরা আর মানবতাবাদী ঋষি নন, এঁরা মানবতাবাদী সশস্ত্র যোদ্ধা। মানুষের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থেকে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন মানুষের সীমাহীন মহত্ত্বের ভবিষ্যৎ দিগন্ত। রলাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কঠোর সততাই তাঁকে এই আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রক্রিয়ার সমস্ত দিকগুলি বিচার করতে সক্ষম ক'রে তুলেছিল।

রলাঁ-মানসের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন, তাঁর বুর্জোয়া বিমূর্ত মানবতাবাদ থেকে মূর্ত সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদে উত্তোরণ মসীকৌলিন্যে বিশ্বাসী কোন কোন বনেদী সাহিত্যিক সুনজরে দেখেন নি। ই. এম. ফর্স্টার (যাঁর *Passage to India* ভারতে সুপরিচিত) রলাঁর মৃত্যুর পর বলেছিলেন : "পঁচিশ বৎসর পূর্বে রলাঁকে মনে হয়েছিল টলস্টয়ের সমকক্ষ, তিনি হবেন ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী।" কিন্তু, ফর্স্টারের মতে, রলাঁ তা হতে পারেন নি। (ফর্স্টারের জবাব "শিল্পীর নবজন্মে"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় সরোজ আচার্য ভালভাবেই দিয়েছেন।) ফর্স্টারের নিজের সাহিত্য-কল্পনাই যে টলস্টয়ের যুগের সীমা অতিক্রম ক'রে বর্তমানযুগের তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি, সে-কথাটা ফর্স্টার নিজেই বুঝতে পারেন নি। প্রাচীন পৃথিবীর ব্যক্তিত্ববাদের ধ্যান

ধারণায় যাঁরা এখনও মোহগ্রস্ত তাঁদের পক্ষে রলাঁর "বিমুগ্ধ আত্মা"কে গ্রহণ করা সত্যই কঠিন।[1]

---

[1] আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিকরা কখনই রলাঁকে ক্ষমা করতে পারেননি। তাঁরা হলেন প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক পাদ্রীর দল যাদের কষাঘাত করতে রলাঁ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম থেকে কোনো দিনই ইতস্তত করেননি। এঁদেরই একজন প্রতিনিধি পিয়ের ফালোঁ "শনিবারের চিঠিতে" (বৈশাখ, ১৩৬৪) লিখেছিলেন যে রলাঁ "ফরাসী উপন্যাস-সাহিত্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লেখক বলে পরিচিত।...বাংলা দেশে না আসা পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস পড়বার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিনি।...'জাঁ-ক্রিসৃতফ' যাঁরা পড়েন তাঁরা হয় বিদেশী, নয় অর্ধশিক্ষিত ফরাসী।" পাদ্রী ফালোঁর এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি থেকে দু-একটি কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। "অর্ধশিক্ষিত ফরাসীরা" অর্থাৎ ফরাসী শ্রমিকশ্রণী রলাঁর বই পড়ে এবং রলাঁর বইয়ের হাজার হাজার কপি তাদের মধ্যে প্রতি বৎসর বিক্রি হয়। (একটি প্রশ্ন—শ্রমিক-কৃষকদের অর্ধশিক্ষিত ক'রে রেখেছে কারা? সেই শ্রেণীই নয় কি যার হয়ে ফালোঁ ওকালতি করছেন ও যে-শ্রেণীর সাহিত্য বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করতে সুপারিশ করছেন?) ফালোঁর আরও অনুযোগের কারণ এই যে রলাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস্, জোলা প্রমুখের বই বাঙলায় অনুবাদ হচ্ছে, কিন্তু ধর্মীয় লেখক (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ক্যাথলিক লেখক) পল ক্লোদেল, ফ্রান্সিস্ জাম, মারিয়ঁ নয়েল, জাঁ কেরল, জর্জ বেরনানোস, এমন কি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক প্রভৃতি লেখকদের সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের আগ্রহ নেই। সর্বশেষে ফালোঁ আসল কথায় এসেছেন যে পাশ্চাত্যের জড়বাদকে বাদ দিয়ে "উচ্চতর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত" হতে হবে: "দুইটি দেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে যথার্থ সেতুবন্ধন ও ভাবগত যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হলে ফরাসীতে হিন্দু ঐতিহ্যের যেরূপ অনুবাদ ও চর্চা হয়, সেইরূপ বাঙলায়ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম সাহিত্যের অনুবাদ ও চর্চার প্রয়োজন।" বলা বাহুল্য, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখাই এইসব ধর্মীয়

ফর্স্টারের এই অনুশোচনা মনে করিয়ে দেয় রলাঁর নিজের উক্তি। তিনি লিখেছিলেন :

"১৯১৪ সালে আমি যে স্থানটি হইতে যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম আজ সেই স্থানে আসিয়া তাহারা যদি মনে করে যে, আবার আমাকে খুঁজিয়া পাইবে, তবে তাহারা খুব ভুল করিবে। সেদিন এক অব্যাহত যাত্রার সবেমাত্র সূচনা। এই যাত্রাপথে আমি বহু সংস্কার, বহু মোহ, বহু বন্ধুত্ব পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই যাত্রা আমার আজও শেষ হয় নাই।

"যদি কখনো সময় পাই তবে ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রাপথের সমগ্র কাহিনী বলিব। এ-কাহিনী এমন এক স্বীকারোক্তি যাহার মধ্যে পশ্চিম ইয়োরোপের একটি মুমূর্ষু শ্রেণীর পুরা একটি পুরুষ তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে—অবশ্য যদি এত কাণ্ডের পরও, নিজের মুখের ছবি দেখিবার সাহস তাহার থাকে। এই শ্রেণী বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী। ইহারই শুষ্ক-শীর্ণ ভাবাদর্শকে ধ্বংস করিয়া এক নতুন জগতের শ্যামল সতেজ জীবনতরুকে যাহারা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে আমরা নিজেরাও আছি।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ১২০-২১)

"বিমুগ্ধ আত্মা"তে আমরা এই রলাঁকেই সমগ্রভাবে পাই—তাঁর সারা জীবনের সংগ্রামের পূর্ণ অভিজ্ঞতা, তাঁর অসামান্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা—যা অতীত ও বর্তমান, প্রাচীন,

---

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজে ধর্ম এখন একটি প্রধান হাতিয়ার। আরও লক্ষণীয় এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মধ্যে, এমন কি তাদের ধর্মের মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রাম কতটা তীব্র হয়ে উঠেছে ফালোঁর এই প্রবন্ধটি তার প্রমাণ।

আধুনিক ও ভবিষ্যৎ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সবই আত্মস্থ ক'রে মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিশ্বজনীন ক'রে দেয় ও দূরত্বকে নিকটতর ক'রে তোলে।

ক্রিস্তফ ও আনেৎ কেউই ভুল করেনি, উভয়ই ন্যায়ের জন্য, আদর্শের জন্য আপসহীন ভাবে লড়াই করেছে, উভয়েরই কর্মক্ষেত্র ছিল শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে। উভয়ই গতিশীল, উভয়েরই কথা—'আমি থামিব না।' ক্রিস্তফ সব বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল "আগামী দিনের আলোকে"র দিকে, কিন্তু সে সেখানে পৌঁছুতে পারে নি। তার অনুবর্তী আনেৎ পুরাতন দুনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করতে পেরেছিল এবং পূর্ব গগনে উদীয়মান ঊষার 'রক্তিমাভা দেখতে পেয়েছিল। তাই জাঁ-ক্রিস্তফ ও আনেৎ-এর মধ্যে রয়েছে একটা গুণগত পার্থক্য; যে-স্বাতন্ত্র্য ছিল ব্যক্তিগত, সে-স্বাতন্ত্র্য হলো সমষ্টিগত। তার দীর্ঘ জীবনের সংগ্রামে আনেৎ ক্ষতবিক্ষত; তার একমাত্র পুত্র ফ্যাসিস্টদের হস্তে নিহত কিন্তু তাতেও তার আশাভঙ্গ হয়নি, কারণ দুঃখভোগে সে আর আজ একা নয়। সে আজ "সকলের বিরুদ্ধে একা" (one against all) নয়, সে "সকলের মধ্যে একজন" (one with all)।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আনেৎ যখন তার জীবন-নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল, তখন সে নিজেকে এই ভেবে সুখী অনুভব করল যে এঁটেল কাদায় সে আবদ্ধ হয়ে যায় নি, মরু-ভূমিতে সে তার গতিপথ হারিয়ে ফেলেনি এবং জীবনের জল-

স্রোতের সঙ্গে সে মহাসমুদ্রের দিকে ভেসে যেতে পেরেছিল।

সে ভাবতে লাগল :

"জীবনের গতিপথ নির্ণয় করতে পারাতেই আনন্দ। জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। তার আর সব কিছু, তার লক্ষ্য, নদী নিজেই ঠিক ক'রে নেয় ও সেদিকে নিয়ে যায়। আমাদের শুধু নদীর সঙ্গে মিশে যেতে হবে। কিছুই তখন বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ থাকে না। গতিশীল জীবন।...এগিয়ে চলো। মৃত্যুতেও নদী আমাদের টেনে নিয়ে যায়। মৃত্যুতেও আমরা হব অগ্রণী।"

রলাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল সাহিত্যের বেট্‌হোফেন হওয়া। "জঁা-ক্রিস্‌তফ" ও "বিমুগ্ধ আত্মা" সৃষ্টি ক'রে তিনি তা'ই হয়ে ছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই যে শিল্পক্ষেত্রে তাঁর স্থান মিকেল আঞ্জেলো, বেট্‌হোফেন, বালজাক, উ্যগো, টলস্টয় প্রমুখ জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যেই। "জঁা ক্রিস্‌তফ" ও "বিমুগ্ধ আত্মা"—কালান্তরের এই দুই মহাকাব্য—রলাঁর মহান্‌ প্রতিভারই পরিচয়, যে প্রতিভা রলাঁর বিশ্বের সর্বদিগন্তে বিস্তৃত প্রজ্ঞা ও অসীম মানবতাবোধেরই পরিণতি।

"জঁা-ক্রিস্‌তফ" রলাঁকে বিশ্বব্যাপী সম্মান ও খ্যাতি এনে দিয়েছিল। "বিমুগ্ধ আত্মা" রলাঁর আরও মহত্তর বিজয়, আরও মহান গৌরব।

কালান্তরের পথিক

১

বলা হয়েছে যে "রলাঁ দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, কিন্তু কালকে পারেন নি।"[১] কথাটা ঠিক নয়। তার জবাব রয়েছে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তিতে: "প্রথম ফরাসী বিপ্লব এবং অধুনাতম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই দুইয়ের মধ্যে আপন সংবেদনশীল সর্বগ্রাহী প্রতিভার সহায়ে রলাঁ সেতুবন্ধন ঘটাইয়াছিলেন।" রলাঁ দেশকে যেমন অতিক্রম করেছিলেন, কালকেও তেমনই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের যুগে যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল; জগতের শ্রমিক-শ্রেণী সেই সংগ্রামকে গ্রহণ ক'রে তাকে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে পরিণত করল এবং যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই রুশ দেশে বিপ্লব ঘটল। ইয়োরোপের ভগ্নস্তূপের চতুর্দিকে তাকিয়ে রলাঁ দেখলেন পৃথিবীর অন্ধকার ভেদ ক'রে উত্তর দিগন্তে এক উজ্জ্বল আলোক রশ্মি দেখা যাচ্ছে। রলাঁর ভাষায়:

---

[১] লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর রায়), "বিশ্বভারতী পত্রিকা," ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

"কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে ঘুরেছে—সেই লক্ষ্যের দিকে সোভিয়েতের বীরবিপ্লবীরা, ইয়োরোপের অগ্রণীরা চলতে শুরু করেছেন মানবজাতির সামাজিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য।"

এই দুইটি যুগের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজটি যে সহজ হয় নি এবং রলাঁকে ১৫ বৎসর ধরে যে কী কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কালান্তরের এই চিন্তা ও কর্মসঙ্কটের দ্বন্দ্ব রলাঁর মানসে যেরূপ পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তেমন আর কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় না ; বুদ্ধিজীবীর চিন্তার ইতিহাসে এটি একটি অপূর্ব ঘটনা। সারা জীবনের ধ্যানধারণা বর্জন ক'রে, যুগ যুগের সংস্কার অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ নতুন, এমন কি বিপরীত একটা জীবনদর্শন গ্রহণের এইরূপ দুঃসাহসী উদাহরণ খুব বেশী নেই। এই প্রসঙ্গে রলাঁ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন :

"১৯১৪ সালের পূর্বে আমি রাজনীতিতে যোগ দেই নি। তখন পর্যন্ত আমি সেই যুগের ও আমার শ্রেণীর মতবাদের (ideology) দ্বারাই প্রভাবান্বিত ছিলাম। সেই মতবাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন (মুক্ত বলে অনেকে তাকে দাবি করেন) বিমূর্ত মানুষের মতবাদ ; সে-মতবাদ আমি বর্জন করেছি।" (*I will not Rest, Prologue*)

রলাঁ নিজেই বলেছেন যে বিশ্ব মহাযুদ্ধ তাঁর মনে একটা গভীর, আকস্মিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল—"বহুদিন, বহুমাস ধরিয়া তীব্র অন্তর্দাহের আগুনে পুড়িয়া আমার মধ্যে এক নূতন ব্যক্তিত্ব জন্ম লইল, মৃত অতীত সমাহিত হইল।"

২

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের দেশনায়করা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা "বীরদের জন্য উপযুক্ত জগৎ" (a world fit for heroes) গড়ে দেবেন। বুদ্ধিজীবীরাও এই সুরই গেয়েছিলেন এবং তরুণরাও তাতে বিশ্বাস করেছিল। জয়লাভ করা সত্ত্বেও যুদ্ধের পর তারা দেখল যে সেই 'প্রতিশ্রুতি' ছিল শাসকগোষ্ঠীর একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী। তারাবুঝল যে তারা প্রতারিত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, তাদের আশাভরসা, জীবনদর্শন সবই চুরমার হয়ে গেল, সমস্ত উদ্দীপনা ও প্রেরণা তারা হারিয়ে ফেলল, ধরে থাকার মতো তাদের আর কিছুই রইল না। একটা প্রচণ্ড ব্যর্থতা ও হতাশা তাদের জীবনকে অভিভূত ক'রে ফেলল। এই অবস্থায় বুর্জোয়া সংস্কৃতি চতুর্দিক থেকে ভেঙ্গে পড়তে শুরু করল। ("বিমুগ্ধ আত্মার" ৪র্থ খণ্ড "একটি যুগের মৃত্যু"তে বুর্জোয়া সভ্যতার ভাঙ্গনের এই বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।)

এই পচাগলা জমিতে দাদাইজম, সুররিয়ালিজম, এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ইত্যাদি সতেজ হয়ে উঠতে লাগল। চিন্তাভাবনার প্রধান খোরাক হয়ে দাঁড়াল যৌন প্রবৃত্তি। ফ্রয়েডীয় মনসমীক্ষণে তারা একটা নতুন উত্তেজনা খুঁজে পেল। ফ্রয়েড (Freud), জেমস জয়স (James Joyce), মার্শেল প্রুস্ত (Marcel Proust) হলো তাদের দেবতা। যুদ্ধের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যে নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, তার দিকে তাকাবার তাদের অবসরও ছিল না, শক্তিও ছিল না। আর একদল

লেখক, আঁদ্রে জীদ-এর (Andre´ Gide) মতো, জীবনের রণক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে সিল্কের রমনীয় পর্দার অন্তরালে বসে নন্দনতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমকামের মধ্যেও প্রেমের সূক্ষ্মতা ও শিল্প-মাধুর্য আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হলেন। অন্যধারে, পল ভালেরীর (Paul Valery) মতো, আর একদল লেখক ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়তা-বাদের আফিং-এর মাত্রা চড়িয়ে দিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন। এই জাতীয় নির্জীব স্বপ্নালু মানুষগুলো বন্ধ্যাভূমিতে (Waste Land) ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

৩

বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই ভাঙ্গনের যুগে রলাঁকেও এক মহা আত্মিক-সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হলো। "যুদ্ধের উর্ধ্বে" ছিল রলাঁর নৈতিক আত্মরক্ষা মাত্র। "ক্রিস্তফ কোনো মতে পলাইয়া গিয়া 'যুদ্ধের উর্ধ্বে' কোথাও লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৭০)। যে বুর্জোয়া আদর্শবাদ ও মানবতাবাদ নিয়ে রলাঁ এতদিন ধরে সংগ্রাম ক'রে এসেছেন, তারও শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটল বিশ্ব-যুদ্ধে।

এই অবস্থায় দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট যে প্রশ্ন, রলাঁর নিকটও সেই প্রশ্ন—কোন্ পথ? আপসহীন অক্লান্ত সংগ্রামী রলাঁ জীবনে বহুবার ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু কোনোদিনই পরাজয় স্বীকার ক'রে নেননি, পথ চলতে চলতে

কোনোদিনই থেমে যাননি। রলাঁর জীবনের ও তাঁর শিল্প স্থষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ছিলেন চির চলমান।

বুর্জোয়া সংস্কৃতির যুগে রলাঁর মানসপ্রকৃতি গঠিত হয়েছিল, তাই তিনি যে জীবনদর্শন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা ছিল ভাববাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বিমূর্ত মানবতাবাদ। এবং এই দর্শনই "জাঁ-ক্রিসতফ" পর্যন্ত তাঁর সমস্ত রচনাতে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় এই যে, ব্যক্তিত্ববাদের সীমানার মধ্যেও শিল্পচিন্তার আদি থেকেই তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকাগ্রহণ। "শিল্পের জন্যই শিল্প" এই প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেই রলাঁ সাহিত্যের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৯০সালে রলাঁ মালভিদাকে লিখেছিলেন:

"যে-শিল্প কেবলমাত্র সুখী ব্যক্তিদের জন্য, আমার মতে তা হচ্ছে একটা অত্যন্ত প্রলোভনীয় আত্মসর্বস্বতা। আমি মনে করি যে, প্রকৃতির মতো, শিল্পও সকল শ্রেণীর ও সকল মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে।"

১৯১৪ সাল পর্যন্ত রলাঁর নাটক, "বীর জীবনীমালা" সিরিজের বইগুলি, "জাঁ ক্রিস্তফ" ইত্যাদি সব রচনাগুলিরই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'এলিত'দের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা। এই আস্থার মূল উৎস ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ববাদী দর্শন। রলাঁর মতে এই বিশ্বাসই মানুষের সার্বজনীন ধর্ম; তিনি আর কোনো ধর্ম বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস করতেন না। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের তৎকালীন নৈরাশ্য ও অবিশ্বাসের যুগে তাঁর লেখাগুলি ছিল প্রতিষেধক, উদ্দীপনাময় ও প্রগতিশীল। কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে,

কিরূপ বিশ্বাস—ধর্মবিশ্বাস, না রাজনীতিতে বিশ্বাস, না বিপ্লবে বিশ্বাস—যে-বিশ্বাস মানুষকে সেই দিনকার অন্ধকারে পথ দেখাতে পারে—সে-সম্বন্ধে রলাঁ তখনও চিন্তা করেন নি।

ড্রেফুসের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে লেখা "নেকড়ে"তে রলাঁ অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলেছেন—প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থা—যে সমাজ-ব্যবস্থা এইরূপ অবিচার ঘটায়—তার বিরুদ্ধে নয়। *Tragedies of the Revolution*-এ একথাও আছে যে অবিচার শুধু প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতেই নয়, বিপ্লবী বাহিনীতেও ঘটতে পারে।

যে রলাঁ 'এলিতে' বিশ্বাসী, সেই রলাঁই তাঁর "১৪ই জুলাই"তে আবিষ্কার করলেন জনগণের দুর্দমনীয় শক্তি; কোনো 'এলিত' এ নাটকে নেই, জনগণই তার হীরো। "একটা জাতির স্বাধীনতা লাভের জন্য এইটাই যথেষ্ট যে সে-জাতি তা চায়"—ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা লাফাইয়েৎ-এর (Lafayette) এই উক্তিই হলো এই নাটকের মূল বক্তব্য।

কিন্তু জনগণের প্রতি রলাঁর এই বিশ্বাস তখনও অস্পষ্ট এবং অলৌকিক। "মিকেল আঞ্জেলোর" ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন:

"আমি মনে করি না যে এই শীর্ষস্থানে বীরদের সান্নিধ্যে সর্বসাধারণ বাঁচতে পারে। কিন্তু সারা বৎসরে অন্তত একটা দিন তারা এই তীর্থে উঠে আসবে। সেখানে এসে তারা তাদের শিরার রক্ত ও বায়ুকোষের নিঃশ্বাস পুনরায় পূর্ণ ক'রে নেবে। সেখানে তারা অনন্তের সংস্পর্শেও আসবে। তারপর সিক্ত

হৃদয়ে প্রাত্যহিক সংগ্রামের জন্য তারা আবার জীবনের সমতলভূমিতে নেবে আসবে।”

“১৪ই জুলাই”-তেও শ্রমিকদের সম্বন্ধে রলাঁর ধারণা কতকটা অস্পষ্ট কতকটা অলৌকিক, যেমন :

শ্রমিক : (বাস্তী কারাদুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে) এটা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ কিছুই করা যাবে না। এটাকেই সবার আগে ধ্বংস করতে হবে।

বুর্জোয়া : কি ক'রে ?

শ্রমিক : জানি না ; কিন্তু তা'ই করতে হবে।

সকলে : (চিন্তিতভাবে ও অবিশ্বাসের সঙ্গে)বাস্তী ধ্বংস করতে হবে ?

“১৪ই জুলাই”এর আর-একস্থানে—(বাস্তী আক্রমণ করবার জন্য জনগণ সমবেত হচ্ছে)

হুলাঁ : ওদের সকলকেই মেরে ফেলবে। এ রকম কাজের কোনো অর্থ হয় না।

হস্ : আরে কোথায় যাচ্ছিস।

হুলাঁ : কেন, ওদের সঙ্গে।

হস্ : তোর সহজ প্রবৃত্তি (*instinct*) দেখছি তোর মাথা থেকে ভাল।

এখন পর্যন্ত রলাঁর জনগণ ব্যক্তি-মানুষেরই সমষ্টি মাত্র, সামাজিক মানুষ নয়, এবং এই ব্যক্তি-মানুষ তার স্বতঃ সঞ্জাত প্রবৃত্তির বশেই বিপ্লব ঘটাচ্ছে, বুদ্ধি বা চেতনা দিয়ে ততটা নয়। জনগণের যে একটা স্বভাবসিদ্ধ বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি আছে তা নিঃসন্দেহ কিন্তু তার সঙ্গে যদি বুদ্ধি ও সমাজ-চেতনা যুক্ত না হয়, তা'হলে কি বিপ্লব ঘটতে পারে ? —এ প্রশ্ন তখনও রলাঁর নিকট ওঠেনি।

রলাঁ তাঁর *People's Theatre*এ লিখেছিলেন :

"আমাদের নিরপেক্ষ (disinterested) শিল্প হচ্ছে প্রাচীনদের জন্য। ...শিল্প কখনো যুগের আশাআকাঙ্ক্ষা থেকে পৃথক থাকতে পারে না।"

গণনাট্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বললেন :

"শিল্পে তাজা রক্ত সঞ্চারণ করতে হবে ও জনগণের শক্তি ও স্বাস্থ্য দিয়ে তার সঙ্কীর্ণ বক্ষকে প্রসারিত করতে হবে।"

শিল্প হবে জনগণের জন্য, আর জনগণ হবে শিল্পের জন্য—এই মহৎ প্রগতিবাদী বৈপ্লবিক চিন্তা সেই যুগে রলাঁর মনেই এসেছিল, আর কারও মনে নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে রলাঁর ব্যক্তিত্ববাদী ও আদর্শবাদী দর্শন তাঁকে পশ্চাৎদিকে টেনে রাখছে, সম্মুখের দিকে খুব বেশী অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

শিল্প হবে জনগণের জন্য, আর জনগণ হবে শিল্পের জন্য—কিন্তু রলাঁ আরও বললেন যে, এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জনগণ হবে মুক্ত। কিসের থেকে মুক্ত? দাসত্ব থেকে, কুসংস্কার থেকে ও সর্বোপরি উগ্র-মতবাদ (fanaticism) থেকে।

"আপনারা কি জনগণের শিল্প চান? তাহলে প্রথমেই আপনাদের জনগণকে চাইতে হবে—সেই জনগণ যাদের এই শিল্প ব্যবহার করার মতো মন যথেষ্ট মুক্ত। সেই জনগণ যার কিছু অবসর আছে, দুঃখদৈন্য, অতিপরিশ্রম যাদের একেবারে নিষ্পেষিত ক'রে দেয় নি, যে জনসাধারণ কুসংস্কার এবং বামের বা দক্ষিণের উগ্র মতবাদের দ্বারা পশুবৎ হয়ে যায় নি, যারা নিজেরাই নিজেদের প্রভু এবং যারা বর্তমান সংগ্রামে বিজয়ী।"

এই সময়কার রলাঁর মতে মুক্তির অর্থ হচ্ছে কোনো উগ্র-মতবাদ (fanaticism) অর্থাৎ থিওরী, দর্শন, বাম অথবা দক্ষিণদলীয় রাজনীতি থেকে মুক্তি। তাছাড়া আগে জনগণকে মুক্ত হতে হবে, তবেই তারা শিল্প ব্যবহার করতে পারবে। ভাববাদী, ব্যক্তিবাদী দর্শনের, তা যত শ্রেষ্ঠই হোক, তার সীমাবদ্ধতা এইখানেই। তা সর্বদাই গাড়ীটাকে আগে রেখে, ঘোড়াটাকে দেয় পিছনে জুঁতে—তাই বুর্জোয়া দর্শনের রথ হয়ে পড়ে অচল। এর প্রায় ৩০ বৎসর পর যুদ্ধোত্তর তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যখন রলাঁ বুর্জোয়া ভাববাদ ও ব্যক্তিত্ববাদ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং গান্ধীর সঙ্গে **সা**ক্ষাৎকালে গান্ধী যখন আদর্শ জনগণের কথা তুলেছিলেন তখন রলাঁই গান্ধীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আদর্শ জনগণকে রেডি-মেড অবস্থায় পাওয়া যায় না।

"১৪ই জুলাই"-এর ভূমিকায় রলাঁ বলেছিলেন: "কর্মের দৃশ্য থেকেই আসে কর্মের প্রেরণা।" রলাঁর নিকট কর্মসাধনাই হচ্ছে চিন্তার উৎস। In Anfang war die Tat (প্রারম্ভে কর্ম ছিল)—গোয়েথের এই বিখ্যাত উক্তি রলাঁরও কথা। জাঁ-ক্রিস্তফ কর্মে উন্মাদ। তাঁর ব্রইঞ বলছে: "কর্মের বাইরে সবই মিথ্যা। কেবলমাত্র কর্মই মিথ্যা বলে না।" কিন্তু Barres ও Maurasও তো কর্মই চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দ, মুসোলিনি হিটলার, মার্কস–লেনিনও। পরবর্তী কালে রলাঁ শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় নিজেই এ প্রশ্নের সমাধান করতে

পেরেছিলেন ; সমাজে পরিবর্তন ঘটানো, সমাজকে বদলানো, সমাজবিপ্লব এইটাই কর্ম :

"যে স্নায়ুবিক অবসাদ ও নৈরাশ্যের যুগে আমার যৌবন কাটিয়াছে সেযুগে এ (কর্ম) বড় সহজ কথা ছিল না। কিন্তু ইহাই তো যথেষ্ট ছিল না। রঙ্গমঞ্চে যে গায়কেরা গাহিতে থাকে 'চল আমরা যাই' অথচ কিছুতেই যায় না—ইহাও যেন তাই, কারণ কোথায় যাইবে তাহা জানা ছিল না।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৬৯)

"মিকেল আঞ্জেলো" "বেট্‌হোফেন," "টলস্টয়" ইত্যাদি বীর জীবনীমালা সিরিজের বইগুলিতে এবং "জাঁ-ক্রিস্‌তফ"-এ (যাতে এঁরা সকলেই আছেন এবং আছেন রলাঁ নিজেও) ব্যক্তিত্ববাদের দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এই সবগুলি লেখার মধ্যেই রলাঁর ভাববাদী চিন্তার বৈপরীত্য সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর *I will not Rest* এ বলেছেন :

"জাঁ-ক্রিস্‌তফ ও অলিভিয়ে উভয়কেই রাজনৈতিক ও সামাজিক হাটের মধ্য দিয়ে লড়াই ক'রে তাদের জীবনের পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়েছে, ঘুষির বদলে ঘুষি দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই দিনে, তাদের স্রষ্টার মতোই তাদের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল—এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে স্বপ্নরাজ্যে আশ্রয় নেওয়া : *Mein Reich ist in der Luft*—আমার রাজ্য আকাশে, মুক্ত বায়ুমণ্ডলে, শিল্পের স্বপ্নে।"

ক্রিস্‌তফ ও অলিভিয়ে কেউই পলায়নপর নয়, তারা কেউই জীবন-সংগ্রামকে এড়িয়ে যেতে চায় না। তারা সৃজনী-

প্রতিভা, শক্তি, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, চিন্তা ও কর্মের নিদর্শন। (বিবেকানন্দের মধ্যেও রলাঁ এই শক্তিই দেখেছিলেন।) তারা উভয়েই কর্মক্ষেত্রে বীর যোদ্ধা; একেবারে আপসহীন দুর্দান্ত যোদ্ধা। নীচতা, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তারা চির বিদ্রোহী; কোনো অন্যায় অবিচারের নিকট তারা মাথা নোয়ায় না। কিন্তু তারা দু'জনই ছিল বিচ্ছিন্ন সৈনিক—যারা সংগ্রামী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় নি। তাদের লড়াই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক —of one against all—সকলের বিরুদ্ধে একজনের লড়াই। তারা এত লড়াই করেও সমাজকে এতটুকু বদলাতে সক্ষম হয় নি। এ লড়াইয়ের দুর্বলতা লুকিয়ে ছিল তাদের স্রষ্টার মতোই তাদের বুর্জোয়া-ব্যক্তিত্ববাদী দর্শনের মধ্যে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক কর্ম, জনগণের যৌথ বীরত্ব। এই সমাজ-দর্শন তখনও জাঁ-ক্রিস্তফের মনে দানা বাঁধে নি।

জাঁ-ক্রিস্তফের জন্ম শ্রমিকের ঘরে; বাল্যকাল থেকেই তাকে সামাজিক অসাম্য ও নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন তার ৬ বৎসর বয়স, তার সমবয়সী দুটি ধনী ছেলে তাকে লক্ষ্য ক'রে তুচ্ছতাচ্ছিল্যতার সঙ্গে বলল: "দরিদ্র ছেলেটা"! রাগে ক্রিসতফের গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল, চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করতে চাইল। কেবল বলতে পারল—আমি মেলসিয়র ক্রাফটের ছেলে, আমার মা'র নাম লুইজা, রাধুনীর কাজ করেন। ক্রিস্তফ জানত না সে কোন্ সমাজে বাস করে—সে ভেবেছিল একজন রাধুনী বা মিস্ত্রী যে কোনো উপাধিধারীর

সমান। কিন্তু সারাজীবন আপসহীন লড়াই করেও সে সামাজিক অসাম্য দূর করার কোনো পথ খুঁজে পায়নি।

জাঁ-ক্রিসতফের জীবনেই শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সে-সংগ্রাম থেকেও সে নিজেকে দূরে রাখতে চায় না। মে-দিবসে শ্রমিকদের একটা মিছিলে সে যোগ দিল এবং তাদের নেতা হলো। কিন্তু তাদের সঙ্গে সে একাত্ম বোধ করতে পারল না, তাদের আদর্শকে সে তার নিজের ক'রে নিতে পারল না। তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাংগ্রাম সাধারণ মানুষের দুনিয়াব্যাপী সমষ্টিগত সংগ্রামের সঙ্গে মিশতে পারছে না। ক্রিস্তফ তার বিবেকের নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতে রাজী নয়। ব্যক্তিত্ববাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে সে চলে গিয়ে সে তার আত্মাকে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের বিশুদ্ধ বায়ুতে তুলে নিয়ে যায়, মনে করে সেই সোহহম্। কিন্তু তার এই বীর আত্মার পরম শত্রুদের তখনও সে চিনতে পারে নি।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর, যাত্রা-শেষে, জাঁ-ক্রিস্তফের মনে হয়েছিল যে তার মহান্ স্বপ্ন—মহামানবের মহান্ ঐক্যতান, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিক শান্তি—বুঝি বা সফল হতে চলেছে। কিন্তু সে বুঝতে পারে নি যে, মহামানবের পরম শত্রু সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস না করলে তার জগৎব্যাপী সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হতে পারে না। এক মূহূর্তে সেই সাম্রাজ্যবাদীরা তার স্বপ্নরাজ্য ভেঙে চুরমার ক'রে দিল। সেই ধ্বংসস্তূপে তার ব্যক্তিত্ববাদ, তার সোহহম, তার পুরাতন জগৎ সব কিছু চাপা পড়ে গেল।

"জাঁ-ক্রিস্তফ" রলাঁকে যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তারই ফল আহরণ ক'রে তিনি সারা জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কালান্তরের পথিক রম্যাঁ রলাঁর জন্য আরাম-কেদারার সুখ স্বপ্ন নয়। মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়েই নতুন পৃথিবী জন্মলাভ করবে, সেখানে জাঁ-ক্রিস্তফের পুনর্জন্ম হবে, রলাঁকে সেই নতুন পৃথিবীর নতুন জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

মৃত্যুশয্যায় জাঁ-ক্রিস্তফ বলছে: "নতুন সংগ্রামের জন্যে আমি আবার জন্মগ্রহণ করব।" যে শিশুটিকে কাঁধে ক'রে ক্রিস্তফরুস গভীর রজনীর অন্ধকারে নদী পার হচ্ছিল, সেই শিশুটি বলল ("জাঁ-ক্রিস্তফ"এর শেষ লাইন) "সে-দিন শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করবে, আমিই সেই দিন।"

রলাঁর বিশ্বপ্রেমের, মানবপ্রেমের আদর্শের অগ্নি-পরীক্ষার দিন এল ১৯১৪ সালে। সে-পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। অন্যান্যদের মতো তিনি নিজেকে উগ্র স্বদেশপ্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন না। "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" উঠে সকলকে আহ্বান জানালেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। বহু নির্যাতন ও দুর্নাম সত্ত্বেও পাঁচ বৎসর ধরে প্রায় এককভাবে তিনি লড়ে গেলেন।[১] কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর আবেদন,—লেনিনের মতো

১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ফ্রান্সের এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস যিনি ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং আঁদ্রে জীদ তখন উগ্র স্বদেশ প্রেমিক—তাঁরা সকলেই রলাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে নিন্দা করেছিলেন। আনাতোল ফ্রাঁস কমিউনিস্ট পত্রিকা *L' Humanite*-তে

শ্রমিকশ্রেণীর নিকট নয়, সমাজ-বিপ্লবের জন্যে নয়—সেই 'এলিত,' সেই বুদ্ধিজীবীদের নিকট যারা তাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যাদের নৈতিক অপদার্থতা রল াঁর কাছে ও জগতের কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

৪

১৯১৭ সালে যখন রুশিয়ায় বিপ্লব ঘটল, ১লা মে'তে তাকে অভিনন্দিত ক'রে রলাঁ বাণী পাঠালেন :

"রুশ ভাইয়েরা, তোমরা যে মহান্ বিপ্লব ঘটিয়েছ, আমরা তার জন্য তোমাদের শুধু অভিনন্দনই জানাচ্ছি না, তার জন্য ধন্যবাদও দিচ্ছি। তোমরা যে মুক্তির বিজয় পতাকা ওড়ালে, তার দ্বারা তোমরা শুধু নিজেদের মুক্তির পথই খুলে দিলে না, তোমাদের পুরাতন পশ্চিমের ভাইদের পথও পরিষ্কার ক'রে দিলে।"

কিন্তু রুশিয়ার এই বুর্জোয়া বিপ্লব সম্বন্ধে রলাঁর অনেক সংশয়ও থেকে গেল। মে মাসেই "টলস্টয় : মুক্ত মন" নামক এক প্রবন্ধে তিনি টলস্টয়ের এই উক্তি সমর্থন করলেন :

"যতক্ষণ পর্যন্ত একটা বাইরের ক্ষমতা আমাদের পরিচালনা করবে—সে-ক্ষমতা মোজেস বা খ্রীষ্টেরই হোক আর মহম্মদেরই হোক অথবা সমাজতান্ত্রিক মার্কসরেই হোক, আমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার শেষ হবে না!"

১৯১৯ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন এবং ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এই কারণে তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটিয়েছিল। সেই সময়ে রলাঁই আনাতোল ফ্রাঁসের সুনাম রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন।

রলাঁ এই উক্তির সমর্থনে আরও বললেন :

"যে দুঃসাহসী ব্যক্তিরা শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছেন, তাঁরা আবার নতুন শৃঙ্খল তৈরি করছেন।"

যদিও এ আক্রমণ সুবিধাবাদী কেরেন্সস্কি সরকারের বিরুদ্ধে, তবু তিনি মার্কসবাদকে সুবিধাবাদের সঙ্গে একাকার ক'রে ফেললেন। তাছাড়া, রাজনৈতিক কর্ম সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেল।

বলশেভিক বিপ্লবের এক বৎসর পরের লেখা "ক্লেরাম্বো"তেও (*Clerambault* যার নাম তিনি প্রথম দিয়েছিলেন *One Against All*) রলাঁর কথা হলো বিপ্লব অনিবার্য, কিন্তু তাকে সন্দেহের চক্ষেও দেখতে হবে :

"বিপ্লব কেন হলো। ক্লেরাম্বো বুঝতে পারলেন, এবং এটাও বুঝলেন যে এ তো অনিবার্য। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি তাকে ভালবাসলেন।...তাঁর মতে কোনো নিষ্ঠুর শাসনই (Tyranny) ভালবাসার অধিকার দাবী করতে পারে না।"

রঁলা তখনও বিপ্লবকে ব্যক্তিত্ববাদের মাপকাঠি দিয়ে নিরপেক্ষভাবে উভয় দিক থেকে বিচার করবার চেষ্টা করছেন।

"বিপ্লবীদের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় তারা ভুল করেনি। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ নয়। তার সংগ্রাম আরও অনেক বেশী বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে; তাকে একটা সঙ্কীর্ণ সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখা চলে না।"

কিন্তু আবার ঐ একই পৃষ্ঠায় ক্লেরাম্বোর চিন্তা সম্বন্ধে রলাঁ বলছেন যে তা হচ্ছে "অত্যধিক অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট!"

৫

বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচনশীলতা (eclecticism) অর্থাৎ কোনো একটা বিশিষ্ট মতবাদ বা কর্মপন্থা গ্রহণে অনিচ্ছা, বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটানো, সব বিষয়ের সব দিক বিচার ক'রে দেখা। আপাতদৃষ্টিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী ন্যায়সংগত বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় ও সঙ্কটমুহূর্তে এই দর্শন দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা, অসঙ্গতি ও সুবিধাবাদেরই সৃষ্টি করে এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। যাঁরা কোনো একটা মতবাদ নিয়ে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকেন তাঁদের চেয়ে ইক্‌লেক্‌টিক্‌রা নিজেদের বশী বিজ্ঞ বলে মনে করেন এবং কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে তাঁরা নির্বিচারে সকলেরই দোষ ধরবার অধিকার দাবী করেন।

রলাঁ ১৯১৮ সালে তাঁর প্রবন্ধ এম্পেডোক্‌লেস্‌ (*Empedocles*-এ)[১] লিখেছিলেন যে, মানুষ যে-সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে তাতে তাকে কোনো একটা বিশিষ্ট মতবাদ রক্ষা করতে পারবে না— "চিন্তার প্রয়োজন, আংশিক সত্য নয় মহৎ কল্পনা যা বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্মবিশ্বাস, স্বপ্ন, শক্তি, তন্ময়তা ও কর্মসাধনা কিছুই বাদ দেয় না, বরং সবগুলিরই সামঞ্জস্য বিধান করে।" রলাঁ

১ এম্পেডোক্‌লেস ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন দার্শনিক, যিনি পৃথিবীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ছিলেন বস্তুবাদী, কিন্তু যে শক্তি পৃথিবীকে পরিচালিত করে সে-সম্বন্ধে ছিলেন ভাববাদী। তিনি বলেছিলেন যে, যে দুটি শক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত করে তা হলো—প্রেম ও বিদ্বেষ।

আরও বললেন, চিন্তা হলো "সহস্র আনন হিন্দু দেবদেবীর মতো —তার সমস্ত বিভিন্নরূপ ও বৈপরীত্য হচ্ছে একই বিশ্বাসের সামঞ্জস্য"। "জাঁ-ক্রিসৃতফ"-এর সমাপ্তিতে রলাঁ বলেছিলেন : "সামঞ্জস্য—প্রেম ও বিদ্বেষের মহৎ পরিণয়। এই দুই প্রবল পক্ষ-বিশিষ্ট ঈশ্বরের নাম আমি গাইব! জয়তু জীবন, জয়তু মৃত্যু।" এপর্যন্ত রলাঁ একটা মহৎ আদর্শে প্রণোদিত হয়ে নানা প্রকার বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেরই চেষ্টা ক'রে এসেছেন—মস্তিষ্ক ও হৃদয়, যুক্তিবাদ ও অলৌকিকতা, ফ্রান্স ও জার্মানী—এবং যুদ্ধের পরে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, গান্ধী ও লেনিন।

এরূপ প্রচেষ্টায় রলাঁর সততা ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা সকলেই রলাঁ নন। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বুদ্ধিজীবীদের দুই পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর মধ্যবর্তী অবস্থানের ফলে এই ইক্‌লেক্‌টিক্ দর্শন তাঁদের খুব সহায়ক হয়। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের চরম মুহূর্তে যখন দুই দিক থেকেই গোলাগুলি তাঁদের মাথার উপর দিয়ে চলতে শুরু করে, তখন নিরপেক্ষ বিচারকের আসনে বসে নিজেদের ও অন্যদের আর প্রতারণা করার বিশেষ সুযোগ থাকে না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের একটা বড় অংশ ধনশক্তির সঙ্গেই যোগ দিয়ে প্রগতি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করেন—আর তাঁদের মধ্যের শ্রেষ্ঠ অংশটি, যাঁরা সৎ ও যাঁদের নৈতিক সাহস আছে, তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে যান, যেমন হয়েছিলেন রলাঁ ও আরও অনেকে!

কিন্তু আপাতত এই ইক্‌লেক্‌টিক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী যা একদিন রলাঁকে নিয়ে গিয়েছিল 'এলিত'দের দিকে, আজ তাঁকে নিয়ে গেল গান্ধীবাদের দিকে। "রামকৃষ্ণ," "বিবেকানন্দের" ক্ষেত্রেও তাই। এই দর্শনই তাঁকে আবার উদ্বুদ্ধ করল বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বানে (Declaration of Independence of Mind) এবং সর্বশেষে তাঁকে নিয়ে গেল আঁরি বারবুসের সঙ্গে "লক্ষ্য ও পন্থা"র (Ends and Means) বিতর্কে।

বিপ্লবের অনিবার্যতা স্বীকার ক'রে নিলেও বিপ্লবের নিষ্ঠুরতা রলাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। হিংসা তাঁর নিকট অসহ্য। কিন্তু বিপ্লবও তো চাই। হিংসা বাদ দিয়ে কি বিপ্লব আনা যায় না? তাই রলাঁ তাঁর ঐকান্তিক সততার দ্বারা গান্ধীবাদকে আঁকড়ে ধরলেন—হয়তো গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংসার দ্বারা বিপ্লব সম্ভব হবে। দশ বৎসর ধরে—১৯১৯ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত—রলাঁর মধ্যে চলল এক প্রচণ্ড অন্তর্বিরোধ, বিপ্লব ও অহিংসার পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ, কঠোর আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-সমালোচনা—এক ধারে পুরাতন পৃথিবীর ভাববাদী মোহ, ধ্যান-ধারণা ও জরাজীর্ণ সংস্কার, অন্য ধারে নবজাত নতুন পৃথিবী, তার চিন্তা-ভাবনা ও জীবন-মরণের সংগ্রাম। নতুন সত্য আবিষ্কার করা সত্ত্বেও এই ইক্‌লেকটিক্‌ ও ব্যক্তিত্ববাদী দর্শনই বর্তমানে রলাঁর অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। লেনিন ও গান্ধী, আগুন আর জলে মিলন সাধনের স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও রলাঁ সেই কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গান্ধীবাদের সাহায্যেই রলাঁ ইচ্ছা করলে তাঁর জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন—তাতে ক'রে সব উচ্চাদর্শের সব-রকম কথাই তিনি বলতে পারতেন—বিশ্বপ্রেম, মানবপ্রেম, অহিংসা, আধ্যাত্মবাদ, গণতন্ত্র, এমনকি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদও—যা অনেক মহাপুরুষই বলে থাকেন। কিন্তু রলাঁর পক্ষে তাও সম্ভব হলো না। তাঁর সততা, নৈতিক-চেতনা ও চিন্তার সাহস তাঁকে থেমে থাকতে দিল না। রলাঁ তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে কোনদিন আপস করেন নি অথবা লোভ বা দুর্বলতার নিকট মাথা নোয়াননি। এই একনিষ্ঠ সততাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত ইলেক্‌টিসিজমের সুবিধাবাদ থেকে রক্ষা করেছিল। বস্তুতপক্ষে রলাঁর সততা ও চিন্তার দুঃসাহস বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সততা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা রলাঁ ১০—১৫ বৎসর ধরে কি ভাবে গান্ধীবাদের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ চালিয়েছিলেন এবং কি ভাবে শেষ পর্যন্ত গান্ধীবাদ থেকে নিজেকে মোহমুক্ত করতে পেরেছিলেন সেবিষয় পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৬

রলাঁর বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে সমাজতান্ত্রিক মানবতা-বাদে রূপান্তরে ম্যাক্সিম গর্কীর যথেষ্ট অবদান ছিল। যুদ্ধের সময় থেকেই এই দুই মনীষীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। পুরাতন ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তার বিবেক রমাঁ্যা রলাঁ, আর নবজাত প্রলেতারীয় সংস্কৃতির

শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ম্যাক্সিম গর্কী—এই দুই জনের বন্ধুত্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি অপূর্ব ঘটনা।

গর্কী প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে পুরাতন দুনিয়ার সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহকে অতি সতর্কতা ও সহানুভূতিশীলতার দ্বারা পরিচালনার প্রয়োজন। রলাঁর সর্বপ্রধান বাধা ছিল তাঁর টলস্টয়বাদ ও গান্ধীবাদের প্রতি মোহ। প্রথমেই গর্কীকে সে-বাধা অপসারণ করার জন্যে সচেষ্ট হতে হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত গর্কী তাতে সফলও হয়েছিলেন। সেই সময়ে লেনিনের চিন্তা সম্বন্ধে রাজনীতির বাইরের ইয়োরোপীয়রা বিশেষ পরিচিত ছিলেন নি। গর্কীই লেনিনবাদের সঙ্গে রলাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনো সংস্কৃতি যে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে নয়, প্রতিটি বুর্জোয়া সংস্কৃতিতেই যে দুইটি বিরোধী সংস্কৃতি রয়েছে—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই তত্ত্বও রলাঁ গর্কীর সাহায্যেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই রলাঁর চিন্তাজগতে লেনিন একটা বড় আসন অধিকার ক'রে বসলেন। লেনিন ও টলস্টয়ের যে চিত্র গর্কী এঁকেছিলেন রলাঁর মতে তা-ই ছিল শ্রেষ্ঠ।

যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ইয়োরোপে শ্রমিক বিপ্লবের যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, জার্মানীতে সেই বিপ্লব দমন করার জন্য সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতারা কাইজারের সামরিক অফিসারদের সাহায্যে ও মিত্রশক্তিবর্গের সমর্থনে ১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৯এ জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ, কার্ল লীবক্লেট ও আরও প্রায় ১০০ জনকে যেভাবে

নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, রলাঁ তার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে লিখেছিলেন যে, "ধনতান্ত্রিক স্বার্থরক্ষায় তারা (মিত্র শক্তিবর্গ) এতই অন্ধ হয়ে উঠেছে যে এই সব জাতীয়তা-বাদীদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে যেটুকু আগ্রহ থাকা উচিত তাতেও তারা উদাসীন হয়ে পড়েছে।" ভবিষ্যৎ ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধের বীজ যে এইখানেই রোপিত হলো সে-সম্বন্ধেও রলাঁ সকলকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। রলাঁ শ্রমিকশ্রেণীকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন যে, যখন তাদেরই সোসিয়ালিস্ট নেতারা বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের হত্যা করতে পারে, তখন তাদের অদৃষ্টে আরও অনেক কঠোর সংগ্রাম ও দুঃখভোগ আছে।

১৯১৯এ যখন সাম্রাজ্যবাদী মিত্রশক্তিবর্গ শ্রমিক বিপ্লবকে আঁতুড়ে বধ করবার জন্য খাদ্য অবরোধ করল ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন বজ্রকণ্ঠে রলাঁ প্রতিবাদ করলেন। সেই প্রসঙ্গে রলাঁ বলেছিলেন:

"অধিকতর ন্যায়সঙ্গত মানবিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনের জন্য মানুষের মনে যে অনন্ত পিপাসা রহিয়াছে তাহাকে দমন করা যাইবে না। সে আকাঙ্ক্ষার শিখাকে হাজার বার নিভাইয়া দিলেও, একাধিক হাজার বার সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে।"

৭

১৯২১—২৩এ রলাঁর সঙ্গে আঁরি বারবুসের হিংসা-অহিংসা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিপ্লব ইত্যাদি প্রশ্নের উপর যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছিল সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই সময়কার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্বলতা বশতঃ রলাঁ কোনো কোনো সময় চক্রান্তকারীদের ফাঁদেও জড়িয়ে পড়ছিলেন। সোভিয়েততন্ত্র-বিরোধী এনার্কিস্ট সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারী ও ট্রটস্কিপন্থীরা সোভিয়েত সরকার ও জনগণের নিকট পরাজিত হয়ে রলাঁর কাছে আবেদন করেছিল সোভিয়েতের এই "দমননীতির" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। একজন বৃদ্ধ বিপ্লববাদী মহিলার নিকট থেকেও (যাঁকে রুশ-বিপ্লবের পিতামহী বলা হতো) রলাঁ এক আবেদন পেলেন। রলাঁ বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং সোভিয়েত সরকারকে নিন্দা ক'রে এক বিবৃতি দিলেন।

এ ঘটনার কিছুকাল পরেই ১৯২৪ সালে ২১শে জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যু হয়। রলাঁ তৎক্ষণাৎ শোকপ্রকাশ ক'রে সোভিয়েত সরকারের মুখপত্র "ইজভেস্তিয়া" (*Izvestia*)-তে চিঠি লিখে পাঠালেন। তারপর থেকে তিনি সব সময়ই সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করেছেন।

১৯২৬ সালে রলাঁ ইন্দোচীনে (ভিয়েৎনামে) ফ্রান্সের জনসাধারণকেই ইন্দোচীনের মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করবার জন্য আহ্বান জানান। সেই সময় থেকে রলাঁ ফরাসী, ব্রিটিশ, আমেরিকান, ডাচ্, জাপানী, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলিতে শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদাই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ১৯৩৩এ তিনি লিখেছিলেন :

"ধনতন্ত্রী শোষণ পৃথিবীর সর্বত্র এই ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ শোষিত

মানুষের উপর আজ যে দানবীয় নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার তুলনা মেলা কঠিন।...যেমন বাঙলা দেশে তেমনি আনামে, যেমন বাটাভিয়ায় তেমনি নানোই-এ ও পেশোয়ারে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সামরিক আইনের রাজত্ব চলিতেছে। গান্ধীজী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল শুধু এই অপরাধে ১৯৩২ সালের মে মাসে ব্রিটিশ ভারতে ৮০,০০০ নরনারীকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইযেন-বে ঘটনার পর হইতে ফরাসী ইন্দোচীনে ৭,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত করা হয়।...১৯৩২ সালে ডাচ-ইণ্ডিজে ১০,০০০ নরনারীকে রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী করা হয়।·· কোরিয়ায় ৩৫,০০০। ইহা ছাড়া, জাপানে হাজার হাজার লোক ধৃত, নির্যাতিত ও দণ্ডিত হইতেছে এবং ইতালি, বেলজিয়ান ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলিতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়, নিপীড়নের বন্যা চলিয়াছে। নিষ্ঠুর, কপট, দানবীয় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাও দেখিবার মতো। সে আজ দুর্নীতি জর্জরিত কুয়োমিংটাং সেনাপতিগণের পরম মিত্র ও কিউবার হত্যালীলার সমর্থক।...দক্ষিণ আমেরিকার বুকে সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়া রক্তপিপাসু স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।" ("শিল্পীর নবজন্ম," ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১-৫২)

১৯২৭ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আইনের সাহায্যে যেরূপ বীভৎসভাবে সাক্কো ও ভানৎসেত্তিকে হত্যা করেছিল তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রলাঁ তাঁর এক আমেরিকান বন্ধুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা বর্তমানে ভিয়েৎনামে আমেরিকার বর্বর দস্যুবৃত্তির ফলে আরও সত্য ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে :

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বহির্বিশ্বের জনগণের মধ্যে এই মহাপাপ আজকে অতল-স্পর্শী গহ্বরের সৃষ্টি করিল সমস্ত ট্র্যাজেডির সেইটাই সবচেয়ে দারুন দুর্ঘটনা। মার্কিন সরকারের পদস্থ অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের এই চরম হৃদয়হীনতায় সমগ্র জগৎ ঘৃণায় সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে। যে-প্রশ্নটিকে তাহারা এইভাবে উপেক্ষা করিল সে-প্রশ্ন তো সুবিচারের প্রশ্ন নহে। সে-প্রশ্ন সহজ সাধারণ মানবতার প্রশ্ন। ইহাই যে আমেরিকার প্রকৃত রূপ—গত দশ বৎসর ধরিয়া এইরূপ একটি ধারণা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে; আমেরিকার উপর একটা গভীর বিদ্বেষ সমস্ত জাতির মনে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের আজ হইতে এক নৈতিক সংগ্রাম শুরু হইল।...ছয় বৎসরই হউক, বিশ বৎসরই হউক অথবা এক শতাব্দীই হউক, বাস্তব অবস্থার মধ্যে এ সংগ্রাম রূপ পরিগ্রহ করিবেই। কারণ বিশ্বের বিবেকে আজ আঘাত লাগিয়াছে। আর যতদিন পর্যন্ত এ-আঘাতের প্রায়শ্চিত্ত না হয় ততদিন বিশ্বের বিবেকের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি আঘাতের কথা লেখা থাকিবে ইতিহাসের পাতায়।"

৯

১৯২৭ সালের পর থেকে ইয়োরোপের রাজনৈতিক সঙ্কট চরমে উঠতে শুরু করে। ইতালিতে মুসোলিনির ফ্যাসীবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত; সেখানে ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণের জন্য খোলাখুলি ভাবেই যুদ্ধের আয়োজন করছে। ইংলণ্ড সোভিয়েতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, পেট্রলতেলের কোটিপতি ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত সফল হয়েছে।

ইংলণ্ডের নেতৃত্বে সবদেশের সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পুনরায় দলবদ্ধ হতে শুরু করেছে। জার্মানীতে হিটলারের তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে।

ফরাসীদেশেও ফ্যাসীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠল এবং সরকার তাদের খোলাখুলি ভাবেই সাহায্য করতে লাগল। ১৯২৯ সালে কমিউনিস্ট ও সোসিয়ালিস্টদের সমস্ত সভা ও মিছিল বেআইনী ক'রে দেওয়া হলো (যদিও ফ্যাসিষ্টরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো না) এবং ৪০০০ কমিউনিস্ট ও সমস্ত নেতাদের কারারুদ্ধ করা হলো ও তাদের দৈনিক পত্রিকা 'লুমানিতে' বন্ধ ক'রে দেওয়া হলো। ঐ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ভাইয়াঁ-কুতুরীয়ের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও তার অন্যতম ডাইরেক্টর আঁরি বারবুসের বিরুদ্ধে বিদেশের গুপ্তচর বলে আদালতে অভিযোগ আনা হলো। ফ্যাসীবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণে তখন সমস্ত মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

রলাঁ এবং আরও অনেক বুদ্ধিজীবীই বুঝতে পারলেন যে "লক্ষ্য এবং উপায়ে" হিংসা ও অহিংসা, চিন্তার স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নগুলি বর্তমান শ্রেণী-বিভক্ত রাষ্ট্রের চরম অবস্থায় একেবারেই নিরর্থক; এই শ্রেণী-বিভক্ত রাষ্ট্রই হিংসার ও বর্বরতার প্রধান উৎস।

শ্রমিক আন্দোলনের এইরূপ সঙ্কটাবস্থাতে ফ্রান্সের কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত লেখক, কবি, দার্শনিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লুই আরাগঁ,

পল এলুয়া, পল নিজাঁ, আঁদ্রে ব্রেস্টন, জর্জ পলিটজার, আঁরি লফেব (Louis Aragon, Paul Eluard, Paul Nizan Andre Brestan, George Politzer, Henri Lefebvre) প্রমুখ। পিকাসো, ত্রিস্তান ৎজারা, পল লাঁজভাঁ, জোলিও কুরী (Picasso, Tristan Tzara, Paul Langevin, Jolliot Curie) এবং আরও অনেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

এতদিন পর্যন্ত রলাঁ সক্রিয় রাজনীতির উর্ধ্বেই ছিলেন। কিন্তু রলাঁর নিকট প্রশ্নটা এই ছিল না যে তিনি কোন্ পক্ষ বেছে নেবেন—তিনি বিপ্লবের পক্ষই বেছে নিয়েছিলেন—তাঁর নিকট প্রশ্ন ছিল কোন্ পন্থা। রাজনীতিতে কোনো না কোনো প্রকার বল প্রয়োগ বা হিংসা অন্তর্নিহিত রয়েছে। এবং এই সমস্যাটাই ছিল তাঁর নিকট সব থেকে বড় বাধা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্বিধান্বিত অবস্থায় রাজনীতির উর্ধ্বে থাকা রলাঁর মতো মনীষা ও শিল্পীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। গত কয়েক বৎসর ধরে তাঁর যুদ্ধের উর্ধ্বে থাকাটা একান্ত স্ববিরোধী হয়ে উঠেছে, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে তার মনে প্রতি-মুহূর্তে—প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট তিনি একজন ভয়ঙ্কর কমিউনিস্ট কিন্তু কমিউনিস্টদের নিকট তিনি আদর্শবাদী ব্যক্তিত্ববাদী। মানব সভ্যতার এই সঙ্কট মুহূর্তে রলাঁ তাঁর সমস্ত দ্বিধা বর্জন ক'রে নতুন পৃথিবীর আদর্শকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রে নিলেন। তাঁর দীর্ঘ ১৫ বৎসরের অন্তর্দ্বন্দ্বের আজ সমাধান হলো।

মানবকল্যাণ ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশই হলো মার্কসবাদের কেন্দ্রবিন্দু। রলাঁরও তাই। কাজেই এই সমভূমিতে মার্কসবাদ গ্রহণ করাই রলাঁর স্বাভাবিক পরিণতি। "শিল্পীর নবজন্ম" তারই জীবন্ত সাক্ষ্য। এই "শিল্পীর নবজন্মের" সমতুল্য ঘটনা খুব কমই আছে, কারণ তা হলো রলাঁর হৃদয়ের আগুন, যে-আগুনে তাঁর মন অহরহ জ্বলছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানস পরিবর্তনের এমন কাহিনী দুর্লভ। ব্যগ্র সত্যানুসন্ধানীর যে গর্বহীনতা ও সৎসাহস তাঁর মধ্যে স্বভাবজাত ছিল, তারই সাহায্যে তিনি তাঁর শ্রেণীর পূর্বসংস্কারগুলিকে বর্জন করতে পেরেছিলেন। "শিল্পীর নবজন্ম"-এ রলাঁর আত্ম-সমালোচনা একটি অতুলনীয় উদাহরণ (যে-আত্মসমালোচনা সোহহম্‌বাদীদের পক্ষে কতই না অচিন্তনীয়)। কী সততা ও দুঃসাহস, কী গর্বহীনতাই না তাতে প্রকাশ পেয়েছে, কত অনুপ্রেরণাই না তা সৃষ্টি করে! তাঁর সংশয়াকুল মনের দোদুল্যমানতার স্বীকৃতি কতই না অকপট! বিশ্বজনীন আদর্শের জন্য রলাঁর সারাজীবন ব্যাপী অন্বেষণের চূড়ান্ত ফল। এ কাহিনী শুধু তাঁর নিজেরই নয়, এটি একটি কালান্তরের কাহিনী, দুই যুগের সন্ধিক্ষণের কাহিনী। তাই "শিল্পীর নবজন্ম"-এর দর্পণে জগতের সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরাই তাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন।

এই নতুন সত্য উপলব্ধি করার পর থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সমস্ত ফলাফলও তিনি গ্রহণ ক'রে নিলেন, তার রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক তাৎপর্য কোনোটাই বাদ

দিলেন না এবং কেবলমাত্র গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, এই আদর্শের জন্য একেবারে আপসহীন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ালেন।

রলাঁ নিজেই বলেছেন যে তাঁর জীবনে সত্যের অনুসন্ধানে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ আবিষ্কারই তাঁর সব থেকে মহান্ আবিষ্কার। এই সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদই কানাগলির বন্ধ্যা ব্যক্তিত্ববাদের বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত ক'রে নবযুগের প্রসস্ত জনপথে এনে দাঁড় করিয়েছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রলাঁ যে নিজের মধ্যেই এই প্রচণ্ড শক্তি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এইখানেই তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব ও প্রতিভা ; রলাঁর ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানেই যে মানুষ হিসাবে, শিল্পী হিসাবে, বুদ্ধিজীবী হিসাবে বুর্জোয়া মানবতাবাদ, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ পরিত্যাগ ক'রে সমস্ত মন ও হৃদয় দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার জন্য লড়ে গিয়েছেন। যুদ্ধের উর্ধ্বে থেকে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালেন এবং বিমূর্ত মানবপ্রেমকে পশ্চাতে রেখে মূর্ত মানবের বাস্তব জীবন-সংগ্রামে সহযাত্রী হয়ে তাদের জয়-পরাজয়ের আনন্দ-দুঃখ-বেদনার অংশীদার হলেন।

প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে রলাঁর এই পুনর্জন্ম একটি আশ্চর্য ঘটনা। শ্রমিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে রলাঁ শুধু নিজের জীবনেই এক নতুন বিশ্বাস, নতুন আশা ও প্রেরণাই পেলেন না, তিনি সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন

উদ্দীপনা এনে দিলেন। মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বলীয়ান্ হয়ে রলাঁর কী বিপুল উৎসাহ! মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিনকে উদ্ধৃত ক'রে তাঁর কী অসীম আনন্দ!

১৫ বৎসর ধরে সংগ্রামের পর রলাঁ আজ ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্দ্ব সমাধান করতে পেরেছেন। সমাজতন্ত্র ব্যক্তি-মানুষের বিরোধী নয়, ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে না। ধনতন্ত্রই ব্যক্তি-মানুষকে পরাধীন ক'রে রেখেছে। যেদিন ধনতন্ত্র ধ্বংস হবে সেইদিন ব্যক্তি-মানুষের শৃঙ্খল মোচন হবে, তখনই তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে। স্টালিন একদিন ওয়েলসকে যা বলেছিলেন, তা আজ রলাঁ স্পষ্ট ভাবেই অনুভব করছে পারছেন।

"ব্যক্তি-মানুষ ও সমষ্টি-মানুষের স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, থাকা উচিত নহে। দুয়ের মিলন ঘটাতেই হইবে। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।"

বহু পূর্বে মার্কস তাঁর *Holy Family*-তে লিখেছিলেন:

"বুর্জোয়া সমাজের দাসত্বকে বহির্দৃষ্টিতে মনে হয় সবচেয়ে বেশী স্বাধীন। কারণ, মনে হয়, ইহা যাহা দিতেছে তাহা পরনির্ভরতা হইতে ব্যক্তি-মানুষের পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু এইখানে সম্পত্তি, শিল্প (Industry), ধর্ম প্রভৃতি যাহা কিছুর সহিতই তাহার জীবনের যোগ নাই, তাহারই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাকে সে নিজের স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করে।"

মার্কসের এই উক্তি সমর্থন ক'রে রলাঁ লিখেছেন:

"লেখক হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই অস্পষ্টতার অবসান ঘটানো,

মার্কসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'অবাস্তব মানুষ' হইতে মানুষকে সাহস ও শক্তির সহিত মুক্ত করিয়া আনা, মানবীয়তার (Humanism) সহিত সাম্যবাদের (Communism) একাত্মতা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মিলন ঘটান।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৮৩)

এই প্রসঙ্গে রলাঁ আরও বলেছেন :

"বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মর্মস্থলকে নির্মম স্বচ্ছতার সহিত কার্ল মার্কস উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের কাছে তাঁহার প্রতিভার এইটাই সবচেয়ে বড় কথা যে মোহজালে আমরা নিজেদের আচ্ছন্ন হইতে দিয়াছিলাম তাহা তিনি ছিঁড়িয়া দিয়াছেন।"

সমষ্টির সঙ্গে একাত্মবোধ ক'রে রলাঁ আজ গর্বিত বোধ করছেন, নিজেকে আরও শক্তিমান বলে মনে করছেন :

"আমরা আর একা নহি। আমরা একসঙ্গে কথা কহিয়া চলিয়াছি। যদিও সমাজের বর্তমান স্তরকে আঘাত দিয়া একটু আগাইয়া দেওয়া, আগামী দিনের বাস্তব সম্পর্কে স্বপ্ন আনিয়া দেওয়া মহান্ শিল্পীদের চিরদিনের কর্তব্য থাকিবে, তথাপি তাহার স্থান অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যেই।...আজ আমাদের চোখের আচ্ছাদন খুলিয়া গিয়াছে। যে স্বাধীন শক্তিনিচয়ের মুক্তির জন্য আমরা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, এক সমাজতান্ত্রিক সমাজে আজ তাহার সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ শুরু হইয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৮৫)

১০

এই সময়ে এনার্কিস্ট-কমিউনিস্টদের মুখপত্র "লিবার্তেইর" পত্রিকা "রাশিয়ায় নির্যাতন" নাম দিয়ে কতকগুলি কুৎসাপূর্ণ

প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকাগুলি এই সুযোগে খুব হৈ চৈ শুরু ক'রে দিয়েছিল। রলাঁ স্থির থাকতে পারলেন না ; তিনি তাঁর জবাব দিলেন (২৮শে মে, ১৯২৭) :

"ইয়োরোপে সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে রাশিয়া আজ বিপন্ন এবং সে যদি একবার ধ্বংস হইয়া যায় তবে কেবল পৃথিবীর শ্রমিকরাই শৃঙ্খলিত হইবে না—কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এশিয়ার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইয়োরোপের ধনিকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দানবীয় যুদ্ধের জালে দিনে দিনে ইয়োরোপের সমস্ত জাতিগুলি জড়াইয়া পড়িবে। অতএব এই ভ্রাতৃঘাতী আলোচনা আপাতত স্থগিত থাকুক। রুশ বিপ্লবের মতো এত শক্তিশালী ও এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমান ইয়োরোপে আর হয় নাই। ইহার সাহায্যার্থে আসুন আমরা দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাই ; শত্রু দ্বারে সমাগত, সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। ইয়োরোপের স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৫৭)

ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সব গণ-আন্দোলন (Popular Front Movement) এই সময় থেকে গড়ে উঠতে থাকে, রলাঁ তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে লাগলেন এবং বিশেষ ক'রে চারটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন : (১) সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সমর্থন, (২) শান্তি আন্দোলন, (৩) ধনতন্ত্র, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও যুদ্ধবাজদের

বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ৪) ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এখন থেকে রলাঁর প্রতিটি লেখা, প্রতিটি চিঠি এক-একটি ইস্তেহার, সক্রিয় সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বান।

১৯২৭ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের দশম জন্ম-বার্ষিকীতে রলাঁ অভিনন্দন জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ও তার প্রতিবাদ ক'রে দুইজন দেশত্যাগী রুশ লেখক, ইভান বুনিন (Ivan Bunin, ইনি পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন) ও কনস্টান্টিন বালমণ্ট (Constantine Balmont) ফ্রান্সের *Avenir* পত্রিকায় "রমঁ্যা রলাঁর প্রতি—রাশিয়ার শহীদ লেখকগণ" শীর্ষক একটি সোভিয়েত-বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার জবাবে লেখকদের উদ্দেশ ক'রে রলাঁ যে খোলা চিঠি লিখেছিলেন তা প্রগতি আন্দোলনে একটি অবিস্মরণীয় ইস্তেহার :

"...না আমি কখনও ভুলি নাই যে বিপ্লবের দশটি বছরে রাশিয়াকে কি মূল্য দিতে হইয়াছে। তার পর্বতপ্রমাণ দুর্গতির পরিমাণ আমি জানি। এ ক্ষতির কথা ভাবিতে বসিলে প্রায়ই আমি অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু বিপ্লবের রাশিয়ার সহিত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আজ শুরু হইয়াছে তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি আর ইতস্তত করিতে পারি না। বালমণ্ট, বুনিন... আপনাদের নূতন বন্ধুর দল আসিতেছে নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়াশীল "নৈতিক ব্যবস্থা" ও বণিক সাম্রাজ্যবাদের স্তর হইতে। আপনারা তাহাদের হাতের ক্রীড়নকমাত্র। আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে, যে-রাশিয়াকে আপনারা ভালবাসেন তাহার হাতে-পায়ে

আবার দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া জগতের অন্যান্য দুর্বল ও প্রতিরোধ-অক্ষম জাতিগুলির মতো তাহাকে শোষণ করাই ইহাদের সোভিয়েত বিদ্বেষের একমাত্র লক্ষ্য।…

'সাহিত্যিক সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন আমরা করিব বটে কিন্তু সেই সাথে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মিথ্যা দম্ভ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে যে, আমাদের নিজস্ব স্বার্থ ও সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ এক নহে। আপনাদের রাশিয়ার জনসংখ্যার শতকরা নব্বুই জন কৃষকমজুর। বুনিন, আপনি নিজে এবং আপনার পূর্বে অনেক রুশ লেখকই তো আপনাদের চোখের সম্মুখে রুশ-জীবনের প্রকৃত রূপ খুলিয়া ধরিয়াছেন। আপনাদের আঁকা ছবিতে দেখিয়াছি : রাশিয়ার জনসাধারণের জীবন বিষবাষ্পাচ্ছন্ন বদ্ধজলার মতো—দেহে মনে মন্থর মৃত্যুর অভিশাপ বহন করিয়া সে যেন দুর্দিনের শেষ ধাপটি কোনোমতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু আপনাদের বেদনার্ত হৃদয়ের এই করুণা তাহাদের মুক্তির জন্য তো একটি ছোট্ট রাস্তাও তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে নাই। আজ আপনাদের জানা উচিত সেই বদ্ধজলার স্থানে কি ঘটিয়াছে।"

এই চিঠিতে রলাঁর শেষ কথা ছিল :

"যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীগণ রুশবিপ্লবকে ঘৃণা করেন তাহারাই হাসিমুখে ফরাসী বিপ্লবের সুবিধা ভোগ করেন। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে মানুষের প্রগতি কিনিতে হয়। অথচ এই প্রগতি সৃষ্টির কাজে তাহাদের পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিবার কথা, এক মর্মান্তিক দৃষ্টিহীনতার ফলে তাহারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া মরে। তথাপি মানুষের জগত আগাইয়া চলে। আজও সে আগাইয়া চলিয়াছে। চলিয়াছে

আপনাদের উপর দিয়া, আমাদের উপর দিয়া।" ("শিল্পীর নবজন্ম," ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫-৯৪)।

১৯৩০ সালে রুমানিয়ার একজন শান্তিবাদী লেখক অয়গেন রেলগিস্ (Engen Relgis) একটি ইয়োরোপায়ন আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করার কাজে রলাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। তার জবাবে রলাঁ—যে রলাঁ নিজেই একদিন বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার স্বাধীনতার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন—সেই রলাঁই জগতের অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীদের থেকে স্বতন্ত্র, জনসাধারণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাদের "উর্দ্ধে" বুর্জোয়া 'এলিত'দের সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের জন্য এই প্রচেষ্টাকে তীব্র নিন্দা করলেন।

"যুক্তিবাদ চীনা প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ এবং এমন কি ভারতবর্ষেও (ভারতবর্ষ কুড়িটি বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত একটি ইয়োরোপের সমান) এই যুক্তিবাদ কয়েকটি মহান্ জাতির মানস-প্রকৃতিতে রহিয়াছে। মানুষের এই মানস-স্রোতকে আর দুইটি বিভিন্ন ভূখণ্ডে পৃথক করিয়া রাখা চলে না; আজ সর্বপ্রকারের ভাবধারাই আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে আজ অব্যাহত চলিতেছে বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মগত ভাবধারার এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আদান প্রদান।...

"গতির আবেগে কাঁপিতেছে সমস্ত জগত। একটা ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে সর্বত্র। এ-জগতকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করিয়া এই বিপুল সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করিয়া না দেই। যে আন্তর্জাতিকতা বিশ্বজনীন নয়, তাহার অস্তিত্ব আর থাকিতে পারিবে না।"

বুদ্ধিজীবীদের আভিজাত্য, দাম্ভিকতা ও পলাতক মনোভাবকে কঠোর সমালোচনা ক'রে রলাঁ বললেন :

"ক্ষুধিত, নিপীড়িত, নির্যাতিতের সেবক আমি। আমার মনের ঐশ্বর্য্য তাহাদেরই জন্য কিন্তু সর্বাগ্রে আমার কাছে তাহাদের দাবী : অন্নের, সুবিচারের, স্বাধীনতার। বুদ্ধিজীবীদের সুযোগ সুবিধার অংশীদার আমি, সমাজকে সক্রিয় সাহায্য দানের ক্ষমতা আমার আছে। আর ক্ষমতা আছে বলিয়া কর্তব্যও আছে তাই আমাকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পথকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে, সমাজ-প্রতারকদের মুখোস খুলিয়া দিতে হইবে।...

"বর্তমানের প্রতি উদাসীন থাকাই তো ভবিষ্যতের প্রতি, সর্বমানবের চিরন্তন স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।...প্রকৃতপক্ষে, সত্যকার সামাজিক সুবিচার ও মানবিকতার চিরন্তন মূল্যের সহিত জাতির প্রকৃত স্বার্থের কোনো দিনই কোনো বিরোধ থাকিতে পারে না।...

"বুদ্ধিজীবী বলিতে কাহাদের বুঝায় তাহা আগে জানা দরকার। 'কায়িক শ্রমজীবী' হইতে স্বতন্ত্র ধূলি-বিমুক্তদেহ কোনো বিশেষ গোষ্ঠী হিসাবে তাহাদের দেখা চলিবে না।...কর্মী মানুষের বৃহৎ সঙ্ঘের একটা অংশ ছাড়া তাহারা আর কিছুই নহে। সমস্ত শ্রমজীবী লইয়া যে সেনাবাহিনী গঠিত তাহারই একটি বিশেষ অস্ত্র তাহারা, (প্রতিভার মতো)। তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তাহারা যেন একাগ্রমনে সম্পন্ন করিয়া যায় কিন্তু এ গর্ব যেন কোনো দিন তাহাদের মনে না আসে যে, অপর সহকর্মিদের কাজের চেয়ে তাহাদের কাজের গুরুত্ব বেশী।...

"আজ আমাদের সংগ্রাম ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে ; আমাদের সংগ্রাম

প্রাচীন ভাবধারার বিরুদ্ধে, মুমূর্ষু ও হিংস্র দেবতাদের বিরুদ্ধে আর ঐ কবন্ধ দেবতাদের লক্ষ লক্ষ পূজারীদের বিরুদ্ধে। আমরা গড়িব নূতন দেবতা ও নূতন মানবতা।" ("শিল্পীর নবজন্ম," ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-১৬।

১১

এশিয়ার ক্রমবর্ধমান মুক্তি আন্দোলন দমন করার জন্য কোনো কোনো মহলে ইয়োরোপীয় সামরিক অভিযানের প্রস্তাব উঠছিল। সেই প্রসঙ্গে রলাঁ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যে "এশিয়া ও আফ্রিকায় আমাদের বীর ভ্রাতাগণ শৃঙ্খল ছিঁড়িবার সংগ্রাম শুরু করিয়াছেন" তিনি তাদেরই পক্ষে।

"সেই প্রলয়ঙ্কর বর্বর সংগ্রাম যদি কখনও তুমি আরম্ভ কর, তবে হে ইয়োরোপ, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার উদ্ধত স্বৈরাচার ও উন্মত্ত ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিতে আমি দ্বিধা বোধ করিব না। ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি প্রত্যেক শোষিত ও নিপীড়িত জাতির পাশে দাঁড়াইয়া আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইব। মহত্তর সভ্যতা ও মানব মনের সীমাহীন প্রগতির নামে চলিবে আমার এই সংগ্রাম। ("শিল্পীর নবজন্ম," ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৯)।

১৯২৭ সাল থেকে, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রলাঁ ফ্যসীবাদ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করলেন। এক বৎসর পূর্বে মুসোলিনির ষড়যন্ত্রের জাল থেকে রবীন্দ্রনাথকে রলাঁ কিভাবে উদ্ধার করেছিলেন ও ভারতীয় বিবেক ও সম্মানকে রক্ষা করেছিলেন সে-ঘটনা ইতিপূর্বে

আমরা দেখেছি। এই সময়ে কোনো কোনো ভারতীয় সংবাদপত্রে ফ্যাসীবাদ প্রচার হবার উপক্রম হয়েছিল। "ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল পত্রিকায়" (১৫ই জানুয়ারি, ১৯২৭) রলঁা তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তাঁর ভারতীয় বন্ধুবান্ধবদেরও এ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন।

১৯২৭ সাল থেকে বারবুসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় রলঁার কর্মসাধনা শুরু হলো। ঐ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পারীর বিখ্যাত সভাগৃহ 'সাল বুলিয়েতে' যে প্রথম বৃহৎ ফ্যাসীবাদ বিরোধী সম্মেলন হয় তাতে রলঁা, আইনস্টাইন ও বারবুস সভাপতিত্ব করেন। এ সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি ছিলেন আইনস্টাইনের বন্ধু ও সহকর্মী ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞানী লঁাজভঁা (Paul Langevin)। এই সময় থেকে জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত রলঁা তাঁর নতুন সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদের আদর্শের জন্য আপসহীন ভাবে এই সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন। রলাঁর নিজের কথায়: "সে-যুদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে জাতির বর্বর প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ নহে। সে-যুদ্ধ শোষণকারী দাসব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত এক অভিসপ্ত হত্যাপ্রবণ সমাজের বিরুদ্ধে সকল জাতিরই এক পবিত্র সংগ্রাম।"

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করার পর থেকে যুদ্ধ, শান্তি, হিংসা ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে রলঁার আদর্শ আজ কত স্বচ্ছ, কত শক্তিশালী যুক্তিপূর্ণ ও ভাবালুতা বর্জিত বাস্তবরূপ নিয়েছে তা তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি থেকেই বোঝা যায়। যে রলঁা একদিন

"যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" ছিলেন, তিনিই আজ আপসহীন সমাজবিপ্লবের যোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়েছেন :

"যে-যুদ্ধ সত্যকারের যুদ্ধ, যে-যুদ্ধের প্রয়োজন ও বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে-যুদ্ধ হইবে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে। সামাজিক নৈতিক ও জাতিগত কুসংস্কারের বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ পুরাতন ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী জগতকে ধ্বংস করিয়া যাহারা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছেন তাহাদের সকল কর্মে, সকল আশায়, সকল দুঃখ-বেদনার মধ্যে আমি আছি। এবং যেহেতু শ্রমিক বিপ্লব আজ আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর পুরোভাগে চলিয়াছে এবং সে-সংগ্রামের জয়লাভের ফলে শ্রেণীহীন, ভৌগলিক ব্যবধানহীন নূতন মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হইবে, সেই হেতু এই বিপ্লবে আমার পরিপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৭৭)।

১২

১৯৩০ সাল থেকে রলাঁর প্রধান স্লোগান হলো—*La Paix, Par La Revolution*—সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি। এই নামে ফরাসীভাষায় রলাঁ একখানা বইও লিখলেন। এতে রলাঁর প্রধান কথা হলো জগতে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রথম প্রয়োজন সব দেশে সামাজিক বিপ্লব এবং রলাঁর মতে বর্তমান যুগের মানবতাবাদের এইটাই হলো সর্বপ্রথম কথা।

১৯৩২ সালে আগস্ট মাসে সর্বদলীয় ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধ-বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন হলাণ্ডের আমস্টার-ডাম শহরে হয়। এই সম্মেলনে সর্বদেশের প্রগতিশীল

সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বারবুস, রলাঁ ও লাঁজভাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলন সফল হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রলাঁ লিখেছেন :

"দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের এবং সমাজতন্ত্রের জাতীয় দলগুলির গোপন ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এই বিরাট সম্মেলনের কি বিপুল প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা আজ সুবিদিত। নেতাদের অপেক্ষা জনসাধারণ সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল···নেতাদের তাহারা সম্মুখপানে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছিল; এবং সেই ধাক্কার পশ্চাতে ছিল ঐক্য ও সাধারণ ফ্রন্টের অদম্য শক্তি। আমস্টারডাম সম্মেলনের গৌরব বারবুসের নামের সহিত জড়িত। সমস্ত দেহ মন দিয়া তিনি ইহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনই প্রথম সুদৃঢ় কেন্দ্র যাহাকে ঘিরিয়া যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম-বিরোধী শক্তিগুলির সুস্থ প্রভাব ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ৭২)।

এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন পারীর 'সাল প্লেইয়াল' সভা গৃহে ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতা দখল করেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক ডিমিট্রভের বিরুদ্ধে জার্মান পার্লামেন্টে অগ্নিকাণ্ড ঘটাবার যে মিথ্যা মামলা করেছিল তার প্রতিবাদে জগতব্যাপী এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। রলাঁও এই আন্দোলনে যোগ দেন ও ডিমিট্রভের মুক্তি দাবী করেন। জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা থায়লমান (Thaelmann) ও টর্গলার (Torgler)-এর মুক্তির জন্যও তিনি আন্দোলন করেন।

শুধু ইয়োরোপে ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধেই নয়, তখন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের যে পাশবিক নির্যাতন চলেছিল, তার বিরুদ্ধেও তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন। এই সময়ে বার্লিনস্থ League Against Imperialism-এ (যার সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) রলাঁ ও আইনস্টাইনকে পেট্রন ক'রে নেওয়া হয়। ভারতবাসীদের দেয় ট্যাক্সের ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে তাদেরই শ্রমিক-কৃষক প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ৪ বৎসর ধরে ইংরেজ সরকার মীরাটে যে মামলা চালিয়েছিল তার প্রতিবাদে রলাঁ যে প্রতিবাদ করেছিলেন তা সমগ্র এশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল। এই প্রসঙ্গে রলাঁ ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী, ডাচ, পর্তুগীজ, বেলজিয়ান, জাপানী সব সাম্রাজ্যবাদের কপট, দানবীয় ভূমিকাকেও নিন্দা করলেন। মীরাট মামলার বন্দীদের অভিনন্দন জানিয়ে রলাঁ যা লিখেছিলেন (১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩) তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কী আমূল পরিবর্তনই না ঘটেছিল এবং ভারতের কৃষকের মুক্তির জন্য কাদের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করেছিলেন :

"ধনতন্ত্রী শোষণ পৃথিবীর সর্বত্র এই ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করিয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষের উপর আজ যে দানবীয় নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার তুলনা মেলা কঠিন।...এই বিপুল গণতরঙ্গকে অহিংসার সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন এক মহাপ্রতিভা। তাই যে সংস্কারপন্থী বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুটা আপস করিয়াও বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা

কায়েম রাখিতে চাহে, এই সুসংযত অভ্যুত্থান এখনও তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে নাই। এই উদার বিদ্রোহের লক্ষ্য ভারতীয় স্বার্থের সহিত ব্রিটিশ-স্বার্থের সমন্বয় সাধন। ভাইসরয়ের নির্বোধ আত্মম্ভরিতার ও কূপমণ্ডুক শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শিতায় বাধ্য হইয়াই এ আন্দোলন শুরু করিতে হইয়াছে।

"কিন্তু এ আন্দোলনের রূপ বদলাইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রমিক কৃষকশ্রেণী সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের দৃঢ় সংকল্প লইয়া সুসংহত, বৈপ্লবিক, সংগ্রামশীল দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে। নিপীড়িত পৃথিবীর বিদ্রোহ-আন্দোলনে নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে।...

"সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আজ যে মহাসংগ্রাম চলিয়াছে তাহাতে যে হাজার হাজার মানুষ আত্মাহুতি দিয়াছে মীরাট মামলার আসামীগণ আমাদের চোখে তাহাদেরই জীবন্ত প্রতীক।...যে নূতন বিদ্রোহশক্তি মানব-সমাজকে আলোড়িত করিতে শুরু করিয়াছে তাহার অনিবার্য বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা ইহাদের জীবনের মধ্যে পাঠ করিতেছি। ইহাদের রুখিবে কে?" ("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ১৫০-৫৭)

১৩

১৯৩৪ সালে জুলাই মাসে পারীতে 'বুফালো স্ট্যাডিয়ামে' এক বিরাট জনসভায় কমিউনিস্ট, সোসিয়ালিস্ট ও র‍্যাডিক্যাল পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও আরও বহু গণ-সংগঠন নিয়ে পপুলার

ফ্রন্ট গঠিত হলো এবং আমস্টারডাম কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে রলাঁ তার সভ্য হলেন।

১৯৩৫ সালে জুন মাসে পারীতে আন্তর্জাতিক লেখক কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে ফ্রান্সের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন রলাঁ, বারবুস, জীদ, আরাগঁ, মালরো ; জার্মানীর প্রতিনিধি ছিলেন হাইনরিখ মান, বেরটোল্ড ব্রেসট্ ও ইয়োহানেস বেসার ; সোভিয়েত থেকে এসেছিলেন আলেক্সাই টলস্টয় ও ইলিয়া এরেনবুর্গ। পরের বৎসর লেখকদের দ্বিতীয় কংগ্রেস হয়েছিল স্পেইনে গৃহযুদ্ধের সময় তিনটি সহরে—ভালেন্সিয়া, মাদ্রিদ ও বারসেলোনায়। স্প্যানিস বিপ্লবকে রলাঁ প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। এবং এই বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করতে ফরাসী শ্রমিকদের আহ্বান করেছিলেন।

১৯৩৬ সালে রলাঁর ৭০ তম জন্মদিবস একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। ফ্রান্সে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ও আরও অনেক স্থানে তা ব্যাপক ভাবে পালিত হয়। একজন জীবিত লেখকের জন্মোৎসব এত ব্যাপকভাবে ও এত আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হতে আর কখনো দেখা যায় নি। লক্ষ লক্ষ মেহনতি নরনারীর হৃদয় ও মনের সঙ্গে একজন শিল্পী যে কত অন্তরতম যোগসূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন তা সমস্ত জগৎ অবাক হয়ে দেখল। সোভিয়েত ও ফ্রান্সে অসংখ্য জনসভায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী রলাঁকে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরূপে ও মানব কল্যাণের অক্লান্ত যোদ্ধারূপে যে শ্রদ্ধা ও সম্মান

জানিয়েছিল তা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। এই উপলক্ষে রলাঁর বিখ্যাত নাটক "১৪ই জুলাই" পারীতে মঞ্চস্থ ও বহুদিন ধরে তার অভিনয় হয়।[১]

জনৈক জার্মান লেখক তাঁর বইতে লিখেছেন যে ১৯৩৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সব মামলা হয় তার ফলে নাকি রলাঁ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং তা থেকে অনেক দূরে সরে যান।[২] কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যা তা রলাঁর পরবর্তী কালের কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে কার্যকলাপই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। "সিদ্ধার্থের" লেখক হেরমান হেসে (Hermann Hesse—নোবেল পুরস্কার ১৯৪৬) এক চিঠিতে "স্টালিনের সন্ত্রাসবাদ" সম্বন্ধে রলাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। রলাঁ তাঁর জবাবে লিখেছিলেন যে তিনি লেনিনগ্রাদের একজন চিকিৎসককে ২০ বৎসর ধরে জানেন—তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার কোনো কারণ দেখান হয় নি; রলাঁ স্টালিনকে দুইখানা চিঠি লিখেছেন কিন্তু তার কোনো জবাব পান নি। আরও কয়েকজন বন্ধু সম্বন্ধে রলাঁ স্টালিনকে লিখেছিলেন, তারও কোনো ফল হয় নি।[৩]

---

[১] এই উপলক্ষে পিকাসো (Picasso) "১৪ই জুলাই"র যে বিখ্যাত মঞ্চপট এঁকেছিলেন তা এই বইয়ের চিত্রগুচ্ছে মুদ্রিত হলো।

[২] J. Ruhle : *Literatur Und Revolution, p. 353*

[৩] রলাঁ মস্কো মামলা ও "স্টালিন সন্ত্রাসবাদ" সম্বন্ধে কি ভাবতেন তা তিনি তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুকে ১৯৩৮ অক্টোবরে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায়: "কামেনেভ ও

পরিশেষে রলাঁ দুঃখ ক'রে লিখেছিলেন যে গর্কীর মৃত্যুর পর স্টালিনের নিকট তাঁর পূর্বেকার প্রভাব আর নেই।[১] এই চিঠিখানাই হলো Ruhle-এর অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ভিত্তি। জার্মান লেখকটি ভুলেই গিয়েছিলের যে রলাঁ আর যাই হোন না কেন, তাঁর মধ্যে কোনো আত্মগরিমা ছিল না, তা ছাড়া, তিনি ছিলেন আজীবন ইস্পাৎ-দৃঢ় যোদ্ধা, অনেক পরাজয়, অনেক আঘাত, অনেক বেদনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তার জন্য তিনি তাঁর আদর্শ কোনো দিনই ছেড়ে দেন নি। কমিউনিজমের প্রতি, স্টালিনের প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল।

মোরিস্ থোরেজ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে :

"অনেক সময় আমি রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর ভিলন্যভের বাড়িতে যেতাম।...শান্তি আন্দোলন, শ্রমিক

জিনভিয়েফের যে দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই। এই দুইটি ব্যক্তি দুইবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন—সেকথা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন। যে সব কথা অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সেগুলি জোর ক'রে আদায় করা বা বানানো কথা কি ক'রে বলা যায় তা আমি বুঝতে পারি না।" (Mme Brunelle : *La vrai Romain Rolland*, La Pense´e, Jan-Feb, 1952) আজীবন ইতিহাসের ছাত্র রলাঁর একথাটা অজ্ঞাত ছিল না যে ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত নেতা দাঁতঁ (Danton)—যাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভাকে মার্কস, লেনিনও প্রশংসা করতেন—তিনিও নিজেকে শত্রুর নিকট বিক্রি করেছিলেন!

১ Victor Serge তাঁর *Memoiries d'un Re´volutionarie* (1951 p. 347)তে লিখেছেন যে তাঁকে যখন বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল তখন তাঁর মুক্তির জন্য ১৯৩৫ সালে রলাঁ নিজে স্টালিনকে লিখেছিলেন।

আন্দোলনের অগ্রগতি ও পার্টির কাজকর্ম সম্বন্ধে—যে পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি গর্ব অনুভব করতেন—আমরা আলোচনা করতাম। পরে যখন তিনি ফ্রান্সের কেন্দ্রস্থলের নিকটে থাকবার জন্য ভেজলেতে বাস করতে শুরু করেন তখনও আমি তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতাম।" [১]

১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় অধিবেশন হয় তখন রলাঁ পার্টির কাজে তাঁর "সমগ্র সহানুভূতি" জানিয়ে লিখেছিলেন যে "ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিয়মে ও বিচক্ষণতার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই পার্টি জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধি হয়ে এবং তার প্রকৃত জাতীয় রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক আদর্শ অনুসরণ করছে। আবার যখন ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে পার্টির ৯ম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে রলাঁ লিখেছিলেন যে "হৃদয় ও মুক্তির দ্বারা" তিনি পার্টির সঙ্গে যুক্ত। (*L' Humanité, 23 Dec, 1937* দ্রষ্টব্য)।

১৯৩৭, ৫ই ডিসেম্বরে রলা রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :
"Indian Civil Liberties Unionএর যে বুলেটিনগুলি আমি মাঝে মাঝে পাই তাতে ভারতীয় পবিত্র স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার রক্ষার্থে আপনার মহান্ নামটি সর্বাগ্রে দেখতে পাই। আপনি জানেন যে প্রতীচ্যে একই সংগ্রামে আমিও অংশ গ্রহণ ক'রে থাকি···যে সংগ্রাম আরও ভয়ঙ্কর, কারণ শত্রুগোষ্ঠী আরও হিংস্রতর ও ক্রমশই

---

[১] Maurice Thorez : *Fils du Peuple*, 1949, p. 144 : "...Nous parlions de la lutte pour la paix, des progrès du mouvement ouvrier, de l'action du Partie auquel il était fier d' appartenir."

বিপদ নিকটতর হচ্ছে। কিন্তু ফ্রান্সের শ্রমিক কৃষকদের যে সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক জাগরণ দেখা দিয়েছে তা আমার নিকট খুবই আনন্দ ও আশার কারণ হয়েছে। বিশেষ ক'রে গত দুই তিন বৎসর যাবত নিজেদের ঐক্য ও শক্তি এবং মানবজাতির প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়েছে।" *(Rolland and Tagore p. 71.)*

এই চিঠিতেই রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে যেহেতু সুইট্‌জারল্যাণ্ডে তাঁর মনকে যথেষ্ট মুক্ত বলে অনুভব করছেন না, সেহেতু তিনি ফ্রান্সের ভেজলেতে ফিরে যাচ্ছেন।

১৪

ফ্রান্সে ফিরে আসার পর রলাঁ কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র *L' Humanité* তে প্রায়ই লিখতেন এবং ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে ঐ পত্রিকা বেআইনী না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাতে প্রায়ই লিখে গিয়েছেন। রলাঁ সম্বন্ধেও ঐ পত্রিকায় বহু গুণগ্রাহী প্রবন্ধ বার হতো। ১৯৩৮ সালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা জাক্ ডুক্লো (Jacques Duclos) রঁলার জন্মস্থান ক্লমেসীতে এক সপ্রশংস ভাষণের পর একটি নতুন স্ট্যাডিয়াম রলাঁর নামে উৎসর্গ করেন।

দ্বিতীয় যুদ্ধ বাঁধবার কিছু পূর্বে রলাঁ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক রবস্‌পীয়ের *(Robespierre)* সমাপ্ত করেছিলেন। এটি তাঁর *Tragedies of the French Revolution*-এর শেষ নাটক। এই নাটকে রলাঁ ফরাসী বিপ্লব, বিশেষ ক'রে বামপন্থী জাকোবাঁদের (Jacobins) মূল্যায়ন করেছেন। রলাঁ

জাকোবাঁ-বাদকে এই নাটকে সঠিকভাবে ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ পরিণতি হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা তাঁর ইতিহাসের চিন্তাকে স্বভাবতই গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। তার ফলেই তিনি নাটকে রবস্পীয়ের, সাঁ জুস্ত (Saint Juste), ল্যবা (Lebas), কথঁ (Couthon) এইসব বিপ্লবীদের চরিত্রগুলি ও তাদের বৈপ্লবিক বীরত্বের প্রেরণা সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। জনসাধারণের বৈপ্লবিক ভূমিকাও এই নাটকের পটভূমিতে সব সময়ই রয়েছে।

এই সময় থেকে ইয়োরোপের রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৩৬ সালে মুসোলিনি ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পরোক্ষ সমর্থনে আবিসিনিয়া দখল করে। জাপান চীনদেশ জয় করার জন্য চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৩৬ সালে স্পেইনের নবগঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার ও মুসোলিনি খোলাখুলি ভাবেই সামরিক অভিযান পাঠিয়ে স্প্যানিশ ফ্যাসিস্টদের সাহায্য করতে শুরু করে। ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার স্প্যানিশ গণতন্ত্রকে সাহায্য করার পরিবর্তে ফ্যাসিস্টদেরই পরোক্ষভাবে সাহায্য করতে থাকে। কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জগতের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থনলাভ ক'রে স্পেইনের জনসাধারণ অসাধারণ আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে কোনো বাধা না পেয়ে হিটলার ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া দখল করল।

ফ্রান্সে ১৯৩৬ সালে সমাজতান্ত্রিক নেতা লেয়ঁ ব্লুমের (Leon Blum) নেতৃত্বে যে পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো, তা ব্লুম ও সোসিয়ালিস্টদের দুর্বলতাবশত পপুলার ফ্রন্টের প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত হলো না। ১৯৩৭ সালে র‍্যাডিক্যাল পার্টির নেতা দালাদিয়ে-এর (Daladier) নেতৃত্বে নতুন ক'রে আরও দুর্বল একটা পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো। দালাদিয়ে-এর বিশ্বাসঘাতকতা চরমে পৌঁছল যখন সে হিটলার, মুসোলিনি ও চেম্বারলেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯৩৮ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বরে মিউনিক চুক্তি (Munich Agreement) সই ক'রে সমস্ত ইয়োরোপটাকে হিটলার ও মুসোলিনির হাতে তুলে দিয়ে তাদের সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লেলিয়ে দিল। পারীতে ফিরে এসেই দালাদিয়ে পপুলার ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে একটা প্রতিক্রিয়াশীল সরকার গঠন করল। মিউনিক চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া ও ডানসিগ দখল করল ও মুসোলিনি দখল করল আলবানিয়া।

মিউনিক চুক্তির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারে বিচ্ছিন্ন ও একক হয়ে পড়ল ও তার অস্তিত্ব চূড়ান্তভাবে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ল। সোভিয়েতের শ্রমিকরাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্যে সবদেশের সাম্রাজ্যবাদীরা এতদিন ধরে যে চক্রান্ত ক'রে আসছিল আজ যেন তা সফল হতে চলল। এই রকম মহাসঙ্কটের মুহূর্তে ২৩শে আগস্ট, ১৯৩৯এ হিটলারের সঙ্গে স্টালিন একটা অনাক্রমণ চুক্তি সই ক'রে সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ ব্যবহার ক'রে তাদের সমবেত

প্রচেষ্টায় সংগঠিত চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দিলেন। মিউনিক চুক্তির বিরুদ্ধে Langevin, Jourdain, Wallon, Jolliot-Curie, Marcel Prenant, Aragon প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে একযোগে রলাঁ তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে জানুয়ারি মাসে যখন কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় অধিবেশন হয়, রলাঁ পুনরায় তাকে অভিনন্দন জানালেন।

১৫

১৯৩৯ সালে ২৩শে আগস্টের সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নিকট একটা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত মনে হয়েছিল ও তাকে একটা ভয়ানক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মিউনিক চুক্তির পরেই পার্তিনাক্স (Partinax) প্রমুখ ফরাসী রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ ফরাসীদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিলেন যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির চক্রান্তকে পরাজিত করার জন্য ও নিজেদের আত্মরক্ষার্থে যদি রুশরা এখন তাদের বিচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহলে তাদের আর কোনো রকম দোষ দেওয়া যাবে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য সত্যই বিনামেঘে বজ্রাঘাত হবে তা কেউ আশঙ্কা করেন নি, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও নন। সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। ঐ চুক্তি স্বাক্ষরের ছয় দিন পর Union des

Intellectuels Francaisর ফ্রেডেরিক ও ইরেন জোলিও কুরী, পল লাঁজভাঁ, জাঁ পারাঁ, ভিক্টর বাস প্রমুখ নেতারা একটি বিবৃতিতে বললেন যে, "ঠিক যে মুহূর্তে পোলাণ্ড ও অন্যান্য মুক্ত দেশগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বসেছে, সেই মুহূর্তে সোভিয়েত নেতাদের এই *volte face* (আকস্মিক উল্টো কাজ)-এর ফলে তাঁদের সঙ্গে নাটসী নেতাদের যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে তা আমাদের হতবুদ্ধি করেছে।" অবশ্য উপরিউক্ত বুদ্ধিজীবী নেতারা কেউই পার্টির বিরুদ্ধাচরণ করেন নি এবং তাঁরা শীঘ্রই প্রথম আঘাত সামলে নিয়ে সেই কঠিন অবস্থাতেও পার্টির পাশেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন [১]। এই ব্যাপারে রলাঁ চুপ করেই ছিলেন—সোভিয়েতকে নিন্দা করেন নি। সেই সময় আরাগঁ, কুর্তাদ প্রমুখ পার্টির নেতারা বলেছিলেন যে দালাদিয়ে ও চেম্বারলেইন রাশিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে এবং সোভিয়েতের পক্ষে এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে আসন্ন জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সময় লাভ করা।

দালাদিয়ে ও বোনে—যাঁরা সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি সই করতে অস্বীকার ক'রে ও হিটলার মুসোলিনির সঙ্গে মিউনিক চুক্তি সই ক'রে ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন

১ "...all in all, the main body of Party intellectuals remained remarkably loyal and cohesive under the almost unbearable tensions generated" by the situation. (David Caute: *Communism and the French Intellectuals*, London, 1964, p. 140)

তাঁরাই মহাস্বদেশভক্ত সেজে কমিউনিস্ট পার্টিই দেশের শত্রু এই অভিযোগ ক'রে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। যে সময়ে থোরেজ ও পার্টির অন্যান্য নেতারা নাটসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে ২৫শে আগস্ট পার্টির দৈনিক *L' Humanité* ও তার সান্ধ্য দৈনিক *Ce Soir* বেআইনী ক'রে দেওয়া হলো ও তার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হলো। আর কয়েকদিনের মধ্যেই কমিউনিস্ট পার্টি ও আরও অনেকগুলি সংগঠনকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো এবং বহু কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হলো। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের সরকার, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র ও দলগুলি নিজেদের অক্ষমতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে ঢাকবার জন্য জাতীয় আক্রোশকে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পরিচালিত করল। কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণভাবে দমন না ক'রে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে নাটসী তোষণনীতি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করল এবং ৩রা সেপ্টেম্বর ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করল বটে কিন্তু জার্মানীকে আক্রমণ করার কোনো উদ্যোগই দেখাল না, মাসের পর মাস নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইল। জনসাধারণ এই সময় বিদ্রূপ ক'রে এই যুদ্ধের নাম দিল "ফোনী" যুদ্ধ!

হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।

সোভিয়েত বাহিনী পোলাণ্ডের অর্ধেক দখল ক'রে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতিকে থামিয়ে দিল। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলরা পুনরায় বিষোদ্গার শুরু ক'রে দিল। এই প্রসঙ্গে রলাঁ একজন তরুণ কমিউনিস্ট বন্ধুকে লিখেছিলেন (মার্চ, ১৯৪০) যে, হিটলারকে যে কোনো উপায়েই হোক রুখতে হবে, কারণ সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎই আজ বিপদাপন্ন[১]।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০ রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে একটি করুণ চিঠি লিখেছিলেন। এইটিই কবির নিকট তাঁর শেষ চিঠি:

"সংবাদপত্রে লিখতে না পেরে—যুদ্ধাবস্থার জন্য তা আর সম্ভব হচ্ছে না —(*L' Humanité* ও অন্যান্য প্রগতিশীল পত্রিকাগুলির কথাই রলাঁ বলছেন) আমি এখন অধিকতর আনন্দের দিনগুলির জন্য লিখছি। বিগত শতাব্দীর—১৯০০ সালের পূর্বের—আমার যৌবনের প্রথম সংগ্রামের দিনগুলিকে আমি পুনরায় জীবন্ত ক'রে তুলছি এবং স্মৃতিকথা লিখছি।...

"অন্ধ হিংসা ও মিথ্যায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে আমাদিগকে সত্য ও শান্তিরক্ষা করতে হবে।" (*Rolland and Tagore, p. 75*)

ফরাসী সরকার ও জেনেরাল স্টাফের বিশ্বাসঘাতকতা ও অক্ষমতার ফলে জার্মান আক্রমণের দুই সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রান্স পরাজিত হলো এবং জার্মানরা ১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্রান্স অধিকার করল। অধিকৃত ফ্রান্সে

"বহু কমিউনিস্ট, বিশেষ ক'রে বুদ্ধিজীবীদের প্রাণ দিতে হয়েছে। ...রলাঁর বাড়ির উপর সব সময়ই নজর রাখা হতো, তাঁর

---

১ *Lettres à Un Combattant de la Résistance*, 1947, p. 32; Caute: p. 139.

চিঠিপত্র খোলা হতো এবং তাঁকে সর্বদাই খুন হবার অথবা বন্দী হবার আশঙ্কায় থাকতে হতো। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি ভুল ক'রে খবর দিয়েছিল যে তাঁকে কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে ও পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অবিরাম দুশ্চিন্তার ফলে গর্কীর সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রগুলি তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। (Caute, *p. 195*)

রলাঁ তাঁর শেষজীবনের এই দুঃখ-যন্ত্রণাময় দিনগুলি নিঃশব্দে কাটিয়ে গিয়েছেন। জার্মান দূতাবাস রলাঁকে খাদ্য, কয়লা ও অন্যান্য সাহায্য দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ফ্রান্স মুক্ত হবার পর থোরেজ যখন ১৯৪৪ সালে রাশিয়া থেকে দেশে ফিরে এলেন, রলাঁ তৎক্ষণাৎ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখলেন। "কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর ঐক্যবোধ (ও তার প্রয়োজনীয়তা) তাঁর জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল।" (Caute, *p, 145*)

১৯৪৪-এর ৩০শে ডিসেম্বর ৭৮ বৎসর বয়সে ভেজলেতে রলাঁর মৃত্যু হয়।

উপসংহার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতে ও বাঙলাদেশে কিছু 'কালচার'-ভক্ত লোক আছেন যাঁরা রলাঁকে কেবল মাত্র একজন শিল্পী, শান্তিবাদী ও আধ্যাত্মবাদী রূপেই প্রচার করতে চান। তাঁদের মতে রলাঁ যেমন ছিলেন যুদ্ধের উর্ধ্বে, তেমনই তিনি ছিলেন রাজনীতির উর্ধ্বে, শ্রেণী-সংগ্রামের উর্ধ্বে, পার্টির উর্ধ্বে; রাজনীতির সঙ্গে রলাঁকে জড়িয়ে ফেলতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তা তাঁরা ভাল ভাবেই জানেন; সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই তাঁরা এই সব কথা বলে থাকেন। এই সব 'কালচার'-ভক্তরা রলাঁকে "গান্ধী," "রামকৃষ্ণ," "বিবেকানন্দ," "টলস্টয়," বড়জোর "জঁ-ক্রিস্তফ"-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। তার পরে, এঁদের মতে, রলাঁর আর কোনো অবদানই নেই, আর কোনো সমস্যা নিয়ে তিনি চিন্তাই করেন নি। রলাঁ যে তাঁর জীবনের মাঝখানে থেমে যান নি, তিনি যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমিউনিজম, মার্কস, লেনিন, স্টালিন, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজ-বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য ইত্যাদি সমস্যাগুলি নিয়েই গভীর ভাবে মাথা ঘামিয়েছিলেন, এঁরা তার কোনো উল্লেখই করেন না।

রলাঁকে এই ভাবে খণ্ডিত ক'রে ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত করার এই অপপ্রচেষ্টা যে বিনা কারণে নয় তা বলাই বাহুল্য। এইসব 'কালচার'-ভক্তরা সকলেই ভারতের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন এবং তার

বহু সুযোগ সুবিধাও তাঁরা ভোগ ক'রে থাকেন। এই পুরাতন ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে ও তার সুবিধাগুলিকে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে চান। রলাঁ এককালে তাঁর ভাববাদী যুগে "গান্ধী," "রামকৃষ্ণ," "বিবেকানন্দ" লিখেছিলেন। এই সুযোগটাকে তাঁরা তাঁদের এই কাজে ব্যবহার করতে চাইবেন তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রলাঁর জীবিত কালে এঁরা বিশেষ উচ্চবাচ্য করেন নি। কিন্তু আজ যখন রলাঁর সংগ্রামী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ তখন বিকৃতকারীরাও আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। এবং তাদের পশ্চাতে রয়েছে ধনতন্ত্র, রাষ্ট্র ও সংবাদপত্রগুলির সমর্থন।

বর্তমান যুগের সঙ্কট যা শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, তা আজ আরও গভীর, আরও ব্যাপক, আরও ভয়ঙ্কর। সমস্ত পৃথিবী আজ দুইটি যুদ্ধমান ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে খণ্ডিত, প্রতিটি জাতি দুইটি জাতিতে বিভক্ত। আজ একধারে শোষণের চূড়ান্ত বর্বরতা ও সাধারণ মানুষের ধ্বংস, মৃত্যু, শৃঙ্খল—অন্যধারে শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের বন্ধনমুক্তি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজের সৃজনীশক্তি, মানুষের নবজীবন। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে এই দুইটির মধ্যে একটি বাছাই করার প্রশ্ন আজ আরও জরুরী। এবং এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই মনীষী রলাঁর অবদান-বিচার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কালান্তরের যুগে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ যখন নিশ্চল হয়ে পড়েছিল, রলাঁর মনীষা ছিল তখন গতিশীল। মানবজাতির ভবিষ্যতের দিকে গতি তার কোনো দিনই থেমে যায় নি। রলাঁর কথায়:

"জীবন যদি সম্মুখপানে চিরচলমান না হয়, তবে আমার কাছে জীবন অর্থহীন। তাই যে সকল জাতি ও শ্রেণী পথ কাটিয়া চলিয়াছে মহামানবের সমুদ্রপানে, আমি আছি তাদের সাথে। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমজীবী সাধারণের এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত গণতন্ত্র সঙ্ঘের সহযাত্রী আমি। ঐতিহাসিক বিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য উত্তালতরঙ্গ তাহাদের বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের ভবিতব্যই আমার ভবিতব্য।" ("শিল্পীর নবজন্ম," ২য়খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৯৮)।

রল্যাঁর মনের মতো একটা শক্তিশালী মন প্রকৃতির একটা প্রচণ্ড শক্তি। এরূপ মন কখনও আত্মকেন্দ্রিক হয় না বা 'অন্তরনির্দেশ' খুঁজেও বেড়ায় না। তা কখনও ইতিহাসের বিবর্তন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে না। প্রকৃতির অন্যান্য শক্তির মধ্যে তাকে স্থান ক'রে নিতে হয়, বিশেষ ক'রে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাকে সামঞ্জস্য সাধন করতে হয়। সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব ও কর্তব্য উভয়ই তাকে গ্রহণ করতে হয়। এরূপ মন ইতিহাসের দ্বারা যেমন প্রভাবান্বিত হয়, তেমনই সে-মন ইতিহাসকেও প্রভাবান্বিত করে।

শ্রমজীবী মানবজাতির সঙ্গে একাত্মবোধ, সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন—এইটাই মানুষের মনকে সজীব রাখে, তাকে বদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্ত ক'রে বেগবান নদীর স্রোতের সঙ্গে মহামানবের মহাসমুদ্রে মিশিয়ে দেয়। অতীতের কোনো মহাপুরুষই নিজেকে বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ ক'রে রাখেন নি। প্রকৃতপক্ষে মহান্ পুরুষের কর্মবিচারে এইটাই একমাত্র মানদণ্ড।

আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীই বদ্ধ জলাশয়ে আশ্রয় নেয়

যেখানে আছে শুধু আত্মবিনাশক স্রোতহীন নির্জীব নিশ্চলতা, যেখানে আছে শুধু বিমূর্ত মানুষের বিমূর্ত চিন্তা, বাস্তব সম্পর্ক বর্জিত পুতুল পূজা। এই বিমূর্ত চিন্তা সারপদার্থহীন, অর্থহীন শব্দ মাত্র, তার শুধু খোলসটাই আছে শাঁসটি নেই। জীবন্ত মন, গতিশীল চিন্তা কখনই সামাজিক মিথ্যা বরদাস্ত করে না। মিথ্যা, ভ্রান্তি, কুসংস্কার, আত্মপ্রবঞ্চনার সঙ্গে তাকে অবিরাম লড়তে হয়। এইরূপ মন ও চিন্তা মিশে যায়, বিমূর্ত মানুষের সঙ্গে নয়, বাস্তব মানুষের সঙ্গে, শ্রমজীবী সামাজিক মানুষের সঙ্গে, মানবীয় মানুষের সঙ্গে।

ব্যক্তিত্ববাদী বিমূর্ত মানবতাবাদ যত সহজই হোক না কেন, তা মানুষকে পৃথক ক'রে রাখে ; সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মবোধকে দৃঢ় করে। রলাঁ প্রাচীন সমাজের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিত্ববাদ ও বিমূর্ত মানবতাবাদ বর্জন ক'রে বর্তমান কালের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন—এই-খানেই তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব। দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ আমূল পরিবর্তন ঘটানো যে কত কঠিন কাজ তা যে সব সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা তা ভাল-ভাবেই জানেন। [১]

---

[১] "নিজেকে বহুসংখ্যকের একজন ভাবা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। যাঁদের এক ছটাক প্রতিভা আছে তাঁরা এক একটি কেষ্টবিষ্টু। রলাঁর মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে নোবেল প্রাইজের সিংহাসন থেকে নেবে চাষী মজুরের সঙ্গে কাঁধ মেলানো ইতিহাসে অপূর্ব। সতেরো বছরের অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি

রলাঁ যা ছিলেন, রলাঁ যা হয়েছিলেন, রলাঁ যা হতে চেয়েছিলেন—তা'ই সত্যিকারের রলাঁ। আজিকার যুগসঙ্কটের দিনে রলাঁ একটি জীবন্ত উদাহরণ। মানুষের চিন্তার ও কর্মের এই মহাসঙ্কটের কালে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের নিতান্ত প্রয়োজন রলাঁর মতো উদাহরণ, তাঁর মতো নৈতিক সাহস, দুঃসাহসিক চিন্তা ও আপসহীন সততা। রলাঁর মহত্ত্বকে, মনীষাকে যারা খণ্ডিত খর্ব করার চেষ্টা করে, তারা তা সত্যের জন্য করে না, নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের জন্যই করে। বিকৃতকারীদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যে বিমূর্ত মানবতাবাদী রলাঁ একদিন রাজনীতির ঊর্ধ্বে ছিলেন, তিনি মূর্ত-মানবতাবাদ গ্রহণের পর শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক রাজনীতির অগ্রভাগে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু রলাঁ নির্যাতিত মানবজাতির রাজনৈতিক মুক্তির কথাই শুধু চিন্তা করেন নি। রাজনৈতিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল তাঁর নিকট প্রথম পদক্ষেপমাত্র। তাঁর কল্পনা ছিল আরও মহত্তর—তিনি চেয়েছিলেন সমস্ত নৈতিক, সামাজিক ও জাতিগত কুসংস্কার থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করতে। (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে রলাঁর সমাজচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অনেক মিল আছে, যদিও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সমাজ-বিপ্লবের দিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি।) রলাঁর লক্ষ্য ছিল এমন

তাঁর জীবনের মূল সমস্যার মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন।" (লীলাময় রায় [অন্নদাশঙ্কর রায়]—"রমঁ্যা রলাঁ", বিশ্বভারতী পত্রিকা; ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।)

একটা সমাজ-বিপ্লব যা মানুষের মনকে সমস্ত প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে তার চেতনাকে ও তার মূল্যবোধকে নিয়ে যাবে একটা উন্নততর স্তরে।

যে রলাঁ একদিন ছিলেন আপসহীনভাবে সকল প্রকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, সেই রলাঁই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বাস্তবতিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধ, হিংসা ও বর্বরতা মানুষের সমাজ থেকে চিরতরে দূর করবার জন্য প্রয়োজন আপসহীন শ্রেণীযুদ্ধ, সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই, তাঁর নিজের কথায়, "এই যুদ্ধই সত্যকারের যুদ্ধ, যে যুদ্ধের প্রয়োজন ও বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে।" এবং এই সমাজবিপ্লব কোন্ পথে আসবে, সে-সম্বন্ধেও রলাঁর কোনো সংশয় ছিল না: "সামাজিক মুক্তি আনিবার বাস্তব সুযোগ ও সম্ভাবনা একমাত্র মার্কস ও লেনিনপন্থী বিপ্লবের পথেই আছে।" ("শিল্পীর নবজন্ম" পৃঃ ১৮)। কেবলমাত্র এই বিপ্লবই জগতে শান্তি স্থাপন করতে পারে। তাই রলাঁর রণধ্বনি হয়েছিল: "সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি।"

রলাঁ তাঁর বিমূর্ত মানবতাবাদের যুগে চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মেলাতে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়েছিল তার কারণ বুঝতেও তাঁর বেশীদিন লাগে নি। তিনি বুঝেছিলেন যে এ মিলন ঘটানোর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তার সামাজিক ভিত্তি রচনা। এই মিলনের প্রধান বাধা ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ

ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন যে কেবলমাত্র সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আসতে পারে সমস্ত জগতে সামাজিক সমতা এবং একমাত্র সেই ভিত্তিতেই ঘটবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র মানবজাতির মিলন। এবং সেই ভিত্তির উপরেই রচিত হবে মানবতার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সৌধ।

এই সমাজ-বিপ্লব কিভাবে আসবে, মানুষের কোন্ শক্তি তা ঘটাবে সে-সম্বন্ধেও রলাঁর ধারণা খুবই স্পষ্ট :

"আজ কমিউনিজম সমাজ-সংগ্রামের এমন এক বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান যাহা আপস জানে না, গোপনতা জানে না, যাহা এক সুচিন্তিত, নির্ভিক যুক্তিবাদকে সম্বল করিয়া সুউচ্চ পর্বতভূমি অধিকার করিতে চলিয়াছে।...যাহারা পিছনে পড়িয়া আছে তাহাদের দ্রুত আগাইয়া আসিবার জন্য আমরা লেখকেরা আহ্বান জানাইতেছি। অভিযাত্রী বাহিনী কখনো থামিবে না।"
("শিল্পীর নবজন্ম," পৃঃ ১৭২)

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা অনেকেই ক'রে থাকেন, কিন্তু নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করার দায়িত্ব কয়জন গ্রহণ করেন ? বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তাঁরা ঘটাতে চান কিনা—এইটাই তো তাঁদের সততার কষ্ঠিপাথর। শুধুমাত্র নেতিবাচক সমালোচনা, তা যত কঠোরই হোক না কেন, আজিকার এই মহাসঙ্কটের দিনে নিরর্থক। এঁদের মধ্যে যাঁরা সংগ্রামক্ষেত্র থেকে পলায়ন ক'রে পোশাকী কল্পনা-বাদের (utopia) আশ্রয় নেন তাঁরা পরোক্ষভাবে শোষক-শ্রেণীকেই সাহায্য করেন।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবার জন্য বহুবিধ আফিমের সৃষ্টি করেছে—ধর্ম, আধ্যাত্মিকতাবাদ, শিল্পের জন্য শিল্প, যৌন সাহিত্য ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে রলাঁ বলেছিলেন :

"ধর্মকে জনসাধারণের আফিম বলা হইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসর ইয়োরোপে ধর্মের চেয়ে আর্ট ও সাহিত্য সম্পর্কে একথাটি অনেক বেশী সত্য। জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধিকে তাহারা নির্জীব করিয়াছে, মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ দেখাইয়াছে, বাস্তব জীবন হইতে যাহারা পলাতক তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে।"

বর্তমানে বুর্জোয়া সভ্যতার চূড়ান্ত অবক্ষয়ের যুগে যে যৌন সাহিত্য সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করছে, সে-সম্বন্ধে রলাঁর কথাগুলি আরও প্রণিধানযোগ্য।

"১৪ই জুলাই" নাটকের শেষে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা কামী ডেমুলাঁ (Camille Desmoulin) জনগণকে সম্বোধন ক'রে বলছেন :

"প্রারম্ভকাল শেষ করো। এক বাস্তী কারাদুর্গ ভেঙ্গেছে। আরও অনেক বাস্তী আছে। আক্রমণে আক্রমণে এগিয়ে চলো।"

পরবর্তীকালে রলাঁ তাঁর "সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি"তে নির্দেশ দিয়েছেন :

"আমাদেরও অনেক বাস্তী ধ্বংস করতে হবে। ভেবো না যে বিনা লড়াইতে তারা তাদের দরজা খুলে দেবে।···এগিয়ে চলো।"

শিল্পী, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের প্রতি এই হলো চিন্তানায়ক রমাঁ রলাঁর নির্দেশ।

ভারতের রম্যাঁ রলাঁ সমিতি

Socie´te´ Romain Rolland de l'Inde

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্ববন্দিত ফরাসী মনীষী রঁম্যা রলাঁর জন্ম ১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী, মৃত্যু ১৯৪৪ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। এই বৎসর, ১৯৬৬ সাল রলাঁর জন্মশতবার্ষিকী বৎসর। এ বিষয়ে আমাদের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ও জনসাধারণের বিশেষ কর্তব্য আছে। কারণ একদা তিনি ইউরোপের নৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য ভারতের দিকেই তাকাইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ তিনি পরাধীন ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল সমর্থক হইয়া উঠেন এবং সর্বপ্রকার স্বার্থদুষ্ট বিদেশী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পাশ্চাত্যের লোকসমাজে প্রকাশ ও প্রচার করেন। বিশ্বমানবের মুক্তিকে তিনি কখনও ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। রলাঁর নিকট তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নাই—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতএব, এ বৎসর রম্যাঁ রলাঁর যে জন্মশতবার্ষিকী প্রগতিশীল দুনিয়ার সর্বত্র উদ্‌যাপিত হইতেছে তাহার সহিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী জনসাধারণের হাত মিলাইবার বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু ইহা তো গেল উপলক্ষ্য ও আশু লক্ষ্য ; ইহার চেয়েও বড় লক্ষ্য ও কর্তব্য আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে। অকৃত্রিম ভারতবন্ধু বিশ্ব-বন্দিত এই ফরাসী মনীষীর বিচিত্র বহুধা শিল্পীজীবন ও কর্মজীবনকে

ভারতের জনগণের মধ্যে প্রচার করা। যেমন শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সঙ্গীত চর্চায় রলাঁর অবদান, তেমনই তাঁহার রাজনীতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জনগণের পরিচিতি সাধন আজ আমাদের সম্মুখে এক বড় রকমের কর্তব্যরূপে উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ খণ্ডিত রলাঁকে নহে, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ রলাঁকেই আমরা আজ তুলিয়া ধরিতে চাই। এই উদ্দেশ্য লইয়াই গত ৮ই জানুয়ারী বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় 'ভারতের রমঁ্যা রলাঁ সমিতি, গঠিত হইয়াছে। ঐ সমিতির সম্মুখে একটি বড় কাজ এই বৎসরেই কোন এক সময় যথাযথভাবে রলাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কিন্তু সমিতির কাজ এইখানেই শেষ নহে, বরঞ্চ শুরু বলা চলে। একদিকে শিল্পী ও ভাবুক, অন্যদিকে কর্মী ও যোদ্ধারূপে রলাঁ্যার বিচিত্র বহুমুখী অসাধারণ ব্যক্তিত্বের চর্চা ও অনুশীলনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থার আয়োজন করাই হইতেছে ভারতের রলাঁ সমিতির সাধারণ উদ্দেশ্য। এই কাজে অগ্রসর হইবা মাত্রই আমরা যে সাড়া পাইয়াছি তাহাকে আশাতীত বলিলেও কম বলা হয়। সকলেই উৎসাহী, সকলেই আগ্রহী, রলাঁর নিকট আমাদের জাতীয় ঋণ সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত শোধ করিতে উৎসুক।

এই আবেগ ও উৎসাহকে স্থায়ী সংগঠিত রূপ দিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। তাই গত ৮ই জানুয়ারীর সভায় সাধারণ সদস্যদের জন্য দুই টাকা চাঁদা স্থির হইয়াছে। সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার উদ্দেশ্যে আমরা সুধীসমাজ ও জনসাধারণের নিকট মুক্তহস্তে সমিতির তহবিলে দান করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।—

অমিয় চক্রবর্তী (সভাপতি)

প্রমোদ সেনগুপ্ত (সধারণ সম্পাদক)

১৫ই জানুয়ারী. ১৯৬৬।

কালান্তরের পথিক রমঁ্যা রলাঁ। কালের কালবুদ পেরিয়ে এগোবার নির্দেশ যাঁরা দিতে পারেন, যাঁরা পারেন এগোতে. তাঁরাই হন কালান্তরের পথিক, কালান্তরের সহযাত্রী, সহযোদ্ধা। এ দুর্গম যাত্রাপথ পেরোতে অনেকেই পারেন না। যাঁরা পারেন না তাঁরা পরাজিত শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন, তিনি ছিলেন কালজয়ী, রলাঁর সহযাত্রী।

পারেন নি গান্ধী। পারা সম্ভবও ছিল না, কারণ তিনি কালের সাঁকোর এ পারের লোক, পেরোবার প্রচেষ্টা ছিল না তাঁর কোন কালেই। কালান্বেষণের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে প্রমোদ সেনগুপ্ত বিচার করেছেন রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী—এই ত্রয়ীর জীবনী. যাঁরা প্রায় সমকালীন। প্রায় একই সময়ে জীবনারম্ভ, প্রায় একই সময় জীবনান্ত। সেই সঙ্গে বিচার হয়েছে ইয়োরোপের ও এদেশের বহু বুদ্ধিজীবীদের—যাঁরা মানবতা ও 'স্বাধীন শিল্পবোধে'র নামাবলী গায়ে জড়িয়ে চলেন। রলাঁর দিনপঞ্জী *Inde*, 'শিল্পীর নবজন্ম', 'সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি' প্রভৃতি বহু বইয়ের প্রভূত সাহায্য নিয়েছেন লেখক এই গ্রন্থ রচনায়। এ অন্বেষণ রলাঁর জীবনকাল ধরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালব্যাপী।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে অন্যত্র। 'জাঁ-ক্রিসতফে'র রলাঁ, 'গান্ধী'-'রামকৃষ্ণ'-'বিবেকানন্দ' রচনা যুগের রলাঁ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছেন 'বিমুগ্ধ আত্মা,' 'শিল্পীর নবজন্মে'র রলাঁয়। পরবর্তীকালের রলাঁকে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি, তাঁরা খণ্ডিত রলাঁর ভক্ত। এঁরা খোঁজেন ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী রলাঁকে, উপস্থাপিত করেন রলাঁকে গান্ধীবাদের ব্যাখ্যাতা বলে, এঁরা চান না সেই চলমান শিল্পীর উত্তর-তিরিশের যুগের বাণী তুলে ধরতে। এঁরা ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর সাকরেদ তুচ্চিকেও যেমন সম্মান জানান স্বাধীন ভারতে, আবার রলাঁকে খণ্ডিত আকারে তুলেও ধরেন সভাসমিতিতে ও লেখায়।

প্রমোদ সেনগুপ্তের লেখনী এঁদেরও বিরুদ্ধে। প্রমোদ সেনগুপ্ত বহুদিন ইয়োরোপ-প্রবাসে কাটিয়েছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামী যোগাযোগ সুদীর্ঘকালের। "ভারতের মহাবিদ্রোহ," "নীল বিদ্রোহ" প্রভৃতি কয়েকটি বইয়ের লেখক তিনি। রলাঁর দিনপঞ্জী *Inde*ও ফরাসী ভাষা থেকে তিনি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন।

॥ দাম: ৬·৫০ ॥